প্রথম প্রকাশ : ১৯৬১

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২,
হইতে প্রকাশিত ও কালান্তর প্রেস, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭
হইতে মুদ্রিত ।

সম্পাদকের নিবেদন

এই বই প্রকাশে যাঁদের বিশেষ সাহায্য পেয়েছি তাঁদের সকলকে জানাই আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন—এই বই-এর অধিকাংশ প্রবন্ধ পুরোপুরি অথবা অংশত 'মূল্যায়ন'-এ প্রকাশিত হয়েছে। 'বাঙলার জাগরণ' নিয়ে 'মূল্যায়ন'-এর উদ্যোগে যে অসংখ্য আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে যাঁরা যোগ দিয়েছেন এবং নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে আমাদের সাহায্য করেছেন, তাঁদের সকলের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, সুভাষগ্রাম বিদ্যাভূষণ গ্রন্থাগার প্রভৃতির কাছ থেকে আমরা যে বিশেষ সাহায্য পেয়েছি তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী বইখানির প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

লেখক পরিচিতি

নরহরি কবিরাজ—সুপরিচিত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী

ছায়া দাশগুপ্ত—অধ্যাপনা ও গবেষণা কাজে নিযুক্ত

দীপিকা বসু—অধ্যাপনা ও গবেষণা কাজে নিযুক্ত

অমর দত্ত—গবেষক ও গ্রন্থকার

নন্দিনী সেন—অধ্যাপনা ও গবেষণা কাজে নিযুক্ত

নির্মাল্য বাগচী—খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ

সুশীল জানা—খ্যাতনামা সাহিত্যিক

সূচীপত্র

ভূমিকা

নরহরি কবিরাজ

বাঙলার জাগরণ গাল-গল্প নয়, এটি ঐতিহাসিক সত্য। তবে এর প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রশ্ন নিয়ে, বিশেষ ক'রে, এই জাগরণের ইতিবাচক দিক কতখানি, তার বিচার নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে এবং থাকতে পারে। তার মূল কারণ উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণে যথেষ্ট স্ব-বিরোধ ছিল। তবে এই স্ব-বিরোধিতা সত্ত্বেও এই জাগরণের একটি ইতিবাচক দিক আছে কিনা এবং তা কতখানি—এটাই প্রধান বিচার্য বিষয়।

মনে রাখা প্রয়োজন, বাঙলার জাগরণের প্রকৃতি বিচারের প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক চলে আসছে। তবে মাঝে মাঝেই এই বিতর্কের রঙ বদল হয়েছে। আগের দিনে বাঙলার জাগরণের বিভিন্ন ধারার গুরুত্ব নিয়ে বারবার বিতর্ক উঠেছে। কেউ বেশী গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন ব্রাহ্ম আন্দোলনের ওপর, কেউবা হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের ওপর। তবে এঁরা কেউই বাঙলার জাগরণের মূল ভূমিকাকে অস্বীকার করতে চান নি। অতি সম্প্রতিকালে বিতর্কটি চরমে উঠেছে। কেননা, কোন কোন গবেষক এই জাগরণের মধ্যে মোটেই সাদা রঙ দেখতে পাচ্ছেন না, তাঁদের মতে এর সবটাই কালো। এর নাকি কোন ইতিবাচক দিকই নেই।

মনে রাখা প্রয়োজন, বাঙলার জাগরণের যে বেশ একটি ইতিবাচক দিক আছে—এ বিষয়ে সমসাময়িক যুগের চিন্তাশীল মনীষীরা বিশেষ সজাগ ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির লেখায় এই জাগরণের চরিত্র-চিত্রণের প্রথম প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাঙলার জাগরণের অন্যতম পুরোধা। তিনিও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই জাগরণের একটি ছবি আঁকতে চেষ্টা করেন। বাঙলার

জাগরণের সার্থক পরিণতি ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়। তিনি পূর্বসূরীদের কাছে অকুণ্ঠভাবে ঋণ স্বীকার করেছেন। তিনি নিজের ও পূর্বসূরীদের কাজের মধ্যে ঐতিহাসিক পরম্পরা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করলেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি মনীষীদের চরিত্র-চিত্রণ করতে গিয়ে নিজস্ব ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ এই জাগরণের মর্মবস্তুটি উদ্‌ঘাটিত করলেন। যুগধর্মের আলোকে বিচার করে তিনি এর মধ্যে আধুনিকতার উৎসের সন্ধান পেলেন।

বলা যায়, বাঙলার জাগরণের একটি সামগ্রিক চেহারা, একখানি বইয়ের পরিসরে, সবচেয়ে ভালোভাবে ফুটে উঠেছে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজ" নামক গ্রন্থে। বাঙলার জাগরণ যে গাল-গল্প নয়, এটি ঐতিহাসিক সত্য—এর পরিচয় চিরদিন বহন ক'রে চলবে এই বইখানি।(১)

স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৩৩ সালে রামমোহনের মৃত্যু-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এক মনোজ্ঞ আলোচনার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনায় "নবযুগের উদ্‌গাতা" হিসাবে রামমোহনের ভূমিকাটি তুলে ধরার চেষ্টা চলে। এই আলোচনাকে নিজ নিজ বক্তব্য রেখে যাঁরা সমৃদ্ধ ক'রে তোলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি। এই আলোচনার মুখ্য বিষয় রামমোহন হলেও প্রকৃতপক্ষে বাঙলার জাগরণের মূল চরিত্র নিয়েই আলোচনা সুরু হয়ে যায়।(২)

প্রগতিশীল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বাঙলার জাগরণের প্রকৃতি নির্ণয়ের এটিকেই প্রথম সমষ্টিগত প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। এই আলোচনা থেকে উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের একটি উচ্ছ্বসিত রূপ বেরিয়ে আসে।(৩)

বাঙলার জাগরণের এই উদার, জাতীয়তাবাদী বিচারের পাশাপাশি এক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে পুনরুজ্জীবন আন্দোলন (বঙ্কিম-বিবেকানন্দের নেতৃত্বে) দেখা দেয়, একদল গবেষক তাকেই বাঙলার জাগরণের প্রকৃত রূপ হিসাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেন এবং ব্রাহ্ম আন্দোলনের ভূমিকাটিকে তাঁরা যথাসম্ভব খাটো ক'রে দেখাতে চাইলেন।(৪) কোন কোন ক্ষেত্রে

রামমোহনের চরিত্রহননেরও চেষ্টা চলে।(৫) স্বভাবত, এর উত্তর দিতে অগ্রসর হন ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত একদল বুদ্ধিজীবী।(৬) তাঁরা ব্রাহ্ম আন্দোলন, বিশেষ ক'রে, রামমোহনের চরিত্রহননের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। ক্রমে এই বিতর্ক ব্রাহ্মগোষ্ঠী বনাম হিন্দু গোষ্ঠীর কলহে পরিণত হয়। বাঙলার জাগরণের জটিল প্রক্রিয়াটির মধ্যে প্রবেশ না ক'রে উভয় পক্ষই অতি-সরলীকরণের প্রবণতার দিকে অগ্রসর হলেন। ফলে, বাঙলার জাগরণের মূল প্রকৃতি বিচারের প্রশ্নটি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

অতি সম্প্রতিকালে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বাঙলাব জাগরণ সম্পর্কে যেসব মন্তব্য উপস্থিত করেছেন সেগুলিকে এই সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর জের বলা চলে। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণকেই তিনি সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ব'লে ফতোয়া জারি করেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি এমনকি দুই জাতি তত্ত্বের সাফাই গেয়েছেন।(৭) কখনও রাধাকান্তকে, কখনও ডিরোজিওপন্থীদের রামমোহনের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে তিনিও ইতিহাসে রামমোহনের ভূমিকাকে যথাসম্ভব খাটো ক'রে দেখানোব চেষ্টা করেছেন।(৮)

বাঙলার জাগবণ সম্পর্কে আরও এক ধরনের সংকীর্ণতাবাদী ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যায়। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মধ্যে যে সংকীর্ণ অতি-বিপ্লবী চিন্তা অনেক সময় দেখা যায়, এটিকে বলা চলে তাবই বহিঃপ্রকাশ। বাঙলার জাগরণের মধ্যে এঁরা দেখলেন শোষক ভূস্বামীর আত্মপ্রকাশের অভিব্যক্তি মাত্র! তাছাড়া, এব মধ্যে সমাজের নিম্ন শ্রেণীগুলির জাগবণের উপাদান প্রতিফলিত হয় নি দেখে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁদের চোখে বাঙলার জাগরণের ইতিবাচক দিক নেই বললেই চলে। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত সেন্সাস রিপোর্টে সম্পাদকেব মন্তব্যে এই মতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।(৯)

বাঙলার জাগরণ সম্পর্কে মার্কসবাদীদের মধ্যে কৌতূহল জাগরিত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে, ফ্যাসি-বিরোধী শক্তিগুলির জয়লাভের পটভূমিতে। সকল দেশের মার্কসবাদীদের মধ্যেই তখন দেশের ঐতিহ্য সন্ধানের একটি চেষ্টা পরিগণিত হয়।(১০) এই সময়ে "নোটস অন বেঙ্গল রেনেসাঁস" নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকার রচয়িতা ছিলেন একজন খ্যাতনামা মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী।(১১) কাজেই মার্কসবাদীরা যে উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের ইতিবাচক দিকটিকে স্বীকৃতি দেয় এবং তারা নিজের

দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ববোধ করে, এই পুস্তিকা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

"নোটস অন বেঙ্গল রেনেসাঁস" মার্কসবাদীদের মধ্যে বাঙলার জাগরণের ইতিহাস সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল সৃষ্টি করে, কিন্তু এতে তাদের ক্ষিধে মেটে না। ক্রমশ বাঙলার জাগরণের একটি মার্কসীয় বিশ্লেষণের প্রয়োজনীতা অনুভূত হতে থাকল। এই প্রয়োজন মেটাতে অগ্রসর হলেন রবীন্দ্র গুপ্ত।(১২) তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে "ভারতের ইতিহাসে রামমোহন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যে ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন তা প্রগতিশীল ধারা নয় বরং তার উল্টো ধারা।" তিনি আরও লিখলেন—"ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ শাসন প্রগতির সূত্রপাত করেছিল একথা যদি সত্য হয় তবেই এদের ধারাকে প্রগতিশীল ধারা বলা যায়।"(১৩)

কিন্তু রবীন্দ্র গুপ্তের এই বিশ্লেষণ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা প্রায় একযোগে অগ্রাহ্য করলেন। তাঁরা বললেন—রবীন্দ্র গুপ্তের বক্তব্যে যা প্রতিফলিত হয়েছে তাকে মার্কসীয় বিচার কিছুতেই বলা চলে না, বরং বলা চলে এতে প্রতিফলিত হয়েছে মার্কসবাদের বিকৃতি। কাজেই রবীন্দ্র গুপ্তের নবজাতকের আঁতুড়ঘরেই মৃত্যু ঘটল।

তবে অতি-বিপ্লবী চিন্তায় বিশ্বাসী, অথচ নিজেদের মার্কসবাদী বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন, এমনি কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী আজও রবীন্দ্র গুপ্তের থিসিসের জের টেনে চলেছেন।(১৪) নকসালপন্থী বুদ্ধিজীবীরাও মোটামুটি এই মত পোষণ করেন।(১৫)

অতি সম্প্রতিকালে আর এক দিক থেকে বাঙলার জাগরণের ওপর আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কয়েকটি মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয় ও ব্রিটেনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত একদল গবেষক বাঙলার তথা ভারতের জাতীয় জাগরণ সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। এঁদের প্রতিপাদ্য বিষয়—ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে বিরোধ বাঙলার জাগরণের মূলে নয়; বরং ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা—এই তথাকথিত জাগরণের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। তাঁদের মতে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা তথা ভারতে জাগরণের আলো জ্বেলেছিল ইংরেজ শাসন। এর মূলে রয়েছে ইংরেজের সভ্যতা বিকীরণকারী ভূমিকা। তথাকথিত বাঙলার জাগরণ এই আলোকে আলোকিত। ইংরেজের ছড়িয়ে দেওয়া সভ্যতার হীন অনুকরণ

মাত্র। এই গবেষকেরা আরও মনে করেন—বাঙলার জাগরণের নেতারা ছিলেন "ভদ্রলোক"—যারা ছিল সমাজের উপরতলার লোক—উচ্চজাতি-সম্ভূত। সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে তারা মাঝে মাঝে ইংরেজের সঙ্গে যে দরকষাকষির আন্দোলন করত তাকে আন্দোলন না ব'লে ইংরেজের সঙ্গে পুতুলখেলা বলাই সঙ্গত। তাছাড়া, এই ভদ্রলোকরা অনেকেই ছিল ছোট ভূস্বামী এবং সেই হিসাবে কৃষক শোষণে অভ্যস্ত। এই ভদ্রলোকেরা ছিল যতটা ব্রিটিশবিরোধী তার চেয়েও বেশী জনবিরোধী! কাজেই দেশের বা জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার তাদের ছিল না। (১৬)

বলাই বাহুল্য, এটা খুব একটা নতুন কথা নয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলা তথা ভারতে জাতীয় জাগরণের যে পূর্বাভাস দেখা যায় তাকে সমসাময়িক কালের উপনিবেশবাদী ঐতিহাসিকেরা ভালো চোখে দেখেন নি। কয়েকজন চতুর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বার্থান্বেষী আন্দোলন ব'লে তাঁরা এটিকে উপহাস করতেন। কফ, ক্রমফিল্ড, শীল প্রভৃতি আজ যা বলতে চান তা নয়া উপনিবেশবাদের আবরণে, প্রকাশভঙ্গীতে একটু আলাদা হলেও, ঐ পুরাণো মতেরই প্রতিধ্বনি।

সবচেয়ে মজার কথা, এই নয়া উপনিবেশবাদী গবেষকদের কয়েকটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমর্মিতা প্রকাশ করতে এগিয়ে এসেছেন একদল তথাকথিত 'বামপন্থী' গবেষক। এঁদের মধ্যে আছেন হরেক রকমের 'বামপন্থী', যেমন, ট্রট্স্কিপন্থী, মাওপন্থী, নয়া-বামপন্থী প্রভৃতি। এঁরা আবার নিজেদের 'মার্কসবাদী' ব'লে পরিচয় দিয়ে থাকেন। এঁরা সকলেই বাঙলার জাগরণ তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ওপর খড়্গহস্ত। তাঁদেরও মতে বাঙলার জাগরণ তথা ভারতের জাতীয় জাগরণ 'ভদ্রলোকের আন্দোলন।' যারা এই আন্দোলনের মূলশক্তি—সেই ভদ্রলোকেরা ছিল ইংরেজের সহযোগী। অপরদিকে কৃষকদের সঙ্গে এদের বিরোধ ছিল বৈরিতামূলক। (১৭)

লক্ষ্য করার বিষয়, নয়া উপনিবেশবাদী, নয়া বাম (New Left), অতি-বাম (Ultra Left) চিন্তা-সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীরা—ভিন্ন ভিন্ন আদর্শগত অবস্থান থেকে অগ্রসর হলেও শেষ পর্যন্ত একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—যার মূল কথা, বাঙলার জাগরণের কোন ইতিবাচক ভূমিকা নেই। বাঙলার জাগরণের বিরুদ্ধে এঁরা যেন এক অলিখিত 'যুক্তফ্রন্ট' গড়ে তুলেছেন। (১৮)

টীকা ও উদ্ধৃতি

শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্রথম প্রকাশ ১৯০৩ সাল। বর্তমান পুস্তকে 'উদ্ধৃতি' দেওয়া হয়েছে—'নিউ এজ'-এর সংস্করণ (১৯৫৭) থেকে

এই আলোচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির নাম: **The Father of Modern India, Commemoration volume of the Rammohun Roy Centenary Celebrations, 1933, compiled and edited by Satis Chandra Chakravarti, 1935.**

কোনো কোনো ক্ষেত্রে রামমোহনের ভূমিকা সম্পর্কে অতি-রঞ্জিত প্রশংসাও উচ্চারিত হয়। যেমন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঘোষণা করলেন—**"Rammohun was the only person in his time, in the whole world of man, to realize completely the significance of the Modern Age."—Rabindranath Tagore, "Inaugurator of the Modern Age in India", The Father of Modern India, p. 4.**

এই মতের সম্যক পরিচয় পেতে হলে পড়ুন "গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী—স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙলায় ঊনবিংশ শতাব্দী" (সন ১৩৩৪)।

এই মর্মে সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত "শনিবারের চিঠিতে"—বেশ কিছু বিতর্কমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় (মাঘ ১৩৪০)।

এই প্রসঙ্গে অমল হোম, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, যোগানন্দ দাস প্রভৃতির নাম করা চলে। "বাংলায় জাতীয় ইতিহাসের মূল ভূমিকা বা রামমোহন ও ব্রাহ্ম আন্দোলন" (সন ১৩৫৩) নামক পুস্তিকায় যোগানন্দ দাস এই বিতর্কের জবাব দিয়েছেন।

R. C. Majumdar—Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century, 1960, pp. 75-77—শুধু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দৃষ্টির দ্বারা আচ্ছন্ন নয়, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার মনোভাবের দ্বারাও কলঙ্কিত এই বই। পাঠক উৎসর্গ-পত্রটি পড়লেই তা বুঝতে পারবেন।

R. C. Majumdar—Rammohan Roy, 1972, এই গ্রন্থখানিকে পূর্বোক্ত বইয়ের পরিপূরক বলা চলে।

A. Mitra—Census of India, 1951,—West Bengal, Sikkim and Chandernagore, Vol.-VI, Part-I A-Report, Ch.-IV, The So-called Renaissance, pp. 450-51.

কমিন্টার্নের সপ্তম কংগ্রেসে (১৯৩৫) জর্জি ডিমিট্রভ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রাম সম্পর্কিত যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে প্রত্যেক দেশের জলবায়ুর সঙ্গে মার্কসবাদকে মিলিত করে নেবার জন্যে এক উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। এই রিপোর্ট মার্কসবাদিদের নিজের দেশের ঐতিহ্য সন্ধানে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করে।

রবীন্দ্র গুপ্ত বিশিষ্ট মার্কসবাদী নেতা ও বুদ্ধিজীবী ভবানী সেনের ছদ্মনাম

রবীন্দ্র গুপ্ত—বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা, "মার্কসবাদী", ৫ম সংকলন, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯

এই সম্পর্কে আরও জানতে হলে উৎসাহী পাঠক পড়তে পারেন—কবি ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত "মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক", ১ম ও ২য় খণ্ড এবং এই পুস্তকের সমালোচনা—"মূল্যায়ন", বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৩, ১৩৮৫ ।

সুপ্রকাশ রায়—ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬, বঙ্গীয় "জিনাসাল" ও কৃষক সম্প্রদায় নামক অধ্যায় দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৮৩-২২০

"Frontier" ও "কালপুরুষ" প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ এর সাক্ষ্য দেয়।

এই শ্রেণীর গবেষকদের চিন্তা সম্পর্কে, বিশেষ করে 'ভদ্রলোক' তত্ত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনার জন্যে পড়ুন এই বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশিত—"বাঙলার জাগরণ ও ভদ্রলোক" নামক প্রবন্ধ।

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত New Left পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় এবং এদেশের Frontier প্রভৃতি সাময়িক পত্রে এই মতের সমর্থনে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

Blackburn, Robin (Ed)—Explosion in a Subcontinent, (Penguin Books, in association with New Left Review, 1975), এই বই এই ধরনের 'যুক্তফ্রন্টের' এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই শ্রেণীর ভারতীয় গবেষকদের মতামত নিয়ে এই বইয়ে কিছু আলোচনা করা হয়েছে—পড়ুন এই বইয়ের দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবেশিত "বাঙলার জাগরণ ও ভদ্রলোক" নামক প্রবন্ধ।

প্রথম ভাগ

তর্ক

"বঙ্গদূত" ও বাংলার জাগরণ

ছায়া দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ ১০ মে, ১৮২৯। এই পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি। ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাব ও ভাবনার প্রথম উন্মেষের পরিচয় যে পত্রিকাগুলি বহন করে এই পত্রিকা ছিল তাদের অন্যতম।

আজকের বাংলা আর উনিশ শতকের বাংলায় অনেক প্রভেদ। বাংলাদেশ তখন ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের কবলে। বাণিজ্যের নেশায় যারা এসেছিল, তাদের প্রথম ও প্রধান শিকার হয়েছিল এই বাংলাদেশ। ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ নিজেদের সুবিধার জন্য শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে নিপীড়নের আশ্রয় নিয়ে বাংলার জনজীবনকে বিধ্বস্ত করেছিল। বাংলার নিজস্ব সম্পদ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তশিল্প, পারদর্শী ইংরেজ বণিকের কবলে পড়ে, আর ইংলণ্ডের কলে তৈরী সস্তা মালে যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়, তার ফলে আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণই ভেঙ্গে পড়ে। অষ্টাদশ শতক থেকেই অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার ফলে আমাদের সমাজজীবনও পঙ্গু হয়ে পড়ে। তখনকার পরিবেশে পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করলেও, শিক্ষিত বাঙালী স্বাধীনতার দাবী উচ্চারণ করতে পারেনি, আর পারাও সম্ভব ছিল না। তথাপি বাঙালীর মনে একটি প্রশ্নই বারবার নাড়া দিয়েছিল—কেমন করে এই পঙ্গুত্ব থেকে বাংলার মানুষকে রক্ষা করা যায়? যাঁদের মনে এই প্রশ্ন এসেছিল তাঁরা ছিলেন বাংলার বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ—শিক্ষক, উকিল, চাকুরীজীবী এবং মোটামুটিভাবে শহরের অধিবাসী।

বাংলার এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেদিনের পারিপার্শ্বিকতা সম্বন্ধে ছিলেন পূর্ণ

সচেতন। 'ইউরোপীয় অনুপ্রবেশের সঙ্গে যে নতুন চিন্তাধারা আমাদের দেশে এসেছিল, সেই চিন্তাধারাকে গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় জীবনকে তাঁরা উন্নত করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা স্থির বুঝেছিলেন যে পাশ্চাত্য শিক্ষা, ধারণা ও শাসনব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের উন্নত করতে হবে এবং প্রতিযোগিতায় নেমে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দান করে একাধারে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আর বিদেশী শাসকের শোষণের হাত থেকে বাঁচতে হবে। এ ব্যাপারে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে কখনও কখনও তাঁদের সহযোগিতাও করতে হয়েছিল আবার কখনও কখনও তাদের বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ তাদের সঙ্গে এনেছিলেন বুর্জোয়া চিন্তাধারা, তথা বুর্জোয়া অর্থনৈতিক কাঠামো। বাংলার মানুষের একাংশ বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা এর সারবস্তুটি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। আবার এর খারাপ দিকটি (কোম্পানীর লুণ্ঠন-নীতির কথা ধরা চলে) সম্পর্কে তাঁরা প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। এই গ্রহণ এবং বর্জনের মাধ্যমে বাংলার মানুষের মনে যে সচেতনতাবোধের সঞ্চার হয়েছিল সেটিই ছিল উনিশ শতকের বাংলাব জাগরণের বৈশিষ্ট্য। এই চেতনাকে যাঁরা জাগ্রত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা প্রভাবিত হয়েছিলেন মিল বেস্থামের চিন্তার দ্বারা। আর অষ্টাদশ শতকের ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের সার্বজনীন আবেদনে তাঁরা আকৃষ্ট হলেন। সেদিনের জাগরণের যাঁরা পুরোধা তাঁরাই পরবর্তীকালের জাতীয় আন্দোলনে আদর্শ জুগিয়েছিলেন বলে এঁদের ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

-। উনিশ শতকের বাংলার জাগরণে সচেতনতাবোধের স্পষ্ট অভিব্যক্তি পাওয়া যায় সেই সময়কার প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার পাতায়।

কয়েকজন ইংরেজ এবং ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির প্রচেষ্টার ফলে "বেঙ্গল হেরল্ডের" সহচর "বঙ্গদূত" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২৯'এর মে মাসের ১০ই (রবিবার)। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার অনুষ্ঠানপত্রে এই পত্রিকার সম্পাদনায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানা যায়—
"A native paper to be printed in the Bengalee, Persian and Nagree character, will be subjoined, but distinct, and under the

superintendence of the most talented Hindoos ; translations from whose contributions will be occasionally made...."

"বঙ্গদূতের" সম্পাদক ছিলেন সুপণ্ডিত নীলরত্ন হালদার। রাজনারায়ণ বসু তাঁর "সেকাল আর একাল" পুস্তকে লিখেছেন—"বাবু নীলরত্ন হালদার "বঙ্গদূত" সম্পাদক ছিলেন।...অবকাশের অভাবে কিছুদিন পরে তিনি "বঙ্গদূতের" সম্পাদকীয় কার্য হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইলে ভোলানাথ সেন ইহার পরিচালনভার গ্রহণ করেন।"

নিশ্চিতই "বঙ্গদূত" সারা বাংলার মানুষের মুখপত্র ছিল না, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটি অংশের সচেতনতার প্রতিফলন এতে দেখা যায়। কিন্তু এই চেতনাবোধকে ছোট করে দেখলে চলবে না, কারণ জাগরণ যতই সীমিত হোক না কেন, সে ত জাগরণই বটে।

নতুন চেতনার স্বাক্ষর বহন করছে এমনি কয়েকটি বক্তব্য বঙ্গদূতের পাতা থেকে নীচে তুলে দেবার চেষ্টা করব।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকা

কিভাবে বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ক্রমশ সম্ভব হচ্ছে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই যে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে সে সম্বন্ধে বাংলার মানুষের একাংশের সচেতনতার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল বঙ্গদূতের পাতায়, ১৮২৯ সালের ১৩ই জুনের খবরে : (১ আষাঢ, ১২৩৬)

গৌড়দেশের শ্রীবৃদ্ধি

"গত ক-এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড় রাজ্যের সর্বত্র অনেক ধন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই অতএব কি কারণে বৃদ্ধি হয় তাহার অনুসন্ধান করা আমারদিগের সুতরাং আবশ্যক, অতএব লিখিতেছি এই দেশের পূর্বাপেক্ষা যে এক্ষণে অবস্থান্তর হইয়াছে ইহার কারণ এই যে পূর্বাপেক্ষা ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, দ্বিতীয়তঃ এদেশে অবাধে বাণিজ্য ব্যবসায় চলিতেছে, বিশেষতঃ অনেক য়োরোপীয় মহাশয়েরদিগের সমাগম হইয়াছে, অতএব এই ত্রিবিধ কারণকে দূরীভূত করণার্থে নানা প্রকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ

দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু যেহেতুক ঐ সকল কারণ সহজেই প্রত্যক্ষ অতএব তাহার ভূমিকার অপেক্ষা নাই যেহেতুক প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণং।

পূর্ব ত্রিশ বৎসর যে সকল ভূমি ১৫ পোনের টাকা মূল্যে ক্রীতা হইয়াছিল এক্ষণে ৩০০ তিনশত টাকা পর্যন্ত তাহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দৃষ্ট; এমতে ভূম্যাদির মূল্য বৃদ্ধির দ্বারা সম্পদ হওয়াতে জনপদের পদ বৃদ্ধি হইয়াছে। যে সকল লোক পূর্বে কোন পদেই গণ্য ছিল না, এক্ষণে তাহারা উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট উভয়ের মধ্যে বিশিষ্টরূপে খ্যাত হইয়াছে এবং দিন দিন দীনের দীর্ঘতা-হ্রস্বতাকে পাইয়া তাহারদিগের বাস্তব দিন প্রকাশ পাইতেছে।

এই মধ্যবিত্তেরদিগের উদয়ের পূর্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল। তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর যাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত—অতএব দেশব্যবহার ও ধর্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক। এই নূতন শ্রেণী হইতে যে সকল উপকার উৎপাদ্য তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত এবং ঐ অসংখ্যোপকার কেবল গৌড় দেশস্থ প্রজার প্রতিই এমত নহে কিন্তু ইংলণ্ডপতির এতদ্দেশীয় রাজ্যের সৌভাগ্য ও স্থৈর্য্য প্রতিও বটে।

অতএব যেহেতুক লোকেরদিগের যখন এপ্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে এই শ্রেণী প্রাপ্তা হইবেক, ইহার অধিক দৃষ্টান্ত কি দিব ইংলণ্ডের পূর্ববৃত্তান্ত দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইবেক। যেহেতু ইংলণ্ড দেশে নারমন্ রাজার জয় হইলে পরে প্রজাসমস্ত তদধীন হইল এবং তথাকার ভূম্যধিকারিরা যে প্রকার এতদ্দেশীয় জমিদার সকল কিয়ৎকাল পর্যন্ত কালযাপন করিয়াছিলেন তাঁহারাও সেইরূপ কালযাপন করিতেন কিন্তু তাহারদিগের ধনবৃদ্ধি অষ্টম হেনরীরাজার সাম্রাজ্য পর্যন্তই সংখ্যা—তদনন্তর ওলিবর ক্রমওয়েল নামক এক কসাইয়ের পুত্র প্রথম চারলস্ নামক রাজাকে শিরশ্ছেদপূর্বক রাজ্যচ্যুত করাতে ইংলণ্ডের প্রজার প্রভুত্ব দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন ও ধন্যবাদ করিলেন।"

বঙ্গদূতের এই একই সংখ্যায় ইওরোপের বিভিন্ন দেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাবে কিভাবে জনসাধারণ শোষিত হয়েছে সে সম্বন্ধে একটি চিত্র পাওয়া যায়: "...অপর অত্যুচ্চ কিম্বা অতি হীনাবস্থাবস্থিত এবং দ্বিবিধ লোক ব্যতীত মধ্যবিত্তলোকের অভাব পক্ষে আরও দৃষ্টান্তের স্থল এই যে স্পেন দেশেতে যে

ব্যক্তির সম্পত্তি হয়, সেই ব্যক্তিই স্বচ্ছন্দে মানস ও দৈহিক কোন ক্লেশ স্বীকার না করিয়া তদ্দেশের হিডাল্‌গো অর্থাৎ রাজার ন্যায় স্পর্ধাপ্রাপ্ত হয়। অপরঞ্চ হতভাগ্য পোল্যাণ্ড দেশেও দেখা যাইতেছে যে সে স্থানের ভূমি বিক্রয় হইলে প্রজাও ভূমির সহিত বিক্রীত হয়।"

অবাধ বাণিজ্য নীতির সমর্থনে

"বঙ্গদূতের" আর একটি সংবাদে লক্ষ্য করা যায় যে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও বিলেতের শিল্পপতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বাদানুবাদ চলছিল সে সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজ সচেতন ছিল, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্তঃশুল্ক যে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে সে সম্বন্ধেও তারা সজাগ ছিল :

১৮২৯ সালের ৩০শে মের খবর (১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৩৬) উদ্ধৃত করে এই বিষয়টির প্রমাণ দেওয়া যায় :

মহামহিম শ্রীযুক্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইজারা বিষয়ক

"প্রায় সকলেই অবগত আছেন যে ইং ১৮১৪ সালে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরেরা ২০ বৎসরের নিমিত্তে এই বাঙ্গালাদেশে শ্রীল শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডপতির নিকট হইতে ইজারা লইয়াছেন, সেই ইজারার মেয়াদের শেষ প্রায় নিকটবর্তী হইল।

ইহাতে লিবরপুল দেশস্থ প্রধান মহাজনেরা ঐ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরদিগের পুনশ্চ নূতন ইজারা লওনেতে প্রতিবন্ধক হইবার উদ্‌যোগ পাইতেছেন—ইহারা এ নিমিত্তে গত জানের মাসের ২৮ তারিখে এক সভা করিয়াছিলেন ইহাতে এই প্রস্তাব হইল যে চীন দেশে ফ্রিঞ্জের অর্থাৎ প্রতিবন্ধকহীন তেজারতি ও বিলাতে বঙ্গদেশের সহিত কারবার বিষয়ে যে নিয়মিত বাধা আছে তাহা মোচন হইলে ঐ রাজধানীর এবং ইংরেজ অধীনস্থ বঙ্গদেশ সকলের বিস্তর লভ্যজনক হয় এবং আরো প্রস্তাব হইল যে পূর্ব হইতে ফ্রিঞ্জের হইয়া এতদ্দেশে দ্রব্যাদি সমাগমের বৃদ্ধি হইয়াছে—অধিকন্তু ঐ প্রতিবন্ধক মোচন হইলে ব্যবসায় বৃদ্ধি হইতে পারে ..."।

এ ব্যাপারে ১৮২৯'এর ১৩ই জুনের বঙ্গদূতের (১ আষাঢ়, ১২৩৬) আর একটি

সংবাদ শুল্ক ব্যবস্থা ব্যবসা ক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সে সম্বন্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সচেতন মনোভাবের পরিচয় বহন করে :

"অপর যে সকল ব্যক্তি লিবরপুল ও গ্লাসগো প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের সুযোগ বিষয়ে প্রস্তাব করিয়াছেন তাঁহারাই বিতর্ক করিয়াছেন যে এতদ্দেশের বাজারে বিলাতি জিনিসের অনেক প্রয়োজন আছে কিন্তু যাহারা এদেশ হইতে সেদেশে বাণিজ্যার্থে কোন দ্রব্য লইয়া গিয়াছে তাহারদিগের উপচয় না হইয়া অপচয় হইয়াছে, এ ঘটনার কারণ এই যে দ্রব্যের মূল্য লাঘব হইলেই ক্রেতার ক্রয়করণের ইচ্ছা জন্মে অথবা কোন নূতন অদৃষ্ট দ্রব্য দৃষ্ট হইলে গ্রাহকের গ্রাহকতা হয় এমতে দ্রব্যাদির যথোপযুক্ত মূল্য লাভ সম্ভাবনায় এদেশীয় দ্রব্য সেদেশে এবং সেদেশীয় দ্রব্য এদেশে গমনাগমনের প্রয়োজন দেখা যায় অতএব উভয় দেশীয় দ্রব্য দ্বারা ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে অধিকতর বাণিজ্য বিস্তার অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহাতে যদি ইংলণ্ড ভারতবর্ষীয় উৎপন্ন দ্রব্যের সাপেক্ষিত হয়েন তবে এতদ্দেশীয় দ্রব্যপ্রকরণের প্রতিবন্ধক মাসুল স্বরূপ ত্রিশুল সংহরণ না করিলে পৌঁছিতে পারে না।"

উপনিবেশকরণ ও উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা

উনিশ শতকের বাংলার শিক্ষিত মানুষের একাংশ আমাদের দেশে ইংরেজদের দ্বারা উপনিবেশকরণের মাধ্যমে দেশের উন্নতিসাধনের সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। নিশ্চিতই তাঁদের এই ধারণাটি ভ্রান্ত ছিল। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে কোন্ পরিবেশে এবং কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা এটি বিচার করেছিলেন। উপনিবেশকরণের মাধ্যমে চাষবাসের উন্নতি হলে বাংলার মানুষ উন্নত ধরনের চাষবাসের সংস্পর্শে এসে উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় লাভ করবে। এ ব্যাপারে তাঁরা আমেরিকার দৃষ্টান্তকেই সামনে রেখেছিলেন।

১৮২৯, ১৩ই জুনের বঙ্গদূত (১ আষাঢ়, ১২৩৬) লিখছে :—"··· সংপ্রতি পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন যে এতদ্দেশীয় লোক কালোনিজেশন অর্থাৎ এ দেশে য়োরোপীয় লোকের চাষ বাসে এতদ্দেশীয় লোকের যে অসম্মতির জনরব হইয়াছে সে কুরব নীরব কারণে উদ্যুক্ত হউন অর্থাৎ এদেশীয় সকলে এক-বাক্য হইয়া পার্লিমেন্ট নামক মহাসভায় এতদ্বিষয়ে এক প্রার্থনা পত্র প্রেরণ করিলে অনায়াসে প্রয়াস সিদ্ধ হইবেক।"

১৮২৯এর ৪ঠা জুলাইএর (বঙ্গদূত) (২২ আষাঢ়, ১২৩৬) খবর উদ্ধৃত করলেই কোন্ উদ্দেশ্যে তাঁরা এদেশে ইওরোপীয়দের চাষবাসের সপক্ষে ছিলেন তা স্পষ্ট হবে।

গঙ্গাসাগোরপদ্বীপে কার্পাসের চাস

"জ্ঞাত হওয়া গেল যে গঙ্গাসাগরোপদ্বীপে ভূমিক ব্যাপারের সম্পাদনার্থ ইংলণ্ডীয় এক মহাশয় গবরমেন্ট হইতে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ সেখানে কার্পাসের চাস আরম্ভ করিয়াছেন এবং কার্পাসের বীজ ঐ ভূমিতে সুন্দররূপে অঙ্কুরিত হইতেছে। সংপ্রতি অন্য কোন দেশ অপেক্ষা আমেরিকা দেশে কার্পাস অতি উত্তম উৎপন্ন হয়, সাহেব অভিলাস করিয়াছেন যে গঙ্গাসাগরোপদ্বীপের কার্পাসও তদ্রূপ জন্মে, এবং তাহাতে যথাসম্ভব পরিশ্রম করিবেন। এই কার্পাসের চাস হইতে যে লাভ হইবেক (তদপেক্ষা) এদেশের লোকের বহু-পকার সম্ভব যেহেতুক বিলাতে কলের দ্বারা যত উত্তম বস্ত্র উৎপন্ন হয় এবং এপ্রদেশেও আইনে তাহা সে দেশের জাত কার্পাসের দ্বারা হয় না সমুদায় আমেরিকার তুলার দ্বারা সম্পন্ন হয়, আর সাহেবের মনোরথ সিদ্ধ হওয়া আশ্চর্য্য নহে ইহার দৃষ্টান্তস্থল নীলের চাষ যেহেতু বাঙ্গলাদেশে ক্রমে ক্রমে অন্যস্থান অপেক্ষা অত্যুত্তম নীল জন্মিতেছে অতএব তুলাও আমেরিকা দেশের তুলা উত্তম উৎপন্ন হইতে পারে।"

কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের বিরুদ্ধে

দস্তকের মাধ্যমে কোম্পানী কিভাবে ব্যবসায়ক্ষেত্রে একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে এবং আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে সে সম্বন্ধেও সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া, ব্যবসাক্ষেত্রে ইংরেজ কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের ফলে বাংলার নবাবের সঙ্গে তাদের বিরোধ যে অনিবার্য হয়ে উঠছে—সে সম্বন্ধেও সচেতনতার প্রকাশ দেখা যায় বঙ্গদূতের ১৮২৯ এর ২৬শে সেপ্টেম্বরের সাপ্তাহিক সংবাদে :—(১১ আশ্বিন, ১২৩৬)

কোম্পানীর লবণের মাসুলের পূর্ব বিবরণ

"যেরূপে লবণের দ্বারা রাজস্ব আদায় করণের বর্তমান নিয়ম আরম্ভ হইল

তাহা পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকে জ্ঞাত নহেন এ প্রযুক্ত আমরা আপনাদের সমাচারপত্রে ঐ বিবরণ জানাইবার কারণ যৎকিঞ্চিৎ স্থান প্রদান করিলাম।

কোম্পানি বাহাদুর বাঙ্গালাতে বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন করিলে তাঁহারা দিল্লী হইতে ফরমান পাইলেন তদ্দারা কোম্পানীর কর্মকারকেরা কোম্পানির বাণিজ্য স্বরূপ যত দ্রব্যের আমদানী বা রপ্তানী করেন তাহার মাসুল রহিত হইল। সেই ফরমানে আরো নির্দ্ধারিত ছিল যে যে গোমাস্তারদের স্থানে বড় সায়েবির কি ইঙ্গরেজের বাণিজ্যের কুঠীর অন্য ২ কর্ত্তাদের দস্তক থাকিবেক তাহারা বিশেষানুগ্রহপ্রাপ্ত হইবেক। তৎকালে কোম্পানির তাবৎ ভৃত্যদের বেতন অতিশয় ন্যূন ছিল এবং এমত বোধহয় যে তাহারা সকলেই স্ব ২ লাভার্থে নিজে ব্যবসায় করিত। তাহারদের ব্যবসায়ের মধ্যে লবণ গণ্য ছিল।

তাহাদের সকল দ্রব্য সামগ্রী তাহারদের দস্তকের প্রাদুর্ভাবে মাসুল রহিত হওয়াতে দেশের প্রায় সমস্ত আন্তরিক বাণিজ্য তাহাদের হস্তে কিম্বা তাহাদের দস্তকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবসায়িদের হস্তে আইল। ইহাতে এতদ্দেশীয় মহাজনেরা অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইল এবং বিশেষতঃ নওয়াব ভাবিত হইলেন এবং কাসিম আলি খাঁর সঙ্গে যে বিরোধ হইল তাহার মূল কারণ ঐ বাণিজ্য হইল।…"

বাংলার অর্থনৈতিক জগৎ যে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দ্বারা বিধ্বস্ত হচ্ছিল সে সম্বন্ধেও সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। লবণ ব্যবসায়ের উপর কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে তীব্র মতামত প্রকাশ পেয়েছিল। বঙ্গদূত লিখছে—

"বঙ্গদূতের" সহচর বেঙ্গল হেরাল্ড নামক ইংরাজী সমাচার পত্রের দ্বারা শ্রী শ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের লবণ ব্যবসায়ের একাধিপত্য বিষয়ে জানেক দারোগা কর্ত্তৃক একবার সমাচার প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার শেষপত্রে এতদ্দেশীয় লোক যাহারা কোম্পানীর লবণের ব্যাপারে ব্রতী তৎপ্রতি কোন ইংলণ্ডীয় ব্যক্তির বাহুক্তির যথাযুক্তি প্রত্যুক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল তদীয় প্রথমাংশ তদ্ভাষা হইতে স্বভাষায় অনুবাদপূর্বক ক্রমে লেখা যাইতেছে।"

শ্রীযুত বেঙ্গল হেরাল্ড সম্পাদকেষু:—১১ই জুলাই, ১৮২৯ (২৯ আষাঢ়, ১২৩৬) "আমার পূর্বপত্রে এতদ্দেশীয় লবণ ব্যাপার সংক্রান্ত কার্য্যকারকের প্রতি কোন ইংলণ্ডীয় মহাশয় কর্ত্তৃক যে সকল দোষারোপ হইয়াছিল তাহার উদ্ধারের

চেষ্টায় স্বীকৃত ছিলাম, অতএব এই ক এক পংক্তি লিখিতেছি, নিবেদন এরূপ দোষারোপ সকারণ ব্যতীত নিষ্কারণ নহে, যেহেতু মনাপলি অর্থাৎ লবণ ব্যবসায়ের একাধিপত্য সঙ্গা সকলেরি অপ্রিয়, সুতরাং ইহাতে আপনাকারদিগের তাদৃক ক্রোধৎপত্তি হইতে পারে যেমন পূর্বে দেড়শত বৎসর গত হইল আপনাকারদিগের দেশে ডাকিনী বিদ্যার নাম শুনিলে সকলের কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইত। তৎকালে তৎপ্রদেশে বৃদ্ধা স্ত্রী দেখিলেই ডাকিনী কহিত এবং তজ্জন্য জলমগ্ন করিয়া প্রাণদণ্ড করিত তদ্রূপ এক্ষণে কোন ব্যক্তিকে লবণ ব্যাপারে ব্রতি কহিলেই তৎপ্রতি সেইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, যদ্যপি তাহাকে ইংলণ্ডীয় মহাশয়রা মহত্বতা ক্রমে অন্য কোন দুর্বাক্য দ্বারা অপবাদি না করেন কিন্তু সাল্ট এজেন্ট অর্থাৎ লবণ বাণিজ্যের সম্পাদক বলিলেই তৎক্ষণাৎ সে তাৎপর্য্য সিদ্ধ হয়, ফলিতার্থ ইংলণ্ডীয় মহাশয়রা এদেশীয় ভাষা সুন্দর জ্ঞাত নহেন, যদি জ্ঞাত হইতেন তবে অবশ্যই তদ্ভাষায় দুর্বাক্য কহিতেন……"।

ইংলণ্ডের উন্নত শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে

"বঙ্গদূতের" ১৮২৯, ১৯শে সেপ্টেম্বরের (৪ আশ্বিন, ১২৩৬) সংখ্যার একটি খবরে ইংলণ্ডের উন্নত শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কৌতূহলের পরিচয় পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে কিভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে বিল পাশ হয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারে হাউস অব কমনসের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কি কি অধিকার রয়েছে, সংসদীয় গণতন্ত্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নানা সংবাদ তাঁরা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ইংলণ্ডের রাজার ক্ষমতা কিরূপ সীমিত ছিল সে সম্বন্ধেও এঁরা সচেতন ছিলেন। এই খবর থেকে এটি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বঙ্গদূত ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে কেবলমাত্র সপ্রশংস দৃষ্টিতেই বিচার করে নি, বাংলার মানুষের যে শাসন পরিচালনায় অধিকার নাই, এমনকি শাসনের ব্যাপারে কোন সংবাদ জানবারও উপায় নাই তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও এই বক্তব্যের মধ্যে আছে।

খবরটি ছিল নিম্নরূপ :

ইংলণ্ডের রাজকীয় স্থান ও বিচার বিধান

প্রশ্ন : পার্লিমেন্টের ব্যবস্থা স্থাপনের কি নিয়ম তাহা বিস্তারিত মতে শুনিতে বাঞ্ছা করি।

উত্তর : পার্লিমেন্টের অন্তঃপাতি কোন একজন কোন সময়ে নূতন ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতে পারেন। তাহার পূর্বে তিনি সেই প্রস্তাব করনে সভায় অনুমতি প্রার্থনা করেন, তাহা কদাচ অস্বীকৃত হয় না। সেই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার নাম বিল কহা যায় যখন তাহা সম্পূর্ণরূপে সংস্থাপিত হইয়াছে তখন তাহার নাম ব্যবস্থা। প্রত্যেক প্রস্তাবিত বিল যে গৃহে উপস্থিত করা যায় সেই গৃহে তিনবার তাহার পাঠ হয় যদি প্রত্যেকবার পাঠকরণ সময় তাহার অনুকূল ব্যক্তি অধিক সংখ্যক ও প্রতিকূল ব্যক্তি অল্পসংখ্যক হন তবে সেই বিল মঞ্জুরের ন্যায় গণ্য হয়। যদি প্রথম দিবসে প্রথমবার পাঠকরণ সময়ে তাহার অনুকূল অধিক ও প্রতিকূল অল্প তথাপি যদি অন্য দিনে দ্বিতীয়বার পাঠকরণ সময়ে তাহার প্রতিকূল অধিক অনুকূল অল্প লোক হয় তবু অগ্রাহ্য।

এইরূপ কোন বিল অধঃস্থগৃহে তিনবার মঞ্জুর হইলে উপরিস্থ গৃহে প্রেরণ করা যায় এবং সেখানে তিন দিবসে তিনবার পাঠ করা যায় এবং তদগৃহস্থেরদের কত লোক সম্মত ও কত অসম্মত ইহা গণনা করা যায় এবং যদি প্রত্যেকবার পাঠকরণ সময়ে অনুকূল অধিক হয় তবে সেই বিল উভয় গৃহে গ্রাহ্য এমত গণ্য হয়।

অনন্তর তাহার প্রস্তাব শ্রী শ্রীযুত বাদশাহের সমীপে করা যায় এবং তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাতে অসম্মত হইতে পারেন, অসম্মত হইলে তাহা মিথ্যা হয় কিন্তু বাদশাহ তাহাতে কদাচ অসীকার (অস্বীকার) করেন না। বাদসাহের সম্মতি হইলে তাহা দেশের ব্যবস্থা স্বরূপ স্থাপিত হয়। সম্মতি দেওনে হয় বাদশাহ স্বয়ং উপরিস্থগৃহে আসিয়া সম্মতি প্রদান করেন নতুবা এক কমিস্যনো দ্বারা আপন সম্মতি প্রেরণ করেন। উপরিস্থগৃহে বাদশাহের নিমিত্তে এক সিংহাসন প্রস্তুত থাকে কিন্তু অধঃস্থগৃহে তাঁহার প্রবেশ করণের ক্ষমতা নাহি যেহেতুক এমত অনুমান হয় যে বাদশাহ সেখানে উপবিষ্ট হইলে সভাস্থেরা স্বচ্ছন্দে আপনারদের মনস্থ জানাইতে পারে না।

উপরিস্থগৃহে কোন বিলের অনুষ্ঠান হইতে পারে যদি তাহা গ্রাহ্য হয় তবে অধঃস্থগৃহে প্রেরিত হইয়া সেখানে তদ্বিষয়ের বাদানুবাদ হয় ও সম্মতি অসম্মতি দেওয়া যায়। উপরিস্থগৃহে যদি গ্রাহ্য হয় তথাপি অধঃস্থগৃহে তাহা অগ্রাহ্য হইলে তাহা মিথ্যা হয়। অধঃস্থগৃহ হইতে কোন বিল যদি উপরিস্থগৃহে মতান্তর হয় তবে তাহা পুনর্বার অধঃস্থগৃহে প্রেরিত হয় এবং তন্মধ্যে যাহার ফেরফার হইয়া থাকে তাহার বিচার করা যায় তাহাতে তাহা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করা যায়।

পার্লামেণ্টের গৃহদ্বয় বাদশাহকে টাকা প্রদান না করিলে তিনি রাজকীয় ব্যাপারে কিছু টাকা ব্যয় করিতে পারেন না। অধঃস্থগৃহের অন্তঃপাতিরা লোকেরদের প্রতিনিধি হইয়া বৈঠক করেন অতএব সেই গৃহের এই বিশেষ ক্ষমতা আছে যে টাকা প্রদানবিষয়ক সকল বিলের অনুষ্ঠান উপরিস্থগৃহে কদাচ হইতে পারে না। অধিকন্তু অধঃস্থগৃহ হইতে টাকার বিষয়ি বিল অর্থাৎ কর গ্রহণ বিষয়ে যে ব্যবস্থা উপরিস্থগৃহে প্রেরিত হয় তাহাতে উপরিস্থ সভার লোকেরা তাহার কিছু ফেরফার করিতে পারেন না। অতএব বাদশাহ কি তাঁহার মন্ত্রীরা ইচ্ছা করিলে কাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারেন, কিন্তু অধঃস্থগৃহের লোকেরদের বিনানুমতিতে যুদ্ধের শির অর্থাৎ টাকা পাইতে পারেন না।

ইংলণ্ড দেশের তাবৎ ব্যাপার পার্লিমেণ্টে সম্পন্ন হয়। পার্লিমেণ্ট কেবল বৎসরে ৬ মাস বৈঠক হয়। তাহার সভাস্থেরদের প্রস্তাবিত বিলের পরামর্শ আপনে ক্ষমতা আছে সেই পরামর্শ তৎক্ষণাৎ সমাচার পত্রে প্রকাশ হয় এবং তদ্দারা ইংলণ্ড দ্বীপের অতিদূর স্থানস্থ লোকেরা পার্লিমেণ্টে কি ব্যাপার হইতেছে তাহা ৪ চারি দিবসের মধ্যে অবগত হইতে পারেন। সভায় নানা লোকেরা কোন এক রজনীতে কোন বিষয়ে যে কথোপকথন করেন তাহা ছাপা হইয়া পরদিন প্রত্যূষে প্রকাশিত হয় এবং কোন ২ সময়ে এই বাদানুবাদ এই মত অধিক হয় যে তাহা রামায়ণের তৃতীয়াংশের একাংশ তুল্য। পার্লিমেণ্ট সংক্রান্ত সকল সমাচার এই মত ঝটিতি ব্যাপ্ত হয় যে তাহা প্রায় অবিশ্বসনীয়। কিয়ৎকাল হইল অক্সফোর্ড নগরের পার্লিমেণ্ট সম্পর্কীয় একজন মনোনীত করণ বিষয়ে দেশের তাবৎ লোক ব্যাকুল ছিল। সেই স্থানে অনেক বাদানুবাদ হইল। অক্সফোর্ড নগর লণ্ডন নগর হইতে সাড়ে সাতাইশ ক্রোশ অন্তর তথাপি সেই নগরে দিনে দুই প্রহর চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল তাহা লণ্ডন নগরে প্রেরিত হইয়া সেই রাত্রিতে মুদ্রিত হইয়া পরদিনেব প্রত্যূষের ছয় ঘণ্টার সময়ে সমাচার পত্রের দ্বারা অক্সফোর্ড নগরে পহুঁছে॥"

বঙ্গদূতে প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য এইখানে যে, এগুলি দেশের জাগরণের একটি সম্ভাব্য পথের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছে। বঙ্গদূতের মনে হয়েছে—এই জাগরণের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হল যন্ত্রশিল্পের মাধ্যমে

উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে দেশবাসীর সম্যক পরিচয়। তার মনে হয়েছে—ভারতের রাজনৈতিক জাগরণের প্রকৃষ্ট পথ—ইংলণ্ডের অনুরূপ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তার মনে হয়েছে—পশ্চিমের উন্নতিশীল দেশগুলিতে যেমন ঘটেছে ঠিক তেমনি ভারতেও প্রগতির অগ্রদূত হবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

বঙ্গদূতের যুগে আমাদের দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ছিল শৈশব-অবস্থায়। তাই তার বক্তব্য অস্পষ্ট, দ্বিধাজড়িত, অনেক ক্ষেত্রে অত্যধিক অনুকরণ-প্রিয়। তবুও বঙ্গদূতের পাতায় একটি নতুন চেতনা উপস্থিত। আর এই নবচেতনাই উনিশ শতকের বাংলার জাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

"বঙ্গদূতে"র যে অংশটি "জাতীয় গ্রন্থাগারে" রক্ষিত আছে সেই অংশের উপর ভিত্তি করে বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত।

"জ্ঞানান্বেষণ" ও জাতির পুনর্জাগরণ

দীপিকা বসু

১৮ জুন, ১৮৩১ এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রায় দশ বছর ধরে এই পত্রিকা চলেছিল। এটি ছিল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর মুখপত্র। দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অগ্রগামী চিন্তার স্বাক্ষর বহন করছে।

উনিশ শতকের বাংলার জাগরণের যুগধর্মী মানসিকতার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে সমকালীন পত্রপত্রিকার পাতায়। ডিরোজিওর শিষ্য—হিন্দু কলেজের ছাত্র, ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় ছিল এই জাগরণের পুরোভাগে। তাঁদের সংস্কারমুক্ত অগ্রসর চিন্তাকে ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁরা প্রকাশ করেছিলেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকা। "জ্ঞানান্বেষণ" (১৮৩১-৪০) তার মধ্যে অন্যতম। পত্রিকাটির শিরোনামই উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত বহন করছে। জ্ঞানের অন্বেষণ,—মধ্যযুগীয় অজ্ঞানতা, অন্ধ কুসংস্কারের বদলে বিজ্ঞান ও যুক্তিধর্মী সমকালীন নতুন জ্ঞানের সন্ধান। ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন ইওরোপের উন্নত বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত জ্ঞানকে এদেশে বিস্তার করতে যার ফলে যুগসঞ্চিত অজ্ঞানতা ও সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদতার অবসান ঘটিয়ে এদেশের পুনর্জাগরণ সম্ভব হবে। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে এই পুনর্জাগরণ ব্যতীত কোন জাতির অগ্রগমন সম্ভব নয়। "জ্ঞানান্বেষণের" একাধিক প্রবন্ধে তাঁদের এই মানসিকতার পরিচয় মেলে।

জ্ঞানের বিস্তার

এই নতুন জ্ঞানের বিস্তার পৃথিবীর নানা প্রান্তে মানবসমাজের সর্বাঙ্গীন অগ্রগতিকে কিভাবে সম্ভব করে তুলেছে তার প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে

"জ্ঞানান্বেষণের" এক প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে যে ভারতের মত অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন দেশে "জ্ঞানের বিস্তারই দেশপ্রেমের সবচেয়ে মহান নিদর্শন।"(১) যাঁরা পশ্চিমের বিজ্ঞানকে মাতৃভাষায় অনুবাদ করে স্বদেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের কাজের প্রশংসা করে লেখা হয়েছে—জ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করার প্রকৃষ্টতম পন্থা হল—জ্ঞানের উৎসভূমি ইওরোপের জ্ঞানভাণ্ডারকে অনুবাদের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর কাছে অবারিত করে দেওয়া। আবার সেই সঙ্গে তাঁরা একথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে এই প্রগতিশীল চিন্তাধারা ইংলণ্ড থেকে গ্রহণ করলেও এদেশের প্রয়োজনে তাকে হাজির করতে হবে দেশীয় পরিচ্ছদে; ইওরোপের বিজ্ঞানকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এদেশের প্রয়োজনের সঙ্গে। এই লক্ষ্য নিয়ে কিছু মৌলিক বাংলা বিজ্ঞান-গ্রন্থ প্রকাশের জন্য এক সমিতি গঠন করার আহ্বান জানান হয়েছে।(২)

এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ফলে ইংরেজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, নীতিবোধের প্রসার এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেই সম্পর্কে গভীর আগ্রহ লক্ষ্য করে তাঁরা এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যে এদেশের জাতীয় পুনর্জাগরণ আসন্নপ্রায়।(৩) স্বদেশে প্রচলিত পাঠশালাগুলির দুরবস্থা ও শিক্ষার অবনতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রিয় স্বদেশভূমির হিতসাধনে ইংরেজী কলেজ ও সেমিনারীর আদর্শে এদেশে নতুন ধরনের পাঠশালা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তাঁরা ব্যক্ত করেছেন।(৪)

তাঁদের মতে জ্ঞানের বিস্তারই স্বদেশবাসীর সংস্কার সাধনের সর্বোত্তম পন্থা। সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে এই জ্ঞান পৌঁছে দেবার উপায় হল সুলভে পুস্তক প্রকাশ ও বিতরণ। এই উপলক্ষে 'ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি'র উদ্যোগকে তাঁরা সাধুবাদ জানালেন।(৫)

'দ্য হিন্দু ম্যানুয়াল অফ লিটারেচার অ্যাণ্ড সায়েন্স' (The Hindoo Manual of Literature and Science) থেকে একটি প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে—ব্রিটনরা যখন বর্বরতার স্তরে ছিল তখন তারা বহু দেবদেবীর আরাধনা করত এবং আমাদেরই মত নানা রকমের অর্থহীন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে তারা বিশ্বাস করত কিন্তু জ্ঞান, সভ্যতা, শক্তি ও সম্পদের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই তারা এইসব অন্ধবিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানকে পরিহার করেছে। লেখকের তাই এই প্রত্যয় যে আমরাও যারা

আজ অজ্ঞানতার অন্ধকারে থেকে নানা দেবদেবী, আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাস করি, জ্ঞানের আলোক প্রজ্জ্বলিত হলে এইসব অন্ধ ধ্যানধারণাকে বর্জন করে উন্নততর দর্শন, নীতিবোধ ও ধর্মচিন্তা লাভ করতে সক্ষম হব।(৬)

পাশ্চাত্যের এই অগ্রসর শিক্ষা ও বিজ্ঞান-চিন্তাকে আরও ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করার জন্য মফঃস্বল এলাকায় ইংরেজী স্কুল-কলেজ স্থাপনের যে কোন উদ্যোগই পেয়েছে তাঁদের সানন্দ অভিনন্দন। মুর্শিদাবাদের নিজামৎ কলেজে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার প্রবর্তনে অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে তাঁরা এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে ইওরোপীয় কলা ও বিজ্ঞানে এদেশীয়দের শিক্ষিত করে তোলার এই প্রচেষ্টা সর্বতোভাবে প্রশংসার্হ। একই সঙ্গে শান্তিপুরে ইংরেজী স্কুল স্থাপনের উদ্যোগে 'কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকসন', অর্থ সাহায্য মঞ্জুর না করায় অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করা হল—সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি মৃত ভাষার চর্চায় যে বিপুল অর্থের অপচয় হয়, মফঃস্বলে ইংরেজী স্কুল স্থাপনে ব্যয় করলে সেই অর্থের অনেক সার্থক প্রয়োগ হত।(৭)

খ্রীষ্টান মিশনারীরা এদেশে শিক্ষার প্রসারের জন্য স্কুল-কলেজের পরিবর্তে উপাসনা গৃহ (chapel) স্থাপন করায় তাদের সমালোচনা করে "জ্ঞানান্বেষণে" লেখা হয়েছে যে ধর্মপ্রচারের আগ্রহে মিশনারীরা একথা বিস্মৃত হয়ে যান যে একমাত্র শিক্ষাই মানুষের মনকে পবিত্র ও নমনীয় করে তুলতে পারে এবং তাদের মনকে পৌত্তলিকতা, বহুবিবাহ, বর্ণভেদ, দাসত্ব, স্বৈরাচার প্রভৃতির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারে। প্রসঙ্গতঃ, তাঁরা ধর্ম সম্পর্কেও প্রগতিশীল উদার চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতে বিশুদ্ধ 'ধর্ম' কোন একটি বিশেষ ধর্মমত বা উপাসনা নয়—তা হল সার্বজনীন—যার মূল কথা হল ঈশ্বর ও মানবের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা—যে ধর্মে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টানে কোন প্রভেদ নেই।(৮)

এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁরা ধর্মশিক্ষাকে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধে মত জ্ঞাপন করেন। উদার ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষানীতির তাঁরা ছিলেন সমর্থক। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে কোন বৈষম্যকে তারা অন্যায় বলে মনে করে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টানের 'বিবেক' একই—সেখানে কোন প্রভেদ থাকতে পারে না।(৯)

বস্তুত, ধর্ম-নিরপেক্ষতা ছিল ইয়ং বেঙ্গলের চিন্তার এক উজ্জ্বল দিক।(১০)

জ্ঞানান্বেষণের মতে জাতির উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল—

মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার আর অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান। তাই ইওরোপের প্রগতিশীল উন্নত ভাবাদর্শের আলোকচ্ছটায় কুসংস্কারের সেই অন্ধকার অপসারিত করার প্রয়োজনেই এই পত্রিকা এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারকে স্বাগত জানিয়েছে।

রামমোহনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তাঁকে এদেশের সবচেয়ে মহান দেশপ্রেমিক ও সবচেয়ে গুণী ব্যক্তি বলে অভিনন্দিত করা হয়েছে। তাঁদের মতে রামমোহনের কীর্তির সবচেয়ে বড় নিদর্শন হল যে তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি কুসংস্কারের শৃঙ্খল চূর্ণ করে এদেশের অচলায়তনকে আঘাত করেছিলেন। মানবোচিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এইভাবে তিনি জাতির মহৎ উপকার সাধন করেছেন।(১১)

মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযান

মধ্যযুগীয় কুসংস্কার, অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি বহু প্রবন্ধে তীক্ষ্ণ সমালোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। 'জ্ঞানান্বেষণের' একাধিক প্রবন্ধে দেখা যায় দুর্গাপূজার সময় অনর্থক নাচগানে আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ কুলীন প্রমুখদের তুষ্ট করার জন্য নানা রুচিহীন আমোদপ্রমোদে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হত তাঁরা তা অর্থের নিছক অপচয় বলে মনে করতেন এবং ঐ অর্থ জাতির প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করার জন্য তাদের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

জাতির উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কাজ বলতে তাঁরা বুঝতেন—শিক্ষার বিস্তার, জাহাজ নির্মাণের কাজে সহায়তা, শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার, নতুন নতুন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন, রাস্তাঘাট, সেচখাল নির্মাণ ইত্যাদি। এক প্রবন্ধে লেখা হয়েছে—

"………আর ভারতবর্ষ কি বিদ্যার দ্বারা একেবারেই উচ্চে উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের তাবৎ গ্রামেই কি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে আর ভারতবর্ষস্থ তাবদ্দুঃখি ভিক্ষুকেরাও কি সুখী হইয়াছেন ইহাতে যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়েরা স্বীকার করেন এ সমুদায়ই হইয়াছে তবে তাহারা নৃত্যাদিতে ব্যয় করিতেছেন তাহাতে আমাদিগের কোন আপত্তি নাই শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার জনকের শ্রাদ্ধে এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগের দানের যে নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন সেই দৃষ্টান্ত উপযুক্ত বোধ করিলে নৃত্যাদির কিয়দংশের কর্তন করিয়া যে ধন

বাঁচিবে তাহা কি ২ বিষয়ে খরচ করিতে হয় যদ্যপি দেশস্থ মহাশয়েরা তাহা না জানেন তবে কহিতেছি ভারতবর্ষীয় লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ ব্যয় করুন অথবা বিলাতে গমনোপযুক্ত জাহাজ নির্মাণার্থ চাঁদা যাহা এতদ্দেশীয় লোকের উপকারার্থ হইয়াছে তাহাতেই দেউন কিম্বা ঐ ধন একত্র করিয়া বাণিজ্য করুন অথবা নানাবিধ শিল্পযন্ত্র এবং দেশের চাষ বৃদ্ধি করুন আর প্রয়োজন মতে যদ্যপি নূতন ২ অস্ত্রের আবশ্যক হয় তবে তদর্থে ব্যয় করুন কেননা ঐ সকল বিষয়ে লাভ ও সম্ভ্রমের পত্তন যে প্রকার দৃঢ়তর ভাল নৃত্যাদি করাইলে তাহার লাভ সম্ভ্রম তদ্রূপ হইবেক না ·····"(১২)

অনুরূপভাবেই চড়ক পূজায়, রাসের মেলায় সুস্থ রুচিবোধেব পরিপন্থী নানারূপ আচার-অনুষ্ঠানের আর ভণ্ড সাধু ও যোগীদের ভণ্ডামীর আড়ালে নানাধরনের দুষ্কর্মের প্রতিও তাঁদের তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও বিদ্রূপ বর্ষিত হয়েছে।(১৩) শ্যামাপূজায় বাজী ও আগুনের খেলায় ধর্মের নামে অপরের ক্ষতি করার রীতির সমালোচনা করে তাঁরা সরকারের হস্তক্ষেপ দাবী করেছেন। তাঁদের যুক্তি হল যে ধর্মের নামে যদি একে অন্যের অধিকার হরণ করে তাহলে সরকারের কর্তব্য হল শেষোক্ত জনেব অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসা।(১৪)

প্রচলিত পুরুষশাসিত হিন্দু সমাজে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে নারীদের বিদ্যা শিক্ষা অর্জনের সমস্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে, অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে যে অবহেলিত জীবনযাপনে বাধ্য করা হত—সেই সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধেও 'জ্ঞানান্বেষণের' বহু প্রবন্ধে কঠোর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। এই দাসত্ব শৃঙ্খল থেকে নারীসমাজকে মুক্ত করে তাদের স্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা কবার জন্য তাঁরা আহ্বান জানিয়েছেন।

শাস্ত্রের শাসন যে কত অযৌক্তিক ও স্বার্থপ্রণোদিত সেই সম্পর্কে এক প্রবন্ধে লেখা হয়েছে—"...... ..এই বিধিকারক মহাশয় কেমন দয়ালু দেখুন যাগাদি কর্ম যদিও পৌত্তলিক হউক তথাপি তদর্থে বেদপাঠ করিয়া যে স্ত্রীলোকের কিঞ্চিৎ জ্ঞানযোগ হইতে পারে তাহাতে একেবারে নিষেধ করিয়া দিলেন কিন্তু গৃহাদি পরিষ্কার ও পাকশালাতে ধূমে চক্ষুজ্বালা হস্তদাহ প্রভৃতি করিয়া রন্ধনাদি করিলে যে পুরুষেরা পরমসুখে ভোজন করিতে পারেন তাহারি বিধান লিখিলেন কি অন্যায় স্ত্রীলোকেরা কি এতই নীচ যে তাহারা অন্ধকারে থাকিয়া পুরুষের দাসীবৃত্তি করিবেক আর শূদ্রেরাই বা কি পাপ করিয়াছিলেন যে তাঁহারাই শাস্ত্র পড়িতে পারিবেন না······"(১৫)

সমাজে নারীদের এই হীন অবস্থা যে সমগ্র সমাজের পক্ষে লজ্জাজনক এবং প্রয়োজনীয় বিদ্যাচর্চা থেকে নারীসমাজকে বঞ্চিত করে রাখা যে গুরুতর সামাজিক অপরাধ সেই উপলব্ধির প্রকাশ দেখা যায় নিম্নোক্ত প্রবন্ধে— "……জগদীশ্বর স্ত্রী-পুরুষ নির্মাণ করিয়া এমত কখন মনে করেন নাই যে একজন অন্যজনের দাস হইবেক কিম্বা একজন অন্যকে নীচ বলিয়া গণ্য করিবেক। বিধাতা যিনি অতি জ্ঞানী ও দয়াল তাঁহার এমত ইচ্ছা নহে যে তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে একজন জন্মাবধি অন্যের দাস হইবে কিন্তু মনুষ্যের শঠতা ক্রমে এই সকল বাধাজনক শৃঙ্খল হইয়াছে ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে নহে।…… স্ত্রীলোকদিগকে অবশ্য মনুষ্য বলিয়া গণনা করিতে হইবেক ইহারা সর্বতোভাবে পুরুষের সঙ্গে সমান কিন্তু আমারদিগের ব্যবস্থা ও ব্যবহারের দ্বারা তাঁহাদের অবস্থা একপ্রকার নীচ করাতে তাঁহারা যে মনুষ্য নহেন এমত প্রকাশ পাইতেছে না বরং আমারদিগের নিষ্ঠুর ব্যবহারেতে তাঁহারদিগের মনুষ্য বোধ করি না এমত প্রকাশ হইতেছে…(১৬)

সতীদাহ তাঁদের চোখে ঘৃণ্য 'নারীহত্যা' ছাড়া কিছুই নয়। সতীদাহ নিবারণ আইনের বিরুদ্ধে "ধর্মসভা" যে আবেদন করেছিল তা প্রত্যাখ্যান করায় তাঁরা সরকারকে অভিনন্দন জানিয়ে এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যে "ধর্মসভার" সমর্থকেরা যতই ক্ষুব্ধ হন না কেন 'নারী হত্যার' পবিত্র অধিকার তারা আর কোনদিনও ফিরে পাবেন না।(১৭)

বহুবিবাহ প্রথার অভিশাপ সম্পর্কেও 'জ্ঞানান্বেষণের' নানা প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে এবং সমাজের বুক থেকে এই কুপ্রথার প্রায় অবসান ঘটেছে বলে কোন কোন মহল দাবী করা সত্ত্বেও নানা তথ্যের ভিত্তিতে এই কুপ্রথার ব্যাপক প্রচলন সম্পর্কে তাঁরা পাঠকদের সজাগ করে দিয়েছেন।(১৮)

বিধবা বিবাহের যে কোন উদ্যোগকেই তাঁরা জানিয়েছেন সানন্দ সমর্থন। অত্যন্ত উল্লাসের সঙ্গে পাঠকদের কাছে তাদের নিবেদন—"……এতদ্দেশীয় কতিপয় সমৃদ্ধ সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা পরামর্শ করিয়াছেন এক সভা করিবেন তাহার অভিপ্রায় এই যে বহু কালাবধি যে সকল কুনিয়মেতে এদেশের নীতি ব্যবহার মন্দ করিয়াছে এবং দেশস্থ লোকেরা যদনুযায়ি কর্ম করিয়া থাকেন অথচ বোধ হয় না তাঁহারদিগের নিমিত্ত সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর সুখের সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ সকল নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইবেক আমরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোকের স্থানে শুনিলাম সভার প্রধান কার্য এই যে এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার্থ চেষ্টা

করিবেন এবং ব্রাহ্মণদিগের কুপরামর্শতে শিশুকালাবধি বিধবার বিবাহ নিষেধ বিষয়ে যে কুসংস্কার হইয়াছে তাহাও বিনষ্ট করিতে হইবেক··· ··"(১৯)

অর্থনীতি চিন্তা

অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় ছিলেন অ্যাডাম স্মিথের চিন্তা-ধারায় প্রভাবিত। উন্নত প্রথায় শিল্প বাণিজ্যের প্রসারই যে এদেশের সমৃদ্ধির একমাত্র উপায় এই সত্যটি তাঁদের অগ্রসর চিন্তার দর্পণে ধরা পড়েছে আর তাই এদেশীয়দের বাণিজ্যের যে কোন উদ্যোগকে তাঁরা জানিয়েছেন সোৎসাহ সমর্থন। 'জ্ঞানান্বেষণের' এক প্রবন্ধে ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করা হয়েছে যে "··· ··যবনাধিকার সময়ে আমারদিগের এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ নানা ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন এবং ধনোপার্জ্জনের নানা উপায় ও কার্য্য করিতেন তাহাতে তাঁহারা স্বাধীন ও সুখী ছিলেন কিন্তু এইক্ষণে ইহারা পূর্ব্বাবস্থা হারাইয়া সরকারগিরি ও কেরাণীর কার্য করিতেছেন···(২০)

বাণিজ্যের দ্বারা ইংলণ্ডের যে ধনাগম হয়েছে এবং তার প্রভাব-প্রতিপত্তি যেভাবে বর্ধিত হয়েছে সেই দৃষ্টান্তের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে পত্রিকা লিখেছে— ··"ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের মূলধনের উত্তমরূপে ব্যবহার্যতাহেতু যে ধনাঢ্যতা ইহা সর্ব্বসাধারণজনকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে কেবল বিদ্যাদ্বারা যে জনদিগের ধনাঢ্যতা সৌভাগ্য হয় এমত তাঁহারা বলেন না বাণিজ্যাদি সহকারে সৌভাগ্যাদি হয়। তন্নিমিত্ত আমরা বলি যে এতদ্দেশীয় জনগণ স্বাভাবিক অলস নিদ্রা প্রভৃতি যে দোষবর্গ তাহা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত বাণিজ্যাদি রূপ অস্ত্রশস্ত্র ধারণপূর্বক সৌভাগ্যের বিরোধী যে কুস্বভাব তাহাকে জয় করিয়া সৌভাগ্যকে প্রবল করুন। আব পরমেশ্বর বহু গুণযুক্তা উর্বরা ভূমি প্রদান করিয়াছে এবং তাহার উপায়ও প্রদান করিয়াছেন ইহা পাইয়া কি উত্তমরূপে ব্যবহার করা উচিত হয় না এই সময়ে অনেকের উত্তমতা ও সভ্যতা হইতেছে অতএব এতদ্দেশীয়দিগের উচিত যে পশ্চিম প্রদেশীয়দিগের যে সকল সদুপায় দ্বারা সভ্যতা হইতেছে সেই সকল সদুপায় সদা আচরণ করেন।(২১)

পত্রিকা ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে যে বাণিজ্যের প্রতি অনীহার জন্য যখন এদেশীয়রা দৈন্যদশায় জর্জ্জরিত তখন এদেশেরই সম্পদ ব্যবহার করে

বিদেশীরা ধনী হয়ে উঠছে। দেশীয়দের উদ্যোগে বাণিজ্যপ্রসারের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে ঐ পত্রিকা লিখছে—

"······আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতদ্দেশীয় কতক মর্য্যাদাবন্ত মহাশয়েরা এই প্রশংসিত অভিপ্রায় করিয়াছেন যে তাঁহারা এক বাণিজ্যের কুঠি স্থাপন করিয়া ঠাকুরাণ কোম্পানী (Tagore and Company) নামে ঐ কুঠির কার্য্য চালাইবেন ইহাতে বোধহয় এদেশের মঙ্গলাকাঙ্খি লোকেরা সাধারণের উপকারজনক এই অত্যাশ্চর্য্য সাহসিক উদ্যোগে অসংখ্য প্রশংসা করিবেন এবং আমরা অনুমান করি এই দৃষ্টান্ত দর্শনে এতদ্দেশীয় লোকেদের মন এইরূপ উত্তমকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া বাণিজ্যকার্য্য করত পুনশ্চ হিন্দুস্থানকে অতিসমৃদ্ধ ও মর্য্যাদাশালী করিবে যাঁহারা প্রথম ২ নম্বরের "জ্ঞানান্বেষণ" পাঠ করিয়াছেন তাহারদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমরা কতকবার লিখিয়াছি অভাগা অনিচ্ছা প্রযুক্তিই এদেশের ধনী লোকেরা বাণিজ্য কার্য্যের পরিশ্রমে প্রবর্ত্ত হন না কিন্তু এইক্ষণে বড আহ্লাদিত হইলাম ঐ লোকেরা যে অবশ বুদ্ধিতে এ বিষয়ে নিদ্রিতের ন্যায ছিলেন তাহা সারিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য অথচ উপকার জনক কর্ম্মে মনোযোগ দিলেন একর্ম যে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য তাহার কারণ এই যে সাধ্যানুসারে দেশের উপকার করাতে সৎলোক মাত্রই বাধ্য আছেন·· দেশস্থ লোকেরা যৎকালে দুর্ভাগ্যক্রমে দৈন্যদশায় পড়িয়া রোদন করেন তখন দূর দেশীয়েরা স্বদেশে বসিয়া পরিবারের সঙ্গে আমারদের জমীর উপস্বত্ব নিয়া স্বচ্ছন্দে সুখভোগ করিতেছেন কিন্তু বোধহয এদেশের দুরবস্থা পরিবর্ত্তনের কাল উপস্থিত হইল এবং পৃথিবীর বাণিজ্যকারি দেশের সহিত পতিত হিন্দুস্থানেরো নাম লিখিত হইবে অতএব আমরা প্রার্থনা করি এইক্ষণে ঠাকুরেরা যে পথ দেখাইলেন এই দৃষ্টান্তে আমারদের দেশীয় লোকেরাও উপকারজনক প্রশংসিত সাহসিক ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হন এবং হিন্দু নামেতে এই যে কলঙ্ক ছিল তাঁহারা নির্ব্বোধ ও নিকর্ম্মা তাহা দূর করেন ইতি·· "(২২)

এই সময় ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে বাষ্পীয় পোত চলাচলের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে তাঁরা বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন। এই উদ্যোগকে দেশের আধুনিকীকরণের একটি মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করে অকাতরে অর্থ সাহায্য করতে দেশবাসীকে আহ্বান জানানো হয়েছে।(২৩) প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় য ইয়ং বেঙ্গল পরিচালিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জী অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে, সামর্থ্য অনুযায়ী

স্বল্প হলেও, সহানুভূতির নিদর্শন হিসাবে ষ্টীম নেভিগেশন কমিটির হাতে ২০০ টাকা অর্পণ করেন।(২৪)

সমকালীন ইওরোপে মার্কেন্টাইল মতবাদ বনাম অবাধ বাণিজ্যনীতি এই নিয়ে যে বিতর্ক চলছিল, ইয়ং বেঙ্গল সেই বিতর্কে ছিল অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে। এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মার্কেন্টাইল নীতি আর তার অত্যন্ত ক্ষতিকর পরিণাম 'জ্ঞানান্বেষণের' পাতায় বারবার আলোচিত হয়েছে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন যে মুনাফাই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, এমন একদল ব্যবসাদারের হাতে দেশের শাসনভার তুলে দিলে এদেশের মানুষ তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য যথাযথ আইন বা সুবিচার কি আশা করতে পাবে? এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শোষণের নানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তাঁবা এই শাসনকে 'অপশাসন' বলে চিহ্নিত করেছেন। কোম্পানীর বিচার ব্যবস্থা তাঁদেব ভাষায় ছিল বিচারের নামে প্রহসন।(২৫)

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে লবণ ও আফিমের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বজায় রাখারও তাঁবা ছিলেন বিরোধী।(২৬)

গণতান্ত্রিক চেতনা

তাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে ইংরেজ শাসনকে দেখেছেন এবং এই মোহ পোষণ করেছেন যে, ইংরেজশাসন দেশের অগ্রগতির সহায়ক হবে। তবে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁবা বিদেশী শাসনের অন্যায় নীতি ও বৈষম্যমূলক অবিচারেব বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন এবং ঔপনিবেশিক কাঠামোর মধ্যে এশীয়দের ন্যায্য অধিকারের দাবীকে তাঁরা যথাসম্ভব জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে তাঁরা ছিলেন খুবই সচেতন। ব্রিটিশ শাসনেব চৌহদ্দির মধ্যে ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার অর্জনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের তাঁরা ছিলেন পক্ষপাতী।

'জ্ঞানান্বেষণের' এক প্রবন্ধে ইণ্ডিয়া বিলের (১৮৩৩) বিভিন্ন ধারার ক্ষতিকর দিকগুলির সমালোচনা করা হয়েছে এবং এই ক্ষতিকর ধারাগুলি বাতিল করার জন্য আবেদন করতে দেশবাসীকে আহ্বান জানানো হয়েছে।(২৭)

চাকুরীর ক্ষেত্রে ভারতীয়দের সম্পর্কে যে বৈষম্যের নীতি চালু ছিল তাঁদের

বিচারে তা অত্যন্ত অন্যায়। মনোনীত একটি বিশেষ গোষ্ঠীকে চাকুরীলাভে সহায়তা করার জন্য হেইলীবেরী কলেজের প্রতিষ্ঠাকে তাঁরা চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান সুযোগের ঘোষিত নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত বলে মনে করতেন। তাঁদের দাবী ছিল ভারতবর্ষের শাসনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে গেলে, বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের ভারতের মাটিতেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। সুদূর হেইলীবেরীতে কলেজ প্রতিষ্ঠা না করে ভাবী কর্মচারী-দের নির্দিষ্টকালের জন্য ভারতে অবস্থান করে এদেশের ভাষা, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা হোক—এই সুপারিশ রয়েছে তাদের লেখায়।(২৮)

প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে শিক্ষিত ভারতীয়রা কোনদিক থেকেই অযোগ্য নয়—এই বক্তব্য নানা প্রবন্ধে বারবার উচ্চারিত হয়েছে।(২৯)

সরকারী চাকুরীতে ভারতীয়দের নিয়োগ সম্পর্কে পার্লামেন্টারী কমিটির কাছে মিঃ মিল যে বক্তব্য পেশ করেন তার সমালোচনা করে তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন যে যদি কোন বিদেশী শক্তি ইংলণ্ড দখল করত এবং ইংলণ্ডের লোকদের বাদ দিয়ে তারাই সব সরকারী কাজে নিযুক্ত হত তাহলে কি ইংলণ্ডের পক্ষে সমুদ্রের ওপর কর্তৃত্ব কবার বা সভ্যতায় এত অগ্রসর হওয়া সম্ভব হত? তাঁদের প্রশ্ন—অনুরূপভাবেই যদি এদেশীয়দের সরকারী কাজে অংশ-গ্রহণের সুযোগ দেওয়া না হয় তাহলে হিন্দুরা 'জাতি' হিসাবে কি কোনদিন বড় হতে পারবে?(৩০)

গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর কাছে সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা ছিল খুবই মূল্যবান। সংবাদপত্রেব স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়ায় তাঁরা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে সাধুবাদ জানালেন এবং তাঁরা এই আশা ব্যক্ত করলেন যে তাঁর উত্তরাধিকারীদের আমলেও এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।(৩১)

এই গণতান্ত্রিক চেতনাই তাঁদের উদ্বুদ্ধ করেছে অন্যায়ভাবে পররাজ্য দখলের প্রতিবাদ জানাতে। পাঞ্জাব সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের আগ্রাসী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করে তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে এই ধরনের 'রাজ্যলিপ্সা' ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে অজানা নয়। তাঁদের মতে দীর্ঘদিন ধরেই ইংরেজ সরকার এদেশে ন্যায়নীতি বিসর্জন দিয়ে, যা কিছু ন্যায় ও মহৎ তা জলাঞ্জলি দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতাবৃদ্ধির অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার নজির স্থাপন করেছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনা প্ররোচনায় জবর দখলের যে দীর্ঘ রেকর্ড স্থাপন করেছে পাঞ্জাব দখলের মধ্যে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। এদেশের মঙ্গলসাধনের সরব ঘোষণার আড়ালে শ্বেতাঙ্গদের লুণ্ঠনবৃত্তি কিভাবে কাজ করে তার পরিচয় দিয়ে লেখা হল—

'......Have they at all consulted the feelings of the people towards their own Government? Are they aware (and be it spoken in their shame) that inspite of their benevolent professions for the good of the country, the natives of British India still continue to think that the white people of the West have come to rob them of all that they possess ?'...(৩২)

কৃষক সমস্যা সম্পর্কে

বুর্জোয়া লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তাঁরা কৃষকের সমস্যাটিকে একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করেছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত কৃষক সমস্যার নানা দিক তাঁদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। 'জ্ঞানান্বেষণের' বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়লে দেখা যায় যে রায়তদের সমস্যাকে তাঁরা যথেষ্ট সহানুভূতির সঙ্গেই বিচার করেছেন।

'জ্ঞানান্বেষণের' এক প্রবন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকসমাজের অসহায় অবস্থার বর্ণনা করে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে নীতি হিসাবে এই বন্দোবস্ত গর্হিত না হলেও এর বাস্তব প্রয়োগের দিকগুলি অত্যন্ত নিন্দনীয় কারণ এর দ্বারা কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে জমিদার সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষারই ব্যবস্থা করা হয়েছে। একদিকে জমিদার-দের অবাধে কৃষক শোষণের অধিকার আর অন্যদিকে কোম্পানীর পক্ষপাতদুষ্ট বিচারব্যবস্থা, বিচারের নামে প্রহসন, কৃষকদের এই অবর্ণনীয় দুর্দশার জন্য দায়ী। প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে যে জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে তাদের লাভের অংশে যেন টান না পড়ে তার ব্যবস্থা করা হল অথচ দরিদ্র শ্রমজীবীদের অধিকারগুলি রক্ষার দিকে একটুও নজর না দিয়ে তাদের উপরিওয়ালার মর্জির ওপর ছেড়ে দেওয়া হল।(৩৩)

এদেশের আদালতগুলি যে দরিদ্র রায়তদের একেবারে নাগালের বাইরে—ব্রিটিশ বিচারব্যবস্থার এই ত্রুটির দিকটি নিয়ে নানা প্রবন্ধে আলোচনা করা

হয়েছে। এক প্রবন্ধে মফস্বল আদালতগুলির বিচারের নামে অবিচারের বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরে বলা হল এই আদালতগুলিতে বিচারে অহেতুক বিলম্ব, বিপুল অর্থব্যয় ও আরও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার ফলে দরিদ্র রায়তরা আদালতে যাওয়ার বদলে মুখবুজে অন্যায় সহ্য করাই শ্রেয় বলে মনে করে।(৩৪)

'জ্ঞানান্বেষণ' আরও লিখেছে—কৃষকদের সম্পত্তি ও জমি ক্রোক করে নেবার, বিনাবিচারে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করার অবাধ অধিকার জমিদাররা পেয়েছেন। তা ছাড়া দ্রুত সংক্ষিপ্ত (summary) বিচারের মাধ্যমে কৃষকদের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে নিজেদের কাজ হাসিল করতে জমিদারদের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এক প্রবন্ধে লেখক বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন যে এই দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত বিচার যা অনেক সুলভ তার সুযোগ জমিদারদের দান করলেও অসহায় কৃষকদের সেই সুযোগ দেওয়া হল না কেন! কৃষকদের সম্পর্কে সরকারের এই বিমাতৃসুলভ মনোভাবের সুযোগ নিয়ে জমিদাররাও নিজেদের বৈধ উপার্জনে সন্তুষ্ট না থেকে কৃষকদের ওপর শোষণের মাত্রাকে নানাভাবে বর্ধিত করে চলেছেন কিন্তু কোনরকমের ন্যায় বিচারের আশা না থাকায় দরিদ্র কৃষকের এই অন্যায় জুলুম মুখবুজে সহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।(৩৫) রায়তদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের উদ্বেগের পরিচয় তাঁদের নিম্নোক্ত মন্তব্যের মধ্যেই পাওয়া যায়—

......'For ourselves, we shall be the most happy to learn on creditable authority that the condition of the ryuts has been bettered, that they are now less subject than before to "the proud man's contumely, the oppresscr's wrong and the law's delay."(৩৬)

অন্য এক প্রবন্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করা হয়েছে যে কোম্পানী এদেশে যতগুলি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেছে কোনটিই রায়তদের আনন্দবিধান করতে সমর্থ হয় নি। কারণ নির্দেশ করে বলা হয়েছে যে, কি টমাস মুনরোর রায়তওয়ারী ব্যবস্থা আর কি কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—সব ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থারই প্রধান লক্ষ্য হল সর্বাধিক রাজস্ব আদায়—আর তাই পরিণামে সবগুলিই ব্যর্থ। লেখক মনে করেন যে, কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল

কৃষকদের খাজনার হার হ্রাস করা। জনগণের হিতসাধনের ওপরই যে সরকারের স্বার্থ নির্ভরশীল এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে লেখক আবেদন করেছেন যে সরকার যেন আইন রচনার সময় কৃষকদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন ফসলের যথেষ্ট ভাগ কৃষকদের হাতে রেখে দেওয়ার কথা মনে রাখেন। কোম্পানীর রাজস্ব নীতির আরও কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করে পরিশেষে লেখক ব্রিটিশ রাজস্ব নীতির এই যে শোষণের চরিত্র, তার বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসাবে বুন্দেলখণ্ডের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।(৩৭)

একথা ঠিকই যে কৃষক সমস্যার সমাধানে তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান অথবা আমূল ভূমি সংস্কারের দাবী কখনও উত্থাপন করেন নি। কৃষকসমাজের তৎকালীন দুর্দশা ও হতাশার পরিমণ্ডলে কৃষক বিক্ষোভের অনিবার্যতা অনুভব করলেও স্বতঃস্ফূর্ত, সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের প্রতি তাঁরা সমর্থন জানান নি। তাঁরা চেয়েছিলেন নিয়মতান্ত্রিক পথে প্রচলিত কাঠামোর মধ্যেই কিছু সংস্কার, যা কৃষকদের দুর্গতি লাঘব করতে কিছুটা সাহায্য করবে। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, একথা স্বীকার করতে হবে যে বুর্জোয়া উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁরা কৃষকের সমস্যাটি দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকসমাজের অবনতি যে একটি জাতীয় সমস্যা সেই সম্পর্কে তাঁরা দেশের মানুষকে সচেতন করলেন।

কাজেই রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজচিন্তা সব দিক থেকেই ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ও তাদের সম্পাদিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা নতুন যুগের নতুন বাণী তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে রুদ্ধস্রোত এই দেশে তারা পশ্চিমের উন্নত বিজ্ঞান, যুক্তিচিন্তাকে প্রবাহিত করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন কোন সংকীর্ণ স্বার্থসাধনে নয়, এই দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে যে এই অগ্রসর আধুনিক সভ্যতাকে গ্রহণ করতে না পারলে জাতির পুনর্জাগরণ সম্ভব হবে না। সাম্প্রতিক কালের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর সঙ্গে নানা সূত্রে যুক্ত এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধতা অবশ্যই চোখে পড়বে। তবে এই সীমাবদ্ধতাও ইতিহাসের বিচারে স্বাভাবিক। সেই যুগের নিরিখে যদি

হয়েছে। এক প্রবন্ধে মফস্বল আদালতগুলির বিচারের নামে অবিচারের বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরে বলা হল এই আদালতগুলিতে বিচারে অহেতুক বিলম্ব, বিপুল অর্থব্যয় ও আরও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার ফলে দরিদ্র রায়তরা আদালতে যাওয়ার বদলে মুখবুজে অন্যায় সহ্য করাই শ্রেয় বলে মনে করে।(৩৪)

'জ্ঞানান্বেষণ' আরও লিখেছে—কৃষকদের সম্পত্তি ও জমি ক্রোক করে নেবার, বিনাবিচারে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করার অবাধ অধিকার জমিদাররা পেয়েছেন। তা ছাড়া দ্রুত সংক্ষিপ্ত (summary) বিচারের মাধ্যমে কৃষকদের প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে নিজেদের কাজ হাসিল করতে জমিদারদের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এক প্রবন্ধে লেখক বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেছেন যে এই দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত বিচার যা অনেক সুলভ তার সুযোগ জমিদারদের দান করলেও অসহায় কৃষকদের সেই সুযোগ দেওয়া হল না কেন! কৃষকদের সম্পর্কে সরকারের এই বিমাতৃসুলভ মনোভাবের সুযোগ নিয়ে জমিদাররাও নিজেদের বৈধ উপার্জনে সন্তুষ্ট না থেকে কৃষকদের ওপর শোষণের মাত্রাকে নানাভাবে বর্ধিত করে চলেছেন কিন্তু কোনরকমের ন্যায় বিচারের আশা না থাকায় দরিদ্র কৃষকের এই অন্যায় জুলুম মুখবুজে সহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।(৩৫) রায়তদের অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের উদ্বেগের পরিচয় তাঁদের নিম্নোক্ত মন্তব্যের মধ্যেই পাওয়া যায়—

......'For ourselves, we shall be the most happy to learn on creditable authority that the condition of the ryuts has been bettered, that they are now less subject than before to "the proud man's contumely, the oppresscr's wrong and the law's delay."(৩৬)

অন্য এক প্রবন্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে এদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে মন্তব্য করা হয়েছে যে কোম্পানী এদেশে যতগুলি ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা চালু করেছে কোনটিই রায়তদের আনন্দবিধান করতে সমর্থ হয় নি। কারণ নির্দেশ করে বলা হয়েছে যে, কি টমাস মুনরোর রায়তওয়ারী ব্যবস্থা আর কি কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—সব ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থারই প্রধান লক্ষ্য হল সর্বাধিক রাজস্ব আদায়—আর তাই পরিণামে সবগুলিই ব্যর্থ। লেখক মনে করেন যে, কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল

কৃষকদের খাজনার হার হ্রাস করা। জনগণের হিতসাধনের ওপরই যে সরকারের স্বার্থ নির্ভরশীল এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে লেখক আবেদন করেছেন যে সরকার যেন আইন রচনার সময় কৃষকদের স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের উদ্দেশ্যে উৎপন্ন ফসলের যথেষ্ট ভাগ কৃষকদের হাতে রেখে দেওয়ার কথা মনে রাখেন। কোম্পানীর রাজস্ব নীতির আরও কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করে পরিশেষে লেখক ব্রিটিশ রাজস্ব নীতির এই যে শোষণের চরিত্র, তার বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসাবে বুন্দেলখণ্ডের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।(৩৭)

একথা ঠিকই যে কৃষক সমস্যার সমাধানে তাঁরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান অথবা আমূল ভূমি সংস্কারের দাবী কখনও উত্থাপন করেন নি। কৃষকসমাজের তৎকালীন দুর্দশা ও হতাশার পরিমণ্ডলে কৃষক বিক্ষোভের অনিবার্যতা অনুভব করলেও স্বতঃস্ফূর্ত, সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহের প্রতি তাঁরা সমর্থন জানান নি। তাঁরা চেয়েছিলেন নিয়মতান্ত্রিক পথে প্রচলিত কাঠামোর মধ্যেই কিছু সংস্কার, যা কৃষকদের দুর্গতি লাঘব করতে কিছুটা সাহায্য করবে। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, একথা স্বীকার করতে হবে যে বুর্জোয়া উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁরা কৃষকের সমস্যাটি দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকসমাজের অবনতি যে একটি জাতীয় সমস্যা সেই সম্পর্কে তাঁরা দেশের মানুষকে সচেতন করলেন।

কাজেই রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজচিন্তা সব দিক থেকেই ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী ও তাদের সম্পাদিত 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা নতুন যুগের নতুন বাণী তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারে রুদ্ধস্রোত এই দেশে তারা পশ্চিমের উন্নত বিজ্ঞান, যুক্তিচিন্তাকে প্রবাহিত করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন কোন সংকীর্ণ স্বার্থসাধনে নয়, এই দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে যে এই অগ্রসর আধুনিক সভ্যতাকে গ্রহণ করতে না পারলে জাতির পুনর্জাগরণ সম্ভব হবে না। সাম্প্রতিক কালের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর সঙ্গে নানা সূত্রে যুক্ত এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সীমাবদ্ধতা অবশ্যই চোখে পড়বে। তবে এই সীমাবদ্ধতাও ইতিহাসের বিচারে স্বাভাবিক। সেই যুগের নিরিখে যদি

বিচার করা যায় তাহলে জাতির বিবর্তনে তাদের অগ্রসর ভূমিকার কথা কে অস্বীকার করবে ?

টীকা ও উদ্ধৃতি

১) Native Improvement, pp. 57-59.
২) ঐ
৩) Character of Hinduism, pp. 93-94.
৪) Native Patsalas, pp 102-103.
৫) Reformation of the Natives, pp. 41-43
৬) Hindoo Publication, pp. 74-77.
৭) The English Language, pp. 142-144.
৮) Conversion of Natives, pp. 108-110.
৯) Hindoo College Versus General Assembly's School, pp. 116-117.
১০) The Christian Religion, p. 126
১১) Death of Ram Mohun Roy, pp. 137-140
১২) সমাগত দুর্গোৎসব ও দেশীয়দের ব্যয়বহুলতা, পৃ: ১৯-২১
১৩) গত সন্ন্যাসবিষয়ক নাচের উপাখ্যান, পৃ: ১৭-১৯
The Imposter of the Bhookylas, pp. 35-36.
The Hypocrisy of the False Devotee Discovered, pp. 36-37.
১৪) Sama Poojah, pp. 86-87.
১৫) শাস্ত্রের শাসন ও স্ত্রীলোক, পৃ: ১৪-১৬
১৬) স্ত্রীলোকদিগের অধিকার, পৃ: ৬১-৬৩
১৭) Thanks for Rejection of the Suttee Petition. p 36
Good Counsel for the Chundrika, p. 38.
স্ত্রী দাহ নিবারণে হর্ষসূচক সভা, পৃ: ৪-৫
১৮) কুলীনদের বহু বিবাহ, পৃ: ২৮-৩০
১৯) মতিলাল শীল ও বিধবা বিবাহ, পৃ: ৪৮-৪৯
২০) মেকানিকস্ ইনস্টিটিউশনের ষাণ্মাসিক সভা, পৃ: ৮৩
২১) ধন উপার্জনের উপায়, পৃ: ৬৪-৬৫
২২) দেশীয় বাণিজ্য উদ্যোগ, পৃ: ২৫-২৬
২৩) Steam Navigation, pp. 72-73.
২৪) ঐ, পাদটীকা, p 72.
২৫) Government of the Company, pp. 61-63
২৬) The India Bill, pp 87-90.
২৭) ঐ
২৮) Haileybury College, pp. 141-142.
২৯) Characteristics of the Hindoos, pp. 55-56.
৩০) Employment of the Natives of India in the Public Service, pp. 59-61.

৩১) Lord William Bentinc's Administration, pp. 50-52.
৩২) Maharajah Ranjeet Singh, pp. 155-158.
৩৩) Revenue System of India, pp 67-70.
৩৪) Jessore Memorial, pp. 70-71
৩৫) Revenue System of India, pp 67-70.
৩৬) Jessore Memorial, pp. 70-71.
৩৭) The India Bill, pp 144-147.

এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতিগুলি নিম্নোক্ত বই থেকে নেওয়া হয়েছে :
'Selections From Jnanannesan', Compiled by Suresh Chandra Maitra, Prajna, August 1979.

"বেঙ্গল স্পেকটেটর" ও আধুনিক চিন্তা

নরহরি কবিরাজ

১৮৪২ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইংরেজী-বাঙলা দ্বিভাষী পত্ররূপে এটি প্রকাশিত হত। এটি ছিল ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর আর এক মুখপত্র। প্যারীচাঁদ মিত্রের সহায়তায় রামগোপাল ঘোষ এই পত্রিকা প্রকাশ করেন। মাত্র দেড় বছর এই পত্রিকা চলেছিল। অতি স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও এই পত্রিকা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে আধুনিকতা প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সাময়িক পত্রগুলি প্রকাশিত হয়েছিল এবং তার মধ্যে যে কয়েকখানি পত্র-পত্রিকা বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে, "বেঙ্গল স্পেকটেটর" নিঃসন্দেহে তাদেরই অন্যতম।

১৮৪২ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে রামগোপাল ঘোষের উদ্যোগে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর একজন প্রধান প্যারীচাঁদ মিত্রের ওপর এর সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। ইংরেজী-বাঙলা দ্বিভাষী মাসিক পত্ররূপে প্রথমে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পাঁচ মাস ধরে মাসিক পত্ররূপে চলার পরে এটি পাক্ষিক পত্রের রূপ গ্রহণ করে। আরও পরে এটি একটি সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়। এই পত্রিকার জীবনকাল ছিল অত্যন্ত স্বল্প। ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে এর জন্ম। আর ১৮৪৩ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত চলার পরে এই পত্রিকাখানিকে আর্থিক লোকসানের দায়ে বন্ধ করে দিতে হয়। খুব অল্প সময়ের জন্যে প্রচারিত হলেও এই পত্রিকা বাঙলার বুকে অগ্রগামী চিন্তাধারা ছড়িয়ে দিতে এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। (১)

এই পত্রিকার ভূমিকা সম্যকরূপে বুঝতে হলে প্রথমে সেই যুগের সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমি মনে রাখা প্রয়োজন।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বিদ্রোহ

এই সময়ে কলকাতায় শিক্ষিত হিন্দু সমাজের একাংশের মধ্যে অভূতপূর্ব এক আলোড়ন আরম্ভ হয়েছিল। সতীদাহ প্রথা, নারী নির্যাতন, জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে এই সময়ে একদিকে রামমোহন, এবং অন্যদিকে ডিরোজিও ও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের নেতৃত্বে এক বড় রকমের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ—এক কথায় বুর্জোয়া লিবারেল জীবনদৃষ্টির প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে বাঙলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রতিটি অনুশাসনকে এই সময়ে যাচাই করে নেবার এক দুর্দমনীয় আবেগ শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের একাংশের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছিল।

অপরদিকে এই আঘাত থেকে হিন্দুসমাজকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে এই সময়ে 'ধর্মসভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলি এই 'ধর্মসভা' আন্দোলনের প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠলেন। তবে লক্ষ্য করার বিষয়, এই আন্দোলনেও নেতৃত্ব করতে এগিয়ে এলেন ইংরেজী শিক্ষিত সমাজের একাংশ—রাজা রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন প্রভৃতি। এঁদের সহযোগী হলেন একদল দেশীয় পণ্ডিত, যাঁরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' হয়ে উঠল এই আন্দোলনের মুখপত্র। এই আন্দোলন ইওরোপের অগ্রগামী চিন্তাধারা, বিশেষ করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার আক্রমণ থেকে সমাজকে নিরাপদ রাখার সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন এবং 'স্বাদেশিকতা'র নামে সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে তৎপর হলেন।

বেঙ্গল স্পেকটেটরের পাতায় নতুন ও পুরাতনের এই সংঘর্ষ, বিশেষ করে এই সংঘর্ষের নীতিগত দিকটি, অতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল।

হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে এই সময়ে যে নব্যপন্থী আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল এই পত্রিকার পরিচালকেরা ছিলেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই পত্রিকা থেকে জানা যায় যে হিন্দু কলেজে তখন পাঁচশত ছাত্র অধ্যয়ন করত। ঐ অধ্যয়নকারী ছাত্রদের মধ্যে বড়লোকের ছেলের সংখ্যা ছিল অল্প। ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে—এই পাঁচশত ছেলের মধ্যে মাত্র ২০ জন ছাত্র

পিতার সম্পত্তির ওপর নির্ভর করে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। বাকী ৪৮০ জনকেই হয় সরকারী চাকুরী নয় সওদাগরি অফিসে কেরানীর চাকরী নিয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জীবিকা অর্জন করতে হবে" (২) (জুলাই, ১৮৪২)।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সামাজিক অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা যুগধর্মকে আকণ্ঠ পান করার জন্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ঐ পত্রিকার পাতায় বলা হয়েছে দেশে এমন একটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছে, যাঁদের চেতনা ও অনুভূতি নতুন ধরনের, যাঁরা জানেন কোন্ ভাবধারার সাহায্যে দেশের উন্নতি বিধান করা সম্ভব (এপ্রিল, ১৮৪২)।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের যে পাঠক্রম অনুসরণ করতে হত তার মধ্যে দিয়ে তাঁদের ইওরোপের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় ঘটত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় তারা অ্যাডাম স্মিথের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। অ্যাডাম স্মিথ ও তৎকালীন অন্যান্য অর্থনীতিবিদেরা এই সময়ে অবাধ বাণিজ্যের যে নীতি ব্যাখ্যা করেন তাঁরা তাঁর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন (জুন ১, ১৮৪৩)। ম্যালথাসের চিন্তার সঙ্গেও তাদের পরিচয় ছিল। ম্যালথাসের নৈতিক সংযম (moral restraint) নীতিরও তাঁরা উল্লেখ করেছেন (মে ১৭, ১৮৪৩)। বেন্থাম প্রচারিত দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি তাঁরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতেন। (ঐ)

মোট কথা, আাডাম স্মিথ, ম্যাল্থাস, বেন্থাম প্রভৃতির চিন্তার প্রেরণায় তাঁরা একদিকে সামন্ততান্ত্রিক জীবনদৃষ্টির অসারতা এবং অন্যদিকে বুর্জোয়া জীবনদৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ক্রমশ অবহিত হতে থাকেন।

ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সচেতন সংগ্রাম পরিচালনা করা এই পত্রিকার প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই পত্রিকা সামন্ততান্ত্রিক জীবন-দৃষ্টির অবসান ঘটিয়ে বুর্জোয়া জীবনদৃষ্টি অনুযায়ী সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন করার বিশেষ পক্ষপাতী ছিল।

প্রথমে রামমোহন ও পরে ডিরোজিওপন্থীদের নেতৃত্বে সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনগুলির বিরুদ্ধে অভিযান যখন সংগঠিত হতে থাকে, তখন প্রাচীন-পন্থীরা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। এই অভিযানের গতিরোধ করার জন্যে 'ধর্মসভা'

জাতি-ধর্মের বেড়াজালকে আরও শক্ত করে গড়ে তোলার জন্যে পাল্টা অভিযান আরম্ভ করে। ধর্মসভার এই অভিযানের বিরুদ্ধে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' তীব্র মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে।

বেঙ্গল স্পেকটেটর প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করল—হিন্দু কলেজের ছাত্রদের চিন্তা-তরঙ্গের গতিরোধ করার শক্তি হিন্দু সমাজের নেই (নভেম্বর ১, ১৮৪২)।

ঘোষনা করা হল—হিন্দুধর্ম বলে আজ যা প্রচলিত তার পতন অনিবার্য—কেননা সামাজিক সুখ ও জাতীয় মর্যাদার সঙ্গে এই ব্যবস্থা সঙ্গতিহীন। (ঐ) তাঁরা আরও বললেন—প্রচলিত হিন্দুধর্মের অনুশাসনগুলি "প্রকৃতি, যুক্তি ও বৈদিক চিন্তার সঙ্গেও সামঞ্জস্যহীন" (ডিসেম্বর ১, ১৮৪২)।

পত্রিকার স্তম্ভে মন্তব্য করা হয়েছে—আজ আমাদের সামনে একটি নতুন উষার উদয় হতে চলেছে। যুগের সঙ্গে তাল ফেলে চলতে হলে সংস্কার প্রয়োজন হয়েছে। চিন্তাজগতে যে দাসত্ব এতদিন জাতীয় মনকে জড়পদার্থ করে রেখেছিল, আজ তা দূর হতে চলেছে, সত্যানুসন্ধানের স্পৃহা ক্রমশ সেই স্থান দখল করেছে। (ঐ)

এই দৃষ্টিকোণ থেকে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮৩৫) ঘটনাটিকে স্বাগত জানিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে—এতে শুধু চিকিৎসা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অগ্রগতি দেখা দেবে তাই নয়, এই ঘটনাটি যুগ যুগ সঞ্চিত কুসংস্কারের পরাজয় সূচিত করছে এবং জ্ঞান ও মুক্তির অগ্রগতির ইঙ্গিত বহন করছে (জানুয়ারি ১, ১৮৪৩)।

জাতিভেদ প্রথার তীব্র নিন্দা করে মন্তব্য করা হয়েছে—তিরস্কার এবং শাসানির দ্বারা এই প্রথাকে জিইয়ে রাখা আর সম্ভব নয় (নভেম্বর ১, ১৮৪২)।

গোঁড়া হিন্দুরা এই সময়ে খুব ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপূজার আয়োজন করত। বাইনাচ ও অশ্লীলতা ছিল এই উৎসবের অঙ্গ। এই পত্রিকা মন্তব্য করেছে—এই ধরনের পূজা নিরক্ষরতা ও কুসংস্কারের চিহ্ন বহন করে। দেশের মানসিক উন্নতি যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি এই সমস্ত কুসংস্কারও মন্দীভূত হয়ে আসবে (অক্টোবর ১০, ১৮৪৩)।

কৌলীন্য প্রথার তীব্র নিন্দা করে বলা হয়েছে—এই প্রথা ন্যায়বিচার ও মানবতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূণ্য। (জুলাই ১৬, ১৮৪৩)

মেয়েদের অধিকারের প্রশ্নটিকে তাঁরা জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধির

ও বিচার ক্ষমতার উন্মেষের আগেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়ার তাঁরা বিরোধী ছিলেন। তাঁদের মতে পাত্র ও পাত্রীর সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয় (মে, ১৮৪২)।

বিধবা বিবাহের পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে তাঁরা বললেন—ছেলেদের যদি দ্বিতীয়বার বিবাহের অধিকার থাকে তাহলে মেয়েদেরই বা সেই অধিকারে বাধা কোথায় (এপ্রিল, ১৮৪২)। প্রকৃতি ও যুক্তির প্রশ্ন তুলে বিধবা বিবাহের সমর্থনে অগ্রসর হয়ে ঐ পত্রিকায় মন্তব্য করা হল—কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি যদি বিধবা বিবাহে উদ্যোগ গ্রহণ করেন তাহলে সেটি নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে (জুলাই, ১৮৪২)।

ইংরেজ শাসনের ভূমিকা

ইয়ং বেঙ্গল দল মনে করতেন—সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ—এই প্রক্রিয়াটি সারা বিশ্বে সামাজিক অগ্রগতির দ্বার উন্মুক্ত করেছে। তাঁরা ভাবলেন ভারতের ক্ষেত্রেও এটি কল্যাণকর হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইংরেজ শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে ধনতান্ত্রিক বিকাশের যে উপকরণগুলি উন্মুক্ত হয়েছিল তাকে তাঁরা স্বাগত জানান। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তাঁরা ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে বাষ্পীয় যান চলাচলের প্রবর্তনকে অভিনন্দন জানান (ডিসেম্বর ১, ১৮৪২)। ১৮৩৮ খ্রী: বর্ধমান, রাজমহল ও পালামৌ অঞ্চলে কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়। এই পত্রিকার পাতায় মন্তব্য করা হল—এই শিল্পটি সুবিবেচনার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারলে দেশের উপকার হবে। আরও বলা হল এই শিল্পে দেশীয় পুঁজি বিনিয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। এই খনি আবিষ্কার হবার ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে এবং প্রতিটি দিক থেকে এটি দেশের স্বার্থের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়ে উঠবে (মে, ১৮৪২)।

ঐ পত্রিকার পাতায় বাঙলায় ইসিংগ্লাস শিল্পের ক্রমপ্রসার দাবি করে বলা হয়েছে—এই জিনিসটির ইওরোপের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা হতে পারে। ধনী ভারতীয়দের আহ্বান করা হল—এই ধরনের বাণিজ্য ব্যবসায়ে পুঁজি বিনিয়োগ করুন। তাতে গরীব মানুষের জীবিকার একটি সূত্র আবিষ্কার হতে পারে (অক্টোবর ১, ১৮৪২)।

ইংরেজ শাসন ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের উপকরণগুলি প্রবর্তন করার ব্যাপারে মাধ্যম হিসাবে কাজ করতে পারে এই মোহ তাঁরা প্রথমদিকে

পোষণ করতেন। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের এই ধারণাটির মিল খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা আক্ষেপের সুরে বললেন—বড়ই পরিতাপের বিষয়—"গ্রেট ব্রিটেনের মত একটি উদারতাবাদী দেশ ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানা বাধার সৃষ্টি করছে। অথচ ভারত থেকে গ্রেট ব্রিটেন কত লাভই না করে থাকে (জুন ১, ১৮৪৩)।

বিষয়ীগতভাবে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে মোহ থাকলেও বিষয়গতভাবে তাঁরা বুঝতে পারলেন যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থ ও ভারতবাসীর স্বার্থের মধ্যে বেশ বিরোধ বর্তমান। তাই তাঁরা লিখলেন—আমাদের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করতে হলে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের দেশের লোকদের নিজেদের স্বার্থে এই সম্পদের সদ্ব্যবহার করতে শিখতে হবে : একমাত্র তাহলেই আমাদের স্বর্ণ, যা আজ ইওরোপে চালান যায়, তার বহিঃস্রোত কিছুটা স্তব্ধ হতে পারে এবং এদেশে প্রবেশকারী মুনাফাখোরদের এদেশের বাজার থেকে বিতাড়িত করাও সম্ভব হতে পারে (সেপ্টেম্বর ১৫, ১৮৪২)।

তাঁরা ঘোষণা করলেন—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া কর্তৃত্ব দেশের উন্নতির পক্ষে বাধা সৃষ্টি করছে। অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্ব উল্লেখ করে তাঁরা বললেন—কোম্পানীর একচেটিয়া কর্তৃত্বের নীতির অবসান ঘটিয়ে অবাধ বাণিজ্যের নীতি চালু করা হোক।

তাঁরা দাবি করলেন—ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশগুলির (যেমন কানাডা) সঙ্গে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, ব্রিটেনের শুল্ক-সমতা স্থাপন করা কর্তব্য। তাহলে ভারতের গমের জন্যে ইংলণ্ডের বাজার খুলে যাবে, যার ফলে এদেশের বণিকদের জীবিকার সংস্থান হবে। কৃষকেরও তাতে কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে (জুন ১, ১৮৪৩)। আরও মন্তব্য করা হল : ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের পক্ষে এই প্রতিযোগিতার নীতি পছন্দসই হবে না, কেননা এটি হবে তাদের স্বার্থের ও মেজাজের প্রতিকূল। এই অবস্থায়, দেশীয়দের ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ আইনসভার কাছে বারবার দরখাস্ত করতে হবে, যাতে শেষপর্যন্ত যুক্তি ও ন্যায়বিচারের কণ্ঠস্বর ব্রিটিশ রাণীর হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হতে পারে (সেপ্টেম্বর ১৫, ১৮৪২)।

জমিদার ও রায়ত

এই পত্রিকার সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র নিজে কৃষক সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে

বিশেষ সজাগ ছিলেন। তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ—"জমিদার ও রায়ত"(৩)—তখনকার দিনে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জোগায়।

বেঙ্গল স্পেকটেটরের পাতায় কৃষক-সমস্যা নিয়ে বহু প্রবন্ধ, চিঠি ও মন্তব্য প্রকাশিত হত। একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে—ইংরেজ আমলে যে ধরনের কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে তার মত শোষণমূলক ব্যবস্থা এই দেশে পূর্বে কখনও দেখা যায় নি। ইংরেজের সৃষ্ট দশশালা বন্দোবস্তে মুসলমান আমলের চতুর্গুণ রাজস্ব ধার্য করা হয়েছে। ইংরেজ আমলে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে সরকার পক্ষের যেমন চেষ্টার ত্রুটি নেই, তেমনি জমিদারেরা যাতে প্রজাদের ঠেঙিয়ে শেষ কানাকড়িটি পর্যন্ত আদায় করতে পারে তার আইনগত সমস্ত রকমের বন্দোবস্তও করা হয়েছে। আক্ষেপ করে বলা হয়েছে—১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনে প্রজার কল্যাণসাধনের জন্যে মাঝে মাঝে আইন প্রবর্তন করা হবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা কখনই প্রতিপালিত হয় নি (অক্টোবর ১৫, ১৮৪২)।

ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর একজন প্রধান নেতা দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি ফৌজদারী বালাখানায় অনুষ্ঠিত একটি সাপ্তাহিক অধিবেশনে হিন্দু, মুসলমান ও ব্রিটিশ আমলে কৃষকের অবস্থা কিরূপ ছিল তার তুলনামূলক একটি বিবরণ পেশ করে মন্তব্য করেন—দেশীয় সরকারের আমলে জমির ওপর ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত ছিল। ইংরেজ-পূর্ব যুগে জমিদারেরা ছিল রাজস্ব আদায়কারী মাত্র। তাদের জমির স্বত্বাধিকারী বলে মেনে নিয়ে ইংরেজ শাসকেরা গুরুতর ভুল করেছেন। ফলে, জমির ওপর নির্ভরশীল অসংখ্য লোক তাদের স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উপরোক্ত সভায় একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়। তাতে বলা হয়—জমিদার ও রায়তদের মধ্যে অসম্প্রীতির উদ্ভব হয়েছে। এই অবস্থাটি বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করা হোক। এই সমিতি উভয় পক্ষের সাক্ষ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে এবং যাতে পুরানো দিনের পিতৃসম সম্পর্ক উভয়ের মধ্যে পুনঃস্থাপিত হয় তার জন্যে চেষ্টা করবে (এপ্রিল ১৭, ১৮৪৩)।

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই পত্রিকা সরকার যখনই জমিদারদের ওপর নির্যাতন-মূলক ব্যবস্থা (যেমন, বিক্রয় আইন) অবলম্বন করত তখন তার সমালোচনা করত, আবার জমিদারেরা যখন এই অজুহাতে নিজের ঘাড়ের বোঝা কৃষকের ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করত তখন জমিদারদের সেই আচরণেও তারা তীব্র

নিন্দা করত। জমিদার-কৃষকের দ্বন্দ্বে তাঁদের সহানুভূতি ছিল নিঃসন্দেহে কৃষকের পক্ষে (অক্টোবর ১৫, ১৮৪২)।

লক্ষ্য করার বিষয়, জনৈক পত্রলেখক দীর্ঘ ও ধারাবাহিক এক চিঠিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তার ফলাফলের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন—জমিদারদের অত্যাচার প্রজার দুর্দশার মূলে—এটি একটি প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছে। এর প্রধান কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, এই বন্দোবস্তের জনক জমিদারদের বিশেষ ক্ষমতায় ভূষিত করেছেন। ১৭৯৩ সালের ১৭নং আইনের ২ ধারা অনুযায়ী জমিদারদেব কৃষকেব সব কিছু অপহরণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। পত্রপ্রেরক এই আইনটিকে সভ্য দেশের আইন পুস্তকে যে জঘন্যতম আইনগুলি রয়েছে তার অন্যতম বলে অভিহিত করেছেন (নভেম্বর ১, ১৮৪৩)।

কেবল জমিদারদের নিন্দা করেই 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' নিজের কর্তব্য সাঙ্গ করে নি। এই ব্যাপাবে সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্বের কথা তুলে ধরে এই পত্রিকা মন্তব্য করেছে—সরকার জমিদারদের প্রজাপীড়নের অনুমতি দান করেছে, যাতে তাবা অনুরূপভাবে জমিদার পীডনেব সুযোগ পায়। যেন তেন প্রকারেণ রাজস্ব আদায়—এই হল সবকারের একমাত্র লক্ষ্য (নভেম্বর ১, ১৮৪৩)।

ঐ পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়েছে—খাজনা বৃদ্ধি, মহাজনদের অত্যাচার এবং বে-আইনী আবয়াব এই তিনটি প্রজাপীড়নের মূল যন্ত্র।

প্রজাপীড়নের নানা কৌশল সম্পর্কে এক পত্রপ্রেরক লিখেছেন—জমিদারদের অত্যাচারের শেষ নেই। তারা কৃষকের সম্পত্তি লুট করে ঘর জ্বালিয়ে দেয়, কাছারিবাড়ীতে বন্দী করে, জেলে পাঠায় (নভেম্বর ২০, ১৮৪৩)।

ইংরেজের আদালতগুলিতে চলে আইনের প্রহসন। জমিদার-কৃষক বিরোধ নিয়ে ছোট আদালতগুলিতে এই সময় বহু মামলা জড়ো হয়ে যেত এবং দায়সারাভাবে এই মামলাগুলোর বিচার হত। ফলে কৃষকদের হত সমূহ ক্ষতি। মন্তব্য কবা হল—এই মামলাগুলি কৃষকের কাছ থেকে রাজস্ব নিঙড়ে বার করার যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

নিপীড়িত অত্যাচারিত কৃষকেরা মরীয়া হয়ে শেষ উপায় হিসাবে যে কখনও কখনও প্রতিরোধের পথ বেছে নিতে বাধ্য হত তারও উল্লেখ এই পত্রিকার পাতায় রয়েছে। একটি উদাহরণ দিয়ে বলা হল—কৃষক নেতারা

মিলিত হয়ে অত্যাচারের প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। 'ধর্মঘট' (দৈবসত্ত্বার প্রতীক) সামনে রেখে তাঁরা সমস্ত কৃষকের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন—তাঁরা একসঙ্গে চলবেন এবং খাজনা বৃদ্ধির দাবি তাঁরা এক-জোট হয়ে প্রতিরোধ করবেন (আগস্ট ১৬, ১৮৪৩)।

কৃষক সমস্যার গুরুত্ব সম্পর্কে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' সজাগ ছিল—এই কথা বলাই যথেষ্ট নয়। কৃষকের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল আন্তরিক। তাই কিছু কৃষি সংস্কার দাবি করা হয়। এই উদ্দেশ্যে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র পক্ষ থেকে (যার পুরোভাগে ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতারা) 'কৃষকের অবস্থা' সম্পর্কে একটি বিশদ রিপোর্ট তৈরী কবার চেষ্টা হয়। এই রিপোর্ট রচনার প্রস্তুতি হিসাবে বেঙ্গল স্পেকটেটরের পাতায় একগুচ্ছ প্রশ্ন উত্থাপন করে একটি প্রশ্নমালা ছেপে বার করা হয় এবং এইসব প্রশ্ন সম্পর্কে পাঠকদের মতামত জানতে চাওয়া হয়।(৪) এই প্রশ্নগুলি ছিল বিস্তারিত এবং কৃষকের অবস্থার খুঁটিনাটি অনেক তথ্য এতে জানতে চাওয়া হয়েছিল (জুলাই ১৬, ১৮৪৩ এবং জুলাই ২৪, ১৮৪৫)।

এই প্রশ্নমালা রচনা থেকে বোঝা যায় বেঙ্গল স্পেকটেটর কৃষকের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্যে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁদের এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে কৃষকের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি হবে না। তবে তাঁরা কৃষক সমস্যার কোনো যথাযথ সমাধানের পথ আবিষ্কার করতে পারেন নি। জমিদারদের অত্যাচারের তীব্র সমালোচনা করলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান তাঁরা কখনও দাবি করেন নি। তাঁরা ছিলেন সংস্কারবাদী। তাঁরা মনে করতেন—একমাত্র শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই কৃষক সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাঁরা বিশ্বাস করতেন—মফঃস্বলে যদি শিক্ষার বিস্তার ঘটে তাহলে জমিদার ও রায়ত উভয়েই নিজ নিজ স্বার্থ এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে। শিক্ষা-বিস্তার ঘটলে গ্রামাঞ্চলের সংঘর্ষ ও পীড়ন—যা কৃষির উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকর—তা ক্রমশ বিদূরিত হবে (জানুয়ারি ১, ১৮৪৩)।

এইভাবে কৃষক সমস্যার গুরুত্বের প্রতি বেঙ্গল স্পেকটেটর ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পথ অনুসরণ করে পরবর্তীকালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'সোমপ্রকাশ', 'সাধারণী', 'গ্রাম-বার্তা

প্রকাশিকা', 'বঙ্গ দর্শন' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকাগুলি কৃষক-সমস্যা নিয়ে নানা আলোচনার অবতারণা করে।

উপসংহারে বলা যায়, ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষে বেঙ্গল স্পেকটেটরের দান কম নয়। সংস্কারবাদের ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গীতে বুর্জোয়া লিবারেল চিন্তাধারার প্রচারে এই পত্রিকা এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র ভূমিকা

নরহরি কবিরাজ

প্রথম প্রকাশ ১৬ আগস্ট, ১৮৪৩। এই পত্রিকা ছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত ব্রাহ্ম আন্দোলনের মুখপত্র। প্রথম বার বৎসর অক্ষয়কুমার দত্ত এই পত্রিকার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম দিকে এই পত্রিকার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও যোগাযোগ ছিল। বাঙলার নব-জাগরণের স্রোত-ধারাটি যে-সব পত্র-পত্রিকা পরিপুষ্ট করতে সাহায্য করেছিল "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ছিল তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিল। তবে তার মধ্যে প্রথম পঁচিশ বছর এই পত্রিকার সবচেয়ে গৌরবের যুগ। প্রথম পর্বে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি।

এই পত্রিকা নিয়ে ইতিপূর্বে নানাবিধ সংকলন, বই, প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে।(১) তাতে এই পত্রিকার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান প্রবন্ধের পরিধি সীমাবদ্ধ। এই পত্রিকার এমন কতকগুলি দিক—যা লেখকের মনে হয়েছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অথচ অপেক্ষাকৃত অনালোচিত—সেই দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ধর্ম ও যুগচেতনা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল ব্রাহ্ম আন্দোলনের মুখপত্র। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ধর্মের ভাবে ও ভাষায় ভারতের জাতীয় উন্নতি ও সামাজিক অগ্রগতির পথনির্দেশ করা।

একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা হয়েছে—বিশ্বের পরিবর্তন ও সভ্যতার পরিবর্তনের সঙ্গে ধর্মকেও নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। তা না

হলে ধর্মের প্রাণধর্ম বিনষ্ট হয়, গোঁড়ামী সেই জায়গা দখল করে, যেমন হয়েছে—বর্তমানে হিন্দুধর্ম, ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের বেলায়।

ধর্মের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের অগ্রগতির সম্পর্ক বিচার করে ঐ প্রবন্ধে লেখা হয়েছে—"প্রধান প্রধান ধর্মশাস্ত্র প্রচলিত হইবার পর, কৃষি-বিদ্যা, শিল্প-বিদ্যা, নাবিক-বিদ্যা, বাণিজ্য-ব্যবসায়, রাজ্যশাসন, শিক্ষাপ্রণালী, ইত্যাদি অশেষ বিষয়ের যাদৃশ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।" তত্ত্ববোধিনীর মতে—বর্তমানে ভারতেও নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন ধর্ম প্রচারের প্রয়োজন—এমন ধর্ম যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান আত্মস্থ করবে, যা সমস্ত রকমের মতান্ধতার ঊর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করবে। তার দাবী: ব্রাহ্ম আন্দোলন সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে।

ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে ঐ প্রবন্ধে বলা হয়েছে—"ব্রাহ্মধর্মসংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই নিরূপিত হইবার নহে, আমাদিগের এরূপ অভিপ্রায় নহে। ধর্মবিষয়ে ইতিপূর্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে, এবং উত্তরকালে যাহা কিছু নির্ণীত হইবে, সে সমুদায়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্মের অন্তর্গত।...আমরা ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সমাজের ন্যায় ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষা করিতে ভীত হই না, এবং ইওরোপীয় খ্রিষ্টিয় সম্প্রদায়ের ন্যায় কোন অভিনব বিদ্যার প্রচার দেখিয়াও কম্পিত হই না। আমরা অবনি-মণ্ডল সচল শুনিয়াও শঙ্কিত হই না, এবং তদর্থে ক্রুদ্ধ হইয়া পিসা নগরীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে নিগ্রহ করিতেও প্রবৃত্ত হই নাই। আমরা ইতিপূর্বে ভূতত্ত্ববিদ্যার উৎপত্তি শুনিয়াও সচকিত হই নাই এবং অধুনা জর্জ কুম্ব প্রণীত অদ্ভুত পুস্তক প্রচার বিষয়েও প্রতিকূল হই নাই। অখিল সংসারই আমাদিগের ধর্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য। ভাস্কর ও আর্য্য এবং নিউটন ও হর্শেল যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদিগের শাস্ত্র। গৌতম ও কণাদ এবং গাল ও বেকন যে কোন তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র। কঠ ও তলবকার, মূষা ও মহম্মদ, যিশু ও চৈতন্য, এবং পার্কার ও লেহন্ট পরমার্থ বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম। আমাদেব ব্রাহ্মধর্মের ক্রমে ক্রমে কেবলই শ্রীবৃদ্ধি হইবে, এবং শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উত্তরোত্তর অনির্বচনীয় রূপ উৎপন্ন হইবে।(২)

ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে যুগধর্মের সম্পর্ক—যা ছিল ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রগতিশীলতার প্রধান উৎস—সেই দিকটি এই উপরোক্ত প্রবন্ধে বেশ ভালোভাবেই প্রতিফলিত হয়েছে।

বিজ্ঞান অনুশীলন

বিজ্ঞান-অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তাব দিকটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিশেষ জোরের সঙ্গে তুলে ধরেছিল। আরও লক্ষ্য করার বিষয়—"স্বদেশীয় ভাষায়" বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি এই পত্রিকা শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ঐ পত্রিকার পাতায় লেখা হল:, —"জগৎ কার্য্যের আলোচনা দ্বারা জগদীশ্বরের জ্ঞান প্রকাশ করা, এ কার্য্যের সীমা কোথায়? সম্যকরূপে ইহার সমাধান জন্য শারীরিক বিদ্যা, মানসিক বিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি স্বদেশীয় ভাষাতে প্রকাশ করা" —এগুলি হবে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লক্ষ্য।(৩)

শুধু বিজ্ঞান-অনুশীলন নয়, সমাজ-কল্যাণের কাজে বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তার দিকটি তুলে ধরে বলা হল ছাত্রদিগকে সুশিক্ষিত করে তোলার জন্যে নতুন ধরনের পাঠক্রম প্রবর্তন করা উচিত। "ছাত্রদিগকে ইংরাজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিবার নিমিত্ত অনুবাদ, রচনা ও সাহিত্য ইতিহাস, ভৌতিক, শারীরিক ও ধর্মবিষয়ক নিয়ম উপদেশার্থে গণিত, পদার্থ-বিদ্যা, শারীর বিধান ও নীতিবিদ্যা, অল্পকালে সুলভে অধিক শিক্ষাদানার্থে চেম্বর্স এডুকেশনল কোর্স নামক গ্রন্থাবলী বা তাদৃশ সুপ্রণালীসিদ্ধ অন্যান্য পুস্তক; ও সসম্ভ্রমে ধনোপার্জনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত লোকযাত্রাবিধান, রাজনিয়ম, ও নানাপ্রকার শিল্পবিদ্যা, এই সমস্ত বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষা দেওয়া, এবং বাঙ্গালা ভাষা অধ্যয়ন বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ প্রদান করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।"(৪)

এই পত্রিকার পাতায় ধারাবাহিকভাবে পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। এর মধ্যে মাঝে মাঝে বিজ্ঞান-বিষয়ক সচিত্র প্রবন্ধও প্রকাশ করা হত।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞান-বিষয়ক যে-সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলির কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে—যেমন,

বিসুবিয়াস নামক আগ্নেয়গিরি, প্রকভুজ, জলপ্রবাহ, বীবর, উষ্ণ প্রস্রবণ, বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম, ক্রুবুল পুষ্প, বেলুন, জলস্তম্ভ, জোয়ারভ'াটা, হিমশিলা, বল্মীক, নৈসর্গিক সেতু, প্রবাল কীট, কীটানু, উল্কাপিণ্ড, পৃথিবী ও মনুষ্য, সিপিয়া মৎস্য, ওক বৃক্ষ প্রভৃতি।

শিল্প-বিপ্লব ও মানবজাতির অগ্রগতি

ইওরোপে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি মানবজাতির সামনে যে নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করে দিয়েছে—এ সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী ছিল অতীব সচেতন। শিল্প-বিপ্লব ও তার ফলাফল মানবজাতির সামনে যে অতুল ঐশ্বর্য উন্মুক্ত করেছে তার বর্ণনা দিয়ে ঐ পত্রিকার পাতায় বলা হয়েছে—"জগদীশ্বর মানবজাতিকে যে প্রকার পরমাদ্ভুত শিল্পযন্ত্র নির্মাণে সমর্থ করিয়াছেন, আমরা তদ্দ্বারা অল্পকালের মধ্যে প্রচুর-প্রমাণ খাদ্য পরিধেয় প্রস্তুত করিয়া বিদ্যানুশীলন, ধর্মানুষ্ঠান এবং পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিমিত্ত যথেষ্ট সময় প্রাপ্ত হইতে পারি। আমরা শিল্পযন্ত্রের উন্নতি সম্পাদন বিষয়ে যত সমর্থ হইব, বিষয়কর্মের কাল ন্যূন করিয়া বুদ্ধি ও ধর্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ততই অবসর প্রাপ্ত হইতে পারিব।"(৫)

সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বিপ্লবের কুফলগুলি বিশেষ করে এর ফলে সমাজে যেভাবে শ্রেণী-বিভাজন বৃদ্ধি পেয়েছে সেই দিকটি তুলে ধরে মন্তব্য করা হয়েছে—"এক্ষণে লোকের সুখ-স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ বিষয়ে অত্যন্ত ইতরবিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহবা অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া আপনার ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করত আমোদ-প্রমোদে কালহরণ করিতেছে, কেহবা কেবল ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করিয়া কষ্টসৃষ্টে কোনক্রমে উদর পূরণ করিতেছে। অতএব, সর্বসাধারণের সুখ-সম্ভোগ বিষয়ের পরস্পর ন্যূনাধিক্য যতদূর নিরাকৃত হইতে পারে, ন্যায়ানুগত উপায় দ্বারা তাহার চেষ্টা করা উচিত।" বুর্জোয়া লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সমস্যার সমাধান নির্দেশ করে লেখা হল: "এই বিষয় সমাধানার্থ উচ্চ-পদারূঢ় সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে পদচ্যুত করিয়া অসম্পন্ন হীন লোকের সমান করিবার নিমিত্ত যত্ন করা উচিত নহে, প্রত্যুত, যাহাতে অসম্পন্ন লোকেরা ক্রমশঃ সম্পন্ন ও সুখী হইতে পারে, তদর্থেই যত্ন পাওয়া বিধেয়। লৌকিক ব্যবহার ও রাজকীয় ব্যবস্থা এ বিষয়ের যত অনুকূল হইতে পারে, তাহাই করা কর্তব্য।"(৬)

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধন-বৈষম্য যেভাবে মাত্রাধিক্য লাভ করছে তা দেখে প্রবন্ধকারের মন পীড়িত। তাই তিনি লেখেন—"যদি অধর্ম নিবারণ ও কল্যাণ সাধন অধুনাতন রাজপুরুষদিগের রাজ্যশাসনের অন্তরঙ্গ সাধন বলিয়া হৃদয়ঙ্গম থাকিত, তাহা হইলে ন্যায়বিরুদ্ধ বাণিজ্য, প্রজাদিগের জ্ঞান ও ধর্মোন্নতি বিষয়ে যথোচিত যত্নবিরহ, দুঃখীদিগের দুঃখ দূরীকরণ বিষয়ে রাজ্যব্যবস্থার অসদ্ভাব ইত্যাকার সহস্র প্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহার তাঁহাদের রাজ্যমধ্যে দৃষ্ট হইত না।......তাঁহারা প্রজাগণের নিকট কপর্দকমাত্র কর পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু তাহারা উপজীবিকা লাভে অসমর্থ হইয়া অনাহারে মৃতপ্রায় হইলেও, তাহাদের দুঃখ দূরীকরণের উপায় উদ্ভাবনে যত্নবান হন না।" ঐ প্রবন্ধে আরও মন্তব্য করা হয়েছে—"যখন যাবতীয় স্বাধীন দেশেও এইরূপ দুরবস্থা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন পরাধীন রাজ্য সমুদায় কোথায় আছে?"(৭)

ঐ পত্রিকার পাতায় আশা প্রকাশ করা হয়েছে—এই বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থা মানবজাতির পক্ষে উন্নতির আদর্শ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না, তাই বিরল হলেও লক্ষ্য করা যায় সাম্য-মূলক সমাজ-গঠনের প্রচেষ্টা মানুষ করে চলেছে। উদাহরণ হিসাবে কয়েকটি দৃষ্টান্তও ঐ পত্রিকার পাতায় তুলে ধরা হয়েছে।

"মানব-সমাজ এক্ষণে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা যে নর-লোকের চরম অবস্থা নহে, ইহা সর্বতোভাবেই যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু আমরা যে কোন অনির্দেশ্যকালে স্বার্থমূলক সমস্ত রীতিকে তিরস্কার করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তিদিগকে সম্যক প্রকারে চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইব, আমাদের এই অতি-মনোহর আশাবৃক্ষ স্বকপোলকল্পিত কিম্বা আমাদের প্রকৃতিমূলক যুক্তিক্ষেত্রে অবরোপিত, তাহা বিচার করিয়া স্থির করা কর্তব্য।

"পরমেশ্বর মানবজাতিকে যে সমস্ত সদগুণে বিভূষিত করিয়াছেন, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, পৃথ্বীতলে ধর্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য সংস্থাপন কোনমতে অসম্ভববোধ হয় না, প্রত্যুত সর্বতোভাবে, যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়।

"......মনুষ্য কোন সময়ে স্বকীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট নহেন, বহুকালাবধি দয়া-সম্মত ও ন্যায়ানুগত অন্যবিধ সামাজিক ব্যবস্থা সংস্থাপনার্থ সমুৎসুক রহিয়াছেন। তদ্বিষয়ক অভিপ্রায় ও তৎ সম্পাদনের উপায় কেবল গ্রন্থে লিখিয়া নিরস্ত

নহেন। স্থানে স্থানে সম্প্রদায় বিশেষে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। য়িহুদিদিগের মধ্যে এসেনি নামে এক সম্প্রদায় ছিল, তাহারা অর্থ-সঞ্চয়ে অনুরক্ত ছিল না। তাহারা যাবতীয় সম্পত্তি উৎপাদন ও উপার্জ্জন করিত, তাহা স্বতন্ত্র ভোগ না করিয়া একত্র সংগ্রহ করিয়া সাধারণ সম্পত্তি করিয়া রাখিত।

"ইদানীন্তন কালেও উক্ত অভিনব সামাজিক ব্যবস্থা সংস্থাপনের সূত্রপাত হইয়াছিল। তন্মধ্যে হার্মানারিট নামক সম্প্রদায় সর্বোৎকৃষ্ট বোধ হয়। ইউরোপের অন্তঃপাতী মোবাবিয় দেশে উহার উৎপত্তি হয়।··· (তাহারা) স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্বক কিঞ্চিৎ সম্পত্তি সমভিব্যাহারে আমেরিকায় উপনীত হইল এবং তথায় অবস্থিত হইয়া বাসানুরূপ সামাজিক ব্যবস্থা সংস্থাপনে উদ্যোগী হইল। প্রথমে বিস্তব কষ্ট ভোগ করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে একখানি যথাযোগ্য সুন্দব গ্রাম প্রস্তুত করিল, তাহাতে একটি বিদ্যালয়, একটি উপাসনালয়, একটি পুস্তকালয় এবং কতিপয় স্নানাগার ছিল। তাহারা ভূমিকর্ষণ ও নানাবিধ শিল্পকার্য্য নির্বাহ করিয়া যে কিছু অর্থ উৎপাদন করিত, তাহা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধিকার না করিয়া একত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিত এবং সেই সাধারণ অর্থ দ্বারা সকলের গ্রাসাচ্ছাদন ও অন্যান্য সমস্ত বিষয় সম্পন্ন হইত ··তথায় অনৈসর্গিক বর্ণভেদ ও কৃত্রিম বংশমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল না, কিন্তু সুপ্রণালীসিদ্ধ প্রাকৃতিক পদ-মর্য্যাদা সর্বতোভাবে প্রসিদ্ধ ছিল।···"

বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী তত্ত্ববোধিনীর লেখক বলে চলেছেন—

"···স্বার্থপরায়ণ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদয় যে পর্য্যন্ত প্রবলা থাকে, সে পর্য্যন্ত স্বার্থমূলক সামাজিক ব্যবস্থাই আমাদের উপযোগী। জনসমাজের অবস্থাও অপরাপর বিষয়ের ন্যায় পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে উত্তরোত্তর উন্নত হইয়া আসিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা যে অবস্থায় অবস্থিত আছি, ইহাব অব্যবহিত পূর্ববর্ত্তী অবস্থাকে তাহার কারণ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়, এবং উত্তরকালে যে উৎকৃষ্টতর অবস্থার উৎপত্তি হইবে, বর্তমান অবস্থাকে তাহার সোপানস্বরূপ স্বীকার করিতে হয়। ভূমণ্ডল যেমন ঘূর্ণিত হইতে হইতে প্রতিদিন দৈনিক গতি সম্পাদন করিয়া বার্ষিক গতি সম্পাদন করিতে চলিয়াছে, আমরা সেইরূপ প্রত্যেক অবস্থার উপযোগী সর্ববিধ সুখ সম্ভোগ করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকৃষ্টতর অবস্থায় উপস্থিত হইবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছি।"(৮)

তদানীন্তন কালে ইওরোপে জীববিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নব নব চিন্তা মাথা তুলে দাঁড়াল, তার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের স্বাক্ষর বহন করছে কয়েকটি প্রবন্ধ। এই প্রসঙ্গে "মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব কিসে হয়", "ধর্মনীতি" এবং "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নামক প্রবন্ধগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব কিসে হয়"—এই প্রবন্ধে মানবজাতির বিবর্তনের একটি সুন্দর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কোথায় জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্য, কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে মানুষ কৃষি ও বাণিজ্যের মাধ্যমে সভ্যতার উপাদান সৃষ্টি করল, কিভাবে যন্ত্র-সভ্যতা মানবজাতির জীবনে নব অধ্যায় রচনা করতে চলেছে, এবং ভবিষ্যতে একদিন মানুষ কিভাবে সাম্যমূলক অবস্থার দিকে এগিয়ে যাবে—তার একটি চিত্র এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা ও জীবন-ধারার জায়গায় যন্ত্র-সভ্যতা যেসব সুফল মানবজাতির সামনে এনে হাজির করেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে বলা হল—

"যন্ত্র-সভ্যতাও জ্ঞান বৃদ্ধির হেতু, ...এক্ষণে ইউরোপ অঞ্চলে অধিক পরিমাণে যন্ত্র ব্যবহৃত হওয়াতে তথাকার লোকেরা অত্যল্প ব্যয় ও আয়াসে আপনাপন প্রয়োজনীয় বস্তুসকল প্রাপ্ত হইতেছেন। এই নিমিত্তই তথায় নানাবিধ বিদ্যার চর্চা ও সাধারণ মধ্যে জ্ঞান প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। এতদ্দেশের উর্বরা ভূমিতে যে অপকৃষ্ট হলযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তৎপরিবর্তে যদি ইউরোপীয় হলচালনা করা যায়, তাহা হইলে আরো প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। পরন্তু এই ক্ষণকার যুবকেরা যন্ত্রাদি-নির্মাণ শিক্ষা করেন, তাহা হইলে তাহারদের এবং দেশের বিস্তর মঙ্গল সম্ভাবনা।"(১) ইওরোপে বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলিকে মানবজাতি কিভাবে সমাজকল্যাণের কাজে ব্যবহার করছে তার চিত্র তুলে ধরে লেখা হয়েছে—

"মনুষ্য আপন সমস্ত প্রয়োজন সাধনে যন্ত্র ব্যবহার করিলে সেই সেই প্রয়োজন উত্তম রূপে অথচ অল্পায়াসে নির্বাহ হয়। যন্ত্র দ্বারা বাণিজ্যেরও বিস্তর উন্নতি হইয়াছে।" · "এক্ষণে মনুষ্যের অদ্ভুত বুদ্ধি দ্বারা বাষ্পীয় তরণি ও দিক নিরূপণ ও ঝটিকাদির পূর্ব লক্ষণ জ্ঞাপক যন্ত্র নির্মাণ হওয়াতে তাঁহারা সমুদ্রকে রাজপথ স্বরূপ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারদের বাণিজ্য ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সভ্যতা ও জ্ঞানের কত বৃদ্ধি হইতেছে। এক্ষণে বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা লণ্ডন নগর

হইতে কলিকাতায় পূর্বাপেক্ষা অল্পদিনের মধ্যে সমাচারাদি প্রাপ্ত হওয়াতে এখানকার রাজপুরুষদিগের বিলাতের কর্তৃপক্ষীয়দিগের অভিমত ও পরামর্শ লইবার কত সুবিধা হইয়াছে, এবং বণিক ও ব্যবসায়ী লোকদিগের কত কুশল সম্পাদিত হইতেছে। এতদ্দেশে সর্বস্থানে লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত হইলে পরস্পর বহু দূরস্থিত গ্রাম ও নগর অতি নিকটস্থ বোধ হইবে, কারণ এক স্থান হইতে অপর স্থানে অত্যল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত হইতে পারিবে। এখানে যে বৈদ্যুত যন্ত্র মুহূর্তেকের মধ্যে সংবাদ আনয়ন করিতেছে তাহা দেশময় বিস্তৃত হইলে কত মহোপকারের সম্ভাবনা। মনুষ্যের জ্ঞানলাভ ও বিদ্যা প্রচারের নিমিত্তেও যন্ত্রের প্রয়োজন। দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণাদি যন্ত্র যেমন মনুষ্যের আশ্চর্য্য বুদ্ধি কৌশলের সাক্ষীস্বরূপ, তেমন তাহারা তাঁহার জ্ঞানের সীমা সুবিস্তৃত করিয়াছে।"

প্রবন্ধকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে মানবজাতি ক্রমে ক্রমে এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছাবে যখন মানুষে মানুষে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে,—"আপামর সাধারণ সকলেই পর্য্যাপ্ত দৈহিক সুখসম্ভোগ করিতে ও বিদ্যাধর্ম দ্বারা স্বীয় স্বীয় আত্মাকে চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইতে পারেন, এবিষয় অসঙ্গত নহে।...জগদীশ্বর লোকের অন্ন বস্ত্রের প্রয়োজনের সহিত ভূমির উৎপাদকতা গুণের যে প্রকার শুভকর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পৃথিবীর কর্মক্ষম ব্যক্তিরা প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিলেই সকল লোকের আহার, ব্যবহার, ও সুখ-সম্ভোগোপযোগী যথেষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, যে যদি প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ প্রতিদিন দশ দণ্ড মাত্র কর্মবিশেষে নিযুক্ত থাকে, তবে লোকযাত্রা নির্বাহোপযোগি সমুদয় আবশ্যক ও সুখোৎপাদক সামগ্রী প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাহা হইলেই দুঃখ ও দরিদ্রতা পৃথিবী হইতে নির্বাসিত হয়, অবশিষ্ট ৫০ দণ্ড কেবল অবকাশ ও আমোদ-প্রমোদের কাল থাকে।"

লেখক এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এমন একদিন আসবে যখন "সকলে মিলিত হইয়া ঈশ্বরের নিয়ম অনুসন্ধান ও পালন, তাঁহাকে প্রীতিরূপ কর প্রদান, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন ও তাঁহার আলোচনাতে কালক্ষেপণ করিবেন, তখন বিচারালয় ও কারাগার প্রভৃতি কিছুই আবশ্যক করিবে না, কেবল নানাবিধ বিদ্যাশিক্ষার পরিপাটী-মন্দির সকল সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া অবনীর শোভা বর্ধন করিতে থাকিবে।"

ঐ পত্রিকা আরও বলেছে—এই আদর্শ-অনুযায়ী স্থানীয় উন্নতিসাধন সহজ

কাজ নয়। এর জন্যে প্রয়োজন প্রচলিত সরকারের উদ্যোগ ও সমর্থন। "যে সমস্ত উপায় দ্বারা মনুষ্যেরা সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহপূর্বক জ্ঞান ও ধর্ম দ্বারা যথার্থ মহৎ হইতে পারেন তাহার উপায় লিখিত হইল। কিন্তু তাঁহারা যে যে রাজনিয়মের অধীন থাকেন, তাহা তদ্বিষয়ে অনুকূল না হইলে তাঁহারদিগের চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ফলদায়ক হইতে পারে না।"(১০)

ইংরেজ শাসনের ভূমিকা

এই আধুনিকতার দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত হয়ে তত্ত্ববোধিনী ভারতে ইংরেজ শাসনের ভূমিকা—তার সুফল ও কুফলের বিচার করেছে।

পূর্বেকার মুসলমান শাসনের তুলনায় ইংরেজ শাসন ভালো—এই রকমের মোহ তত্ত্ববোধিনীর লেখকেরা পোষণ করতেন। যেহেতু ইংরেজ শাসন আধুনিক সভ্যতার উপকরণগুলি ছড়িয়ে দিতে সহায়ক হয়েছিল তাই তাঁদের মনে এই ধারণা গড়ে উঠেছিল যে ইংরেজ শাসনের একটি সদর্থক দিক আছে। কিন্তু ইংরেজ শাসন যে পর-শাসন এবং এর মূল প্রকৃতি নির্যাতনমূলক—এ বিষয়ে তত্ত্ববোধিনীর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। ইংরেজ বিজেতা ও ভারত বিজিত, ইংরেজ সাম্রাজ্যলিপ্সু, উপনিবেশবাদী এবং ভারত নির্যাতিত ও পরাধীন দেশ—এই মূল বিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা তত্ত্ববোধিনীর ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান।(১১)

ইংরেজ শাসনের উন্নতির দিকটি তুলে ধ'রে "তত্ত্ববোধিনী" মন্তব্য করেছে—"এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়দিগের প্রাদুর্ভাবে এদেশ উজ্জ্বল হইবাব উন্মুখ হইয়াছে, ক্রমে প্রায় ৮০০ বৎসর পর্য্যন্ত যে দুঃখ এদেশে সঞ্চিত হইয়াছে তাহা ক্রমে দূরীকৃত হইতেছে।"(১২)

"বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা" নামক প্রবন্ধে বলা হয়েছে—"পূর্বের অপেক্ষা এক্ষণে এদেশের অবস্থা যে নানা বিষয়ে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর কোন সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই।" এই উন্নতির লক্ষণ হিসাবে কলকাতার সুরম্য অট্টালিকা, অরণ্যভূমি পরিষ্কার করে জনপদ স্থাপন, বাণিজ্য-পোতের আবির্ভাব, বিদেশী বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, ইংরেজ শাসনে রেলপথ প্রবর্তন (বাষ্পীয় রথের লৌহবর্ত্ম), টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রবর্তন (তাড়িত বার্তাবহ), মুদ্রাযন্ত্র প্রচলন, সহর এমনকি গ্রামেও শিক্ষা-প্রসারের বন্দোবস্ত ইত্যাদির উল্লেখ ঐ প্রবন্ধে রয়েছে।

তাই বলে ইংরেজ শাসনের স্তুতিগান করতে তত্ত্ববোধিনী প্রস্তুত নয়। সে লিখছে—"এরূপ বহু প্রকার বাহ্য শোভা ও বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আপাতত অনেকেরই মনে হইতে পারে যে অধুনা বঙ্গভূমি বিশেষ সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছে, কিন্তু যিনি তথ্যানুসন্ধান তৎপর হইয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই বঙ্গভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তিনি দেখিবেন যে, অধুনা বঙ্গভূমিকে যেমন কতিপয় বাহ্য শোভায় শোভিত দেখাইতেছে, সেইরূপ অন্যান্য সহস্র প্রকার আন্তরিক দুঃখে উহার কলেবর ক্লিষ্ট হইয়াছে।... তিনি দেখিবেন যে উহার একচক্ষে যেমন ঈষৎ আহ্লাদের ভাব অনুভূত হইতেছে, তেমনি উহার অন্তরঙ্গ শোকসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া অপর চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রুধারা পতিত হইতেছে—এবং উহা আপনার অবশ্যম্ভাবী নিপতন নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ণ বদনে ম্রিয়মান হইয়া রহিয়াছে, প্রকৃতরূপে উহার শ্রীবৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক উহার অবস্থা দিনে দিনে বরং অবসন্ন হইয়া আসিতেছে এবং উহা অন্তরে অন্তরে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জরাগ্রস্ত জীর্ণ শরীরকে উৎকৃষ্ট ভূষণে সুসজ্জিত করিলে তাহার যদৃশ শোভা প্রকাশ পায়, বর্তমান বাহ্য শোভা দ্বারা বঙ্গদেশেরও তাদৃশ অবস্থা হইয়াছে।...যখন বঙ্গ রাজ্যের প্রতি গ্রাম, প্রতি পল্লী ও প্রতি পরিবারের নিকট হইতেই অনবরত দুঃখ দাবানলের অসহ্য যন্ত্রণার বিলাপ ধ্বনি শ্রবণ করা যায় এবং যখন বঙ্গরাজ্যবাসী দুর্বল মনুষ্যেরা দেশান্তরীয় প্রবল ব্যক্তি কর্তৃক অনবরত প্রপীড়িত হইতেছে, তখন এক কালে চক্ষুকর্ণ রুদ্ধ না করিলে আর কোনক্রমে এক্ষণে বঙ্গদেশকে সম্পূর্ণরূপে উন্নত দশাগ্রস্ত বলিয়া গণনা করা সঙ্গত হইতে পারে না।"(১৩)

ইংরেজ শাসনের মাধ্যমে ইংরেজ নীলকর, ভূস্বামী ও ইংরেজ বণিকেরা কিভাবে ভারতের ঐশ্বর্য শোষণ করে চলেছে এবং ভারতবাসীকে এক 'বিজাতীয় অন্নাভাবের' দিকে ঠেলে দিচ্ছে তার করুণ চিত্র অঙ্কিত করে লেখা হয়েছে—"দেশান্তরীয় অন্যান্য জাতিতেই এ দেশোৎপন্ন প্রচুর দ্রব্যাদি লইয়া সমুদ্রপথে বাণিজ্য কার্য্য করিয়া থাকে এবং দেশান্তরীয় লোকেই এদেশের অধিকাংশ জমির উপস্বত্ব ভোগ করে।"

প্রসঙ্গত ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করে তত্ত্ববোধিনী লিখেছে—"জগতের সমুদয় পদার্থ অপেক্ষা ধনের প্রতি ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অধিক প্রীতি, এ নিমিত্তে দ্রব্যের কর, বাড়ীর কর, ভূমির রাজস্ব সংগ্রহের নিমিত্তে তাঁহারা যে প্রকার সত্বর, প্রজার হিতজনক কোন ব্যাপারে তদ্রূপ য. .ান নহেন।"(১৪)

তত্ত্ববোধিনী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে—"পরপুত্র যদি মাতার ক্রোড় হইতে তাহার স্নেহাস্পদ সন্তানকে অন্তরিত করিয়া বলপূর্বক আপনি সেই ক্রোড় অধিকার করে, তাহা হইলে কি কখন সে জননীর মনে আহ্লাদের উদয় হয়? …যিনি স্নেহপূর্বক এক্ষণে এই পরাধীন বঙ্গরাজ্যের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তিনি দেখিবেন যে উহার সন্তানের দুঃখ হেতু উহার নয়ন হইতে অনবরত শোকাশ্রু বিনির্গত হইতেছে।"(১৫)

দেশপ্রেম

তত্ত্ববোধিনীর পাতায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাব ও ভাবনা—তার সবলতা ও দুর্বলতা। তার মতে দেশের জাগরণে এই ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তকেই নেতৃত্ব দিতে হবে। তার ধারণা ছিল—আধুনিকতার চিন্তাধারায়, দেশপ্রেমিক মনোভাবে জাতিকে জাগ্রত করে তোলাই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রধান কাজ।(১৬) তাই সে তাদের কাছে আহ্বান জানিয়েছে—"অতএব হে স্বদেশীয় বান্ধবগণ! আর বিলম্ব করা উচিত হয় না, তোমরা নিরুৎসাহ নিদ্রা হইতে উত্থান কর, এবং জ্ঞানের আলোক দ্বারা স্ববাসের মঙ্গলের অনুসন্ধান কর।"(১৭)

আধুনিকতার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্বদেশী ভাবোদ্দীপক চিন্তা দেশবাসীর মধ্যে জাগিয়ে তুলতেও তত্ত্ববোধিনী অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হল: "যদি কোন প্রবাসি ব্যক্তি দূর হইতে আপন দেশকে স্মরণ করেন, তবে তিনি জানিবেন যে জন্মভূমি মনুষ্যের দৃষ্টিতে কি প্রকার মনোহর হয়।…স্বদেশ এ প্রকার প্রিয় যে তাহার নদী-পর্বত-মৃত্তিকা পর্য্যন্ত আমারদিগের প্রণয়কে আকর্ষণ করে এবং আহ্লাদকে জন্মায়। জন্মভূমির নাম দ্বারা সেই বস্তুর নাম উচ্চারণ করা হয় যাহার অপেক্ষা প্রিয়তর পদার্থ পৃথিবী মধ্যে আর নাই, কারণ এই জন্মভূমিই সমুদয় প্রিয় বস্তুর আবাস হইয়াছে।"(১৮)

এই দেশপ্রেমিক দৃষ্টি থেকে জাতীয় ঐতিহ্যের বিচার উপস্থিত ক'রে তত্ত্ববোধিনী লিখেছে—"সে ক্ষত্রিয়বীর্য্য কোথায় লুপ্ত হইল। হিন্দুরাজ্য স্বপ্নের ন্যায় অদৃশ্য হইল। সে উত্তম স্ফূর্ত স্বাধীনতার বিশুদ্ধ জ্যোতি আমারদিগের ভারতবর্ষে আর কি প্রকাশ পাইবে? ভারত মেদিনী স্বীয় ক্রোড়স্থিত সন্তানের প্রেমাভিষিক্ত যত্ন দ্বারা আর কি পালিত হইবেন?"(১৯)

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে স্বদেশী ভাব, স্বদেশী ভাবনা, স্বদেশী আচরণে উৎসাহ দেবার জন্যে সেই সময়ে একটি জাতীয় ভাবোদ্দীপক সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এটির নাম দেওয়া হয়—A Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal. এই প্রতিষ্ঠানের যে আখ্যাপত্র নবগোপাল মিত্র সম্পাদিত National Paperএ প্রকাশিত হয় তার গুরুত্ব অনুধাবন করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় তা পুনর্মুদ্রিত করা হয়।(২০)

মাতৃভাষা

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার চোখে মাতৃভাষা অনুশীলন ছিল স্বদেশপ্রেমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই পত্রিকার পাতায় মাতৃভাষার প্রতি দরদ যে-ভাবে ফুটে উঠেছিল সমসাময়িক আর অন্য কোন পত্রিকাই তা দাবী করতে পারে না।

যাঁরা ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বিবেচনার কথা তুলতেন তাদের ঠাট্টা করে বলা হল: "ইংলণ্ডীয় ভাষার প্রেমমুগ্ধ কোন কোন ব্যক্তির পরম প্রিয় বাসনা এই যে ইংলণ্ডীয় ভাষা এই মহা বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের দেশ-ভাষা হইবে, এবং এইক্ষণকার দেশভাষাসকল ঐ পরভাষা-বলে লুপ্ত হইবে। কিন্তু ইহার পর অলীক কথা আর নাই। যাঁহারা একথা কহেন, তাঁহারা ইহাও বলিতে পারেন যে ভারতবর্ষের তাবৎ ভূমি খনন করিয়া ইংলণ্ড-ভূমি দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবেন। (২১)

তত্ত্ববোধিনী প্রশ্ন তুলেছে—"যেহেতু ইংরাজী বিদেশীয় লোকের ভাষা, সুতরাং তাঁহারা যদি দৈবাৎ এদেশ হইতে বিরল হয়েন তবে কোন্ ব্যক্তি আর ইংরাজী শিক্ষা করিবেক? (২২)

তত্ত্ববোধিনী আক্ষেপ করছে—"আমরা পরের শাসনের অধীন রহিয়াছি, পরের ভাষায় শিক্ষিত হইতেছি, পরের অত্যাচার সহ্য করিতেছি—হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমারদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি।"

মাতৃভাষা অনুশীলনের গুরুত্বটি তুলে ধরে তত্ত্ববোধিনী লিখেছে—"এইক্ষণে আমারদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা, এবং এদেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে নতুবা

আর কিয়ৎকাল পোঁণে ইংরাজদিগের সহিত আমারদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেক না।" (২৩)

তত্ত্ববোধিনী লিখছে—"মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের ন্যায়; মাতৃদুগ্ধ যেরূপ বালকের তৃপ্তিজনক ও তদ্দ্বারা তাহার যেরূপ বলাধান হয়, পশুদুগ্ধ সেরূপ নহে, তেমনি মাতৃভাষার প্রেমার্দ্র আশ্রয়ে মনের ভাবসকল অনায়াসে তৃপ্তির সহিত যেমন ব্যক্ত হইতে পারে, তেমন অন্য কোন ভাষার আশ্রয়ে হইতে পারে না।" (২৪)

বিশেষ করে, ভয়াবহ গণ-নিরক্ষরতার পটভূমিতে মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া যে শিক্ষা-বিস্তারের অন্য কোন উপায় নাই তা ব্যাখ্যা করে লেখা হল—

"ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াময় হইতে হয় যে বাঙ্গালা ও বেহারের প্রত্যেক শত বালকের মধ্যে কেবল আটজন মাত্র বালক বিদ্যাভাসে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রত্যেক শত প্রৌঢ় ব্যক্তির মধ্যে ছয় জন মাত্র অল্প লেখনপঠনে সমর্থ হয়—প্রত্যেক শতে ৯২ বা ৯৪ ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ অতি সামান্য বিদ্যার্জনেও বঞ্চিত রহিয়াছে। বাঙ্গালা ও বেহারের ৬০, ০০০,০০ যষ্টি লক্ষ শিক্ষণীয় বালক এবং ২১০,০০০,০০ দুই কোটি দশ লক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি কিরণশূন্য প্রগাঢ় অন্ধকারে মূর্চ্ছিত রহিয়াছে।" (২৫)

দেশের এই অবস্থায় শিক্ষা জনসাধারণের পক্ষে সহজ ও সুলভ করে তোলার প্রয়োজনীয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তত্ত্ববোধিনী মন্তব্য করেছে—"পরিবারের ভরনপোষণের উপায়েব জন্য সাধারণ লোকদিগকে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয় অতএব তাহাদিগের সম্বন্ধে জাতীয় ভাষায় শিক্ষা-প্রদান আবশ্যক, যেহেতুক লোকে কোন নির্দিষ্ট কালের মধ্যে জাতীয় ভাষার আশ্রয় দ্বারা যত বিদ্যা শিক্ষা করিতে সক্ষম হয় তত পরভাষার আশ্রয় দ্বারা শিক্ষা করিতে কখনই সক্ষম হয় না। অধিকন্তু বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা প্রদান যত অল্প ব্যয়ে সম্পাদিত হয় তদ্রূপ ইংরাজিতে শিক্ষা প্রদান হয় না।...সকল দিক বিবেচনা করিলে সাধারণ লোককে বিদেশীয় ভাষায় শিক্ষাপ্রদান অপেক্ষা দেশীয় প্রচলিত ভাষাতে শিক্ষা প্রদান শ্রেয়স্কর ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। (২৬)

তাই বলে তত্ত্ববোধিনী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে কোন সংকীর্ণ দৃষ্টি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল না। তার মতে মাতৃভাষা অনুশীলন জাতির পক্ষে

একান্ত আবশ্যকীয় কাজ হলেও, ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্বকে কোনক্রমেই ছোট করে দেখা উচিত নয়। তাই সে লিখছে—"যদিও সর্ববিবেচনাতে দেশভাষার বিদ্যাভ্যাসের রীতি প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে," কিন্তু ইংরাজীর অনুশীলন রহিত করা কদাপি মত নহে। ...বরঞ্চ বর্তমানকালে ইওরোপ খণ্ড যে সমস্ত বিবিধ বিদ্যার আধার হইয়াছে—সেই ইওরোপীয় ভাষা সকল শিক্ষা ব্যতীত তাহা কদাপি সম্যকরূপে উপার্জিত হইবার নহে।" (২৭)

কৃষক সমস্যা

দেশের ইতর জনের (কৃষকের) প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নীলকর ও জমিদারদের দৌরাত্ম্য নিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় বেশ কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে 'পল্লী-গ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন' নামক প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জমিদারদের অত্যাচার বর্ণনা করতে গিয়ে পত্রিকার পাতায় মন্তব্য করা হয়েছে—'ভূমিই আমাদের মূলধন, এবং কৃষকেরাই আমাদের প্রতিপালক, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, যাহারা এমন হিতৈষি,—সংসারের এমন সুখ-সঞ্চারক, তাহাদের দারুণ দুর্দশা দেখিয়া হৃদয় ব্যাকুল হয়।......'যে রক্ষক সেই ভক্ষক' এ প্রবাদ বুঝি বাঙ্গালার ভূস্বামীদিগের ব্যবহার দৃষ্টেই সূচিত হইয়া থাকিবেক।"

জমিদারী অত্যাচারের বিভিন্ন রূপ তুলে ধরে বলা হয়েছে—"এক্ষণে যাহারদিগকে উপর্য্যুপরি জমীদার, পত্তনীদার, ইজারদার ও দরইজারদার—এই চারি প্রভুর লোভানলে আহুতি দান করিতে হয়, তাহারা কি প্রকারে প্রাণধারণ করে, তাহা ভাবিয়া স্থির করা যায় না। তাহারদের দারুণ দুর্দশা বাক্য পথের অতীত।" (২৮)

কৃষকদের 'ভুবন প্রতিপালক' বলে অভিহিত করে মন্তব্য করা হয়েছে—"যাহারা যাবতীয় লোকের ভোজ্য বস্তু প্রস্তুত করে—যাহাদের পুষ্টিকারক, বলাধায়ক, শ্রমোপযোগি-দ্রব্য ভক্ষণ করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহারা সুপ্রতুল-রূপে কিম্বা সামান্য রূপেও জঠরানল নির্বাণ করিতে পায় না।...অতি দূরবর্ত্তি বিদেশীয় লোকেরাও তাহারদের শ্রম-সাধিত শস্য ভোজন করিয়া পরিতোষ প্রাপ্ত হইতেছে, ও তাহারদের স্বহস্তোৎপাদিত কার্পাস নির্মিত

বস্ত্র পরিধান করিয়া অঙ্গ শোভিত করিতেছে কিন্তু তাহারা সামান্যরূপ আচ্ছাদনও প্রাপ্ত হয় না। তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া বহুকষ্টে যৎসামান্য শস্য ভক্ষণ ও ঘন মলিন চীর পরিধান করিয়া জীবন ক্ষেপণ করে।"

জমিদার, মহাজন, বিদেশী শোষক প্রভৃতি—কৃষকের বিভিন্ন শত্রুর কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করা হয়েছে—এরা প্রজাদের ওপর শুধু খাজনা বৃদ্ধি, আবয়াব অদায় করেই সন্তুষ্ট নয়, তারা প্রজাদের নিজেদের কয়েদে বন্দী করে যে অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন করে থাকে (যার একটি বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হয়েছে) তাতে তাদের "কৃতান্তক যম" ছাড়া কিছু বলা যায় না।

গ্রামাঞ্চলে নীলকরদের অত্যাচারের বিবরণ তুলে ধরে এই পত্রিকা মন্তব্য করেছে—"আর কতকগুলি বিদেশীয় দুর্জ্জন এদেশীয় সহিষ্ণুতাশীল মনুষ্যদিগের উপর যেরূপ অত্যাচার করে, তাহার প্রসঙ্গ না করিলে উচিত কর্মের অন্যথা করা হয়। এই নির্দয় ব্যক্তিদিগের নাম নীলকর।" জমিদারদের প্রজাপীড়নের সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে—"নীলকরদের অত্যাচার তদপেক্ষাও ভয়ানক"। নীলকরদের প্রতি সরকারের পক্ষপাতিত্বের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে লেখা হয়েছে—"ইংলণ্ডস্থ রাজপুরুষেরা কতিপয় অবশ্যপোষ্য স্বজাতীয় ব্যক্তির অভিমান রক্ষার অনুরোধ বশতঃ অত্রত্য কোটি কোটি দরিদ্রের দুঃখ মোচনে অগ্রসর হইলেন না।"

এই কৃষক পীড়নের মূলে যে "সর্বশোষক গভর্নমেন্টের" বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সেটি তত্ত্ববোধিনীর দৃষ্টি এড়ায় নি। সে লিখছে—জমিদার শোষণ করে কৃষককে, আর সরকার শোষণ করে জমিদারকে—এই উভয়বিধ শোষণের শিকার হয় শেষ পর্য্যন্ত কৃষক। সরকারী নীতির সমালোচনা করে মন্তব্য করা হল—"যে দেশে রাজা ও রাজনিয়ম আছে এবং যে স্থানের প্রজারা বহু-বেতন-ভুক উত্তমোত্তম কর্মচারি নিয়োগের উপযোগি যথেষ্ট কর প্রদান করে, সে দেশ যে এমত অশাসিত থাকে, এবং তত্রত্য লোকের ধন, মান, প্রাণাদি কিছুই যে স্বায়ত্ত নহে, ইহাতে তথাকার রাজকার্য্যেরও ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়।..."

একযোগে জমিদার, নীলকর, সরকার—এই তিনের অত্যাচার অবাধে চলেছে দেখে তত্ত্ববোধিনী মন্তব্য করেছে—"বাঙ্গালা দেশ সিংহ ব্যাঘ্রাদি সমাকীর্ণ মহারণ্যের ন্যায় বোধ হয়। সেখানে কোন নিয়ম নাই, কাহারও শাসন নাই, সেখানে নৃশংস স্বভাব হিংস্র জীব সকল নিরুপদ্রব নির্বিরোধ প্রাণিদিগের প্রাণনাশার্থেই সর্বদা সচেষ্ট আছে, প্রজাদের ধন সম্পত্তিতে রাজার কিছু

স্বভাবসিদ্ধ স্বত্ব নাই, তিনি তাহারদের ধন মান প্রাণাদি রক্ষা করিবেন
বলিয়াই করগ্রহণ করেন। কিন্তু আমারদের রাজপুরুষেরা যদর্থে করগ্রহণ
করেন, তৎ সাধন বিষয়ে তাঁহারা যেমন মনোযোগি, পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের
বিষম দুরবস্থাই তাহার সাক্ষী রহিয়াছে।"

আরও লেখা হয়েছে—"যাহারা প্রচণ্ড তপনের উত্তাপ বা অবিশ্রান্ত
বারিধারা মস্তকোপরি সহ্য করিয়া আমারদের প্রাণধারণের উপযোগি আহার
প্রস্তুত করিতেছে, তাহারদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মালোচনা দূরে থাকুক,
তাহারা কত শত স্থানে দিনান্তেও শাকান্ন দ্বারা জঠরানল নির্বাহ করিতে
পারে না। এ বিষয়ে রাজপুরুষদিগের কলঙ্কের বিষয় বিবেচনা করা উচিত।"

জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকেরা দলবদ্ধ হয়ে
প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার যে চেষ্টা করত তারও
কয়েকটি উদাহরণ এই প্রবন্ধে স্থান পেয়েছে। যেমন বলা হয়েছে—"খড়ি
নদীর তীরবর্তি গ্রাম বিশেষের কতকগুলি ইতর লোক ভূস্বামির অত্যাচার
সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, এবং ধনপ্রাণ
রক্ষার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রাণ পণে চেষ্টা করিতেছিল।"

আর একটি উদাহরণ তুলে ধরে বলা হয়েছে—"পলাশি গ্রাম সন্নিহিত
মাঙ্গনপাড়া-নিবাসী এক ব্যক্তি নানামতে নিগৃহীত হইয়া·· ভূস্বামির অত্যাচার
নিবারণার্থে যত্ন পাইতেছিলেন এবং অপরাপর প্রজাদিগকে তদ্বিষয়ে উৎসাহ
দিতেছিলেন।" আরও একটি উদাহরণ—"গত বৎসর নবদ্বীপ অঞ্চলে
চোলমারি, চাপড়া, কাপাসডাঙ্গা প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের কতকগুলি
এতদ্দেশীয় খ্রীষ্টান আপনারদিগেকে রাজ-ধর্মাক্রান্ত ভাবিয়া ভূস্বামির অন্যায়
অনুমতিসকল প্রতিপালনে অস্বীকার গিয়াছিল।"

"সেরপুর বিবরণ" নামক একখানি বইয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে তত্ত্ববোধিনী
ময়মনসিংহের সেরপুর অঞ্চলের এক কৃষক অভ্যুত্থানের উল্লেখ করেছে।
তাতে বলা হয়েছে—"সেরপুরের মুসলমানদিগের মধ্যে পাগলাপন্থী নামক এক
সম্প্রদায় আছে। সুসঙ্গ পরগণার অন্তর্গত লেটিয়াকান্দা গ্রামবাসী টিপুপাগল
এই মতের প্রবর্তয়িতা। টিপু প্রথমে সামান্য কৃষাণ ছিল, সময়ে সে কেবল
ধর্মপ্রচারক নহে, বহুসংখ্যক অনুচর প্রাপ্ত হইয়া একজন ঘোর সমাজবিপ্লাবক
হইয়া উঠে। তদীয় ধর্মের অন্যতম মূলসূত্র এই, সকল মানুষই ঈশ্বর-সৃষ্ট,
কেহ কাহারও অধীন নহে, সুতরাং কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, এরূপ প্রভেদ করা

অসঙ্গত। ১২৩১ সনে ওহাবী মতাবলম্বী এ পরগণায় অনেক প্রজা দলবদ্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া জমীদার প্রভৃতিকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে।" বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয়—পুস্তক সমালোচক মন্তব্য করেছেন—"টিপু পাগলাকে পূর্ব বাঙ্গালার এক প্রকার লুই ব্লেঙ্ক (Louis Blanc) বলিলে হয়।" (২৯)

তত্ত্ববোধিনীর সুচিন্তিত অভিমত—কৃষক সমস্যা জাতীয় সমস্যা এবং এর সমাধান একান্ত আবশ্যক। তবে সেই সমাধান সে খুঁজেছে সংস্কারবাদের পথে। তার মতে এই সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায়—কৃষকদের মধ্যে জ্ঞানের আলো বিস্তার করা। সেই কাজে শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সরকারের কাছে দাবি করতে হবে - কৃষকের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান হোক ও কৃষকের উন্নতির উদ্দেশ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক।

তত্ত্ববোধিনী এই মর্মে লিখছে—"ক্রমে ক্রমে এই পত্রিকার তিন সংখ্যায় প্রজাদিগের দুরবস্থার বিষয় বিবরণ করা গেল। এই বিষম দুঃখ-দায়ক বিষয় বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার নহে। যেমন পৃথিবীর মধ্যে যতদূর খনন করা যায়, ততই প্রগাঢ়তর অগ্নি প্রভাব অনুভূত হয়, সেইরূপ এ দেশীয় প্রজাদিগের দুর্দশার বিষয় যত অনুসন্ধান করা যায় ততই তাহাদের ভূরি ভূরি যন্ত্রণার কারণ প্রকাশ পাইতে থাকে।

ভূস্বামির অত্যাচার, নীলকরের অত্যাচার, রাজকর্মচারির অত্যাচার, রাজার অশাসন ও অবিচার। যাহারা এই সমুদায় অনভিভবনীয় অত্যাচার ক্রমাগত সহ্য করিতেছে, তাহারদের আর কি ক্ষমতা থাকিতে পারে? তাহারা ধন বিষয়ে দরিদ্র, জ্ঞান বিষয়ে দরিদ্র, ধর্মবিষয়ে দরিদ্র এবং বল ও বীর্য্য বিষয়েও দরিদ্র হইয়াছে। তাহারদের এই দারুণ দুরবস্থা নিরাকরণেরই বা উপায় কি?"

তত্ত্ববোধিনীর মতে—এটি খুবই কঠিন কাজ, কেননা "আমারদিগের দেশীয় লোকের পরস্পর ঐক্য নাই এবং জনসমাজের অধস্তন শ্রেণীর সহিত উপরিতন শ্রেণীর মিলন নাই। যাহারদের স্বদেশের দুরবস্থা মোচনের ইচ্ছা আছে, তাহারদের তদুপযোগি সামর্থ্য নাই, যাহাদের সামর্থ্য আছে তাহারদের ইচ্ছা নাই।...কি প্রকারে যে এই সকল দুর্নিবার প্রতিবন্ধক মোচন হইয়া এ দেশের পরিত্রাণ সাধন হইবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন"। এত অসুবিধা সত্ত্বেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংস্কারের প্রতি

সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন এবং "রাজপুরুষেরা মনোযোগ করিলে প্রজাদিগের বর্তমান দুরবস্থার অনেক প্রতীকার করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই।"(৩০)

বস্তুতঃ, ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চোখ দিয়ে দেখা বাঙলার নবজাগরণের এক অপেক্ষাকৃত পরিণত রূপ তত্ত্ববোধিনীর পাতায় প্রতিফলিত হয়েছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের অপরিণত চিন্তা, বিশেষ ক'রে আধুনিকতা ও পাশ্চাত্যকরণের প্রক্রিয়াকে একাকার ক'রে ফেলার প্রবণতা সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী সময় মত সতর্কতার বাণী উচ্চারণ করেছিল। এই পত্রিকা নির্ভীকভাবে আধুনিকতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে ঘোষণা করেছিল—আধুনিকতা—বিলাতের অন্ধ অনুকরণ নয়, বিজাতীয় মনোভাবের প্রশ্রয় নয়, দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। আধুনিকতা যখন দেশের মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, আধুনিকতা যখন স্বাদেশিকতার প্রেরণা জোগাবে তখনই তা হয়ে উঠবে সার্থক।

একথা জোরের সঙ্গে বলা চলে যে বাঙলার নবজাগরণের মুখটি সঠিক দিকে ফিরিয়ে দিতে তত্ত্ববোধিনী এক অতি সার্থক ভূমিকা, এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

টীকা ও উদ্ধৃতি

১) সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বিনয় ঘোষ সম্পাদিত সংকলন গ্রন্থটি (১৯৬৩)। সংকলন হিসাবে গ্রন্থখানি মূল্যবান। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত বহু মূল্যবান প্রবন্ধ এই সংকলনে স্থান পায় নি। এটি এই বইয়ের গুরুতর ত্রুটির দিক।

এই প্রসঙ্গে আর একখানি বইয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। বইখানির নাম—**Tattwabodhini Sabha and the Bengal Renaissance (1979)**। লেখক অমিয়কুমার সেন। এই বইয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একটি সমীক্ষা উপস্থিত করার চেষ্টা হয়েছে।

২) তত্ত্ববোধনী পত্রিকা, সম্পাদকীয়, বৈশাখ, ১৭৭৭ শক

৩) ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৭৭০

৪) ঐ, আশ্বিন, ১৭৭২

৫) ঐ, ধর্মনীতি নামক প্রবন্ধ, পৌষ, ১৭৭৬

৬) ঐ, প্রবন্ধ

৭) ঐ, ধর্মনীতি, ভাদ্র, ১৭৭৩

৮) ঐ প্রবন্ধ

৯) ঐ, মনুষ্যজাতির মহত্ত্ব কিসে হয় ?, আশ্বিন, ১৭৭৬

১০) ঐ প্রবন্ধ

১১) ঐ, "কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা" ; "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" "ধর্মনীতি" প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১২) ঐ. ১লা ভাদ্র, ১৭৬৫

১৩) ঐ, বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা, শ্রাবণ, ১৭৭৮

১৪) ঐ, কলিকাতার বর্তমান দুরবস্থা, ১ শ্রাবণ, ১৭৬৮

১৫) ঐ, বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা, ঐ শ্রাবণ, ১৭৭৮

১৬) ঐ, প্রবন্ধ

১৭) ঐ. সম্পাদকীয়. ১ শ্রাবণ, ১৭৭৬

১৮) ঐ প্রবন্ধ

১৯) ঐ, বৈশাখ, ১৭৭০

২০) ঐ, চৈত্র, ১৭০৭

২১) ঐ, মাতৃভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ, শ্রাবণ, ১৭৭০

২২) ঐ, শ্রাবণ, ১৭৬৫

২৩) ঐ, প্রবন্ধ

২৪) ঐ, স্বদেশীয় ভাষানুশীলন, ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৭৭৮

২৫) ঐ, শ্রাবণ, ১৭৭০

২৬) ঐ, স্বদেশীয় ভাষানুশীলন ; ঐ, জ্যৈষ্ঠ, ১৭৭৮

২৭) ঐ, মাতৃভাষা বিষয়ক প্রবন্ধ, শ্রাবণ, ১৭৭০

২৮) ঐ. পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন, বৈশাখ, ১৭৭২, শ্রাবণ, ১৭৭০, অগ্রহায়ণ, ১৭৭২

২৯) বিনয় ঘোষ—সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র—দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭৪-৭৫

৩০) পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন, অগ্রহায়ণ, ১৭৭২

"হিন্দু পেট্রিয়ট" ও বাঙলার নবজাগরণ

অমর দত্ত

প্রথম প্রকাশ ১৮৫৪ খৃঃ। ১৮৫৫-৬১—এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন হরিশ মুখার্জি। এই ক'বছর ছিল হিন্দু পেট্রিয়টের সবচেয়ে গৌরবের যুগ। দুর্গত নীল-চাষীদের পক্ষ সমর্থন করে এই পত্রিকা বাঙলার গণতান্ত্রিক জাগরণের উদ্বোধনে একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বর্তমান প্রবন্ধে শুধু এই যুগটি নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

১

উনিশ শতকের পাঁচের দশকে বাঙলাদেশের সমাজ ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট পরিণতির লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে বিরোধ এই দশকেই সচেতন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বিশিষ্ট রূপরেখা দান করেছে। উক্ত দশক আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ—কেননা এই সময়েই বিধবা বিবাহের আন্দোলন, সিপাহী যুদ্ধ, নীলের হাঙ্গামা, ঈশ্বর গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই দশকেই বাঙলাদেশের উল্লেখযোগ্য ইংরাজী সংবাদপত্র হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। এদেশের ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জন্ম হয়েছিল উনিশ শতকে—উপনিবেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কাঠামোজাত বৈপরীত্য সত্ত্বেও তাঁরাই এদেশের মানবমুখিন বুর্জোয়া জীবনদর্শন প্রচারের প্রথম মাধ্যম, সচেতন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জনক এবং হিন্দু পেট্রিয়ট তাঁদের অন্যতম মুখপত্র।

১৮৫৩ খৃঃ মধুসূদন রায় নামক জনৈক স্বদেশহিতৈষী ধনী ব্যক্তি একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করে সাপ্তাহিক হিন্দু পেট্রিয়ট ১৭, দর্পনারায়ণ স্ট্রিট হতে প্রকাশ করেন। প্রথমে গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং পরে প্রখ্যাত হরিশচন্দ্র মুখার্জীকে তিনি সম্পাদক হিসাবে

নিযুক্ত করেন। সেই সময় ইংরাজী সংবাদপত্র পড়বার লোক এত কম ছিল যে হিন্দু পেট্রিয়টের গ্রাহক সংখ্যা একশতের বেশি হল না। অনুরূপ অবস্থায় মধুসূদন রায় নিজের মুদ্রাযন্ত্রটিকে বিক্রয় করে দিলেন এবং হিন্দু পেট্রিয়ট হরিশচন্দ্র মুখার্জীকে দান করে পশ্চিমে যাত্রা করলেন। হরিশচন্দ্র তাঁর ভ্রাতা হারানচন্দ্রকে নামতঃ সাপ্তাহিক কাগজটির সত্বাধিকারী ও প্রকাশক করে নবোদ্যমে হিন্দু পেট্রিয়টের প্রচারে ব্রতী হলেন। তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার গুণে হিন্দু পেট্রিয়ট অল্পদিনে বহুল প্রচারিত হল। সিপাহী যুদ্ধ ও নীল হাঙ্গামার সময় পেট্রিয়টের নির্ভীক সাংবাদিকতা সকলের প্রশংসা অর্জন করল। সিপাহী যুদ্ধের মূল্যায়নে পেট্রিয়টের ভুল থাকতে পারে, কিন্তু বাক্যজালের আড়ালে পেট্রিয়ট সিপাহী যুদ্ধ সম্বন্ধে নিজের মতামতকে অস্পষ্ট রাখে নি। নীলকরদের স্বরূপ উদঘাটনে পেট্রিয়টের অগ্নিবর্ষী লেখনী পেট্রিয়টকে তদানীন্তন যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রের মর্যাদা দান করল। পেট্রিয়টের মতামত এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে স্বয়ং বড়লাট লোক পাঠিয়ে পেট্রিয়টের প্রতিটি সংখ্যা প্রথম সংগ্রহ করতেন।

১৮৯২ খৃঃ ৬ জুন পর্যন্ত পেট্রিয়ট সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধটি ১৮৫৪ খৃঃ হতে ১৮৬১ খৃঃ পর্যন্ত হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত তথ্যাদি নির্ভর করে রচিত হয়েছে।

২

ইংলণ্ডের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যে আস্থাশীল হওয়ায় পেট্রিয়ট ভারতবর্ষের প্রশাসকদের কাছ থেকে একই মানের ঐতিহ্য আশা করত। কিন্তু উপনিবেশের ন্যায়নীতি ও স্বদেশের ন্যায়নীতি এক হতে পারে না—বাণিজ্যিক স্বার্থে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের প্রতি সুবিচার করতে পারে না—এইজন্য পেট্রিয়টের অনেক রচনায় হতাশার চিহ্ন আছে। ঝান্সীর রাণীর দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার অস্বীকার করে লর্ড ডালহৌসী ঝান্সী অধিকার করলে পেট্রিয়টে বড়লাটের নিন্দা করা হয় এবং People and Parliament of Great Britain-কে সুবিচারের জন্য হস্তক্ষেপ করতে বলা হয় (১৮ মে, ১৮৫৪)।

সিপাহী যুদ্ধের সাফল্যে পুরাতন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন ও

সতীদাহ প্রভৃতি কুপ্রথার পুনঃপ্রবর্তনের আশঙ্কা করে হিন্দু পেট্রিয়ট সিপাহী যুদ্ধকে সমর্থন জানাতে পারে নি; কিন্তু ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের বিষয়ে পেট্রিয়ট কোনদিনই নীরব ছিল না। 'English Radicalism and Indian Officialism' নামক এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এদেশের ইংরেজ শাসকদের সমালোচনা এবং ইংরেজ জাতির যুক্তিবাদের উপর আস্থা প্রকাশিত হয়েছিল (২৫ ডিসেম্বর, ১৮৫৭)। হিন্দু পেট্রিয়টের একাধিক প্রবন্ধে অনুরূপ মনোভাব সুস্পষ্ট।

১৮৫৮ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে রক্ষণশীল ইংরাজদের মুখপত্র 'The Friend of India'-তে এদেশে পুনরায় বিদ্রোহের আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই পটভূমিতে হিন্দু পেট্রিয়টে Government By Native Opinion' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় (৬ জানুয়ারী, ১৮৫৯)। উক্ত প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয় বর্ণবিদ্বেষই শাসক ও শাসিতের বিরোধের ও বিদ্রোহের কারণ। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসন যে আশীর্বাদ হিসাবে মনে করা হয়েছিল তা ছিল ঐতিহাসিকভাবে সত্য। সত্যিই এই শাসন জনপ্রিয় ছিল। কি কারণে এই জনপ্রিয়তার পরিবর্তন হল যার পরিণতি হিসাবে আমরা সিপাহী বিদ্রোহ দেখলাম? এর কারণ নির্ণয় দুরূহ নয়। যে সমস্ত ইংরেজ এদেশে আসেন তাঁরা প্রথমেই ধরে নেন যে তাঁদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি এদেশবাসীর তুলনায় উন্নত। প্রশাসনিক কর্মে এদেশবাসীর সংস্পর্শে এসে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে উন্নত সভ্যতা নিম্ন ধরনের সভ্যতাকে গ্রাস করবে। তাঁরা শাসিতের মতামত উপেক্ষা করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে সচেষ্ট হন। একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ জাতির কাছে শাসকশ্রেণীর অনুরূপ মনোভাব অপমানজনক। তাছাড়া শাসকেরা নিজেরাও তাঁদের সামাজিক ঐতিহ্য ও প্রথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁরা নিজেদের মনগড়া ধারণায় এদেশকে দেখার চেষ্টা করেন। তাঁরা এদেশের সহস্র সহস্র বৎসরের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে এদেশের অনুষ্ঠান, জাতিব্যবস্থা, আভিজাত্য, পৌরব্যবস্থা ও স্বায়ত্তশাসন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যম হল লম্বা লম্বা মিনিট, জরিপ এবং বিলিব্যবস্থা। (মর্মানুবাদ)

উপনিবেশের আমদানী-রপ্তানী ব্যবসা যে জনগণের পক্ষে ক্ষতিকারক একথা হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার একাধিক প্রবন্ধে ও পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুরূপ একটি পত্রের অংশবিশেষের সারাংশ উদ্ধৃত করছি:

ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা রপ্তানী বাণিজ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। এই দেশের বর্তমান উৎপাদন জনগণের পক্ষে এবং বিদেশে রপ্তানীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া, আমাদের দেশ থেকে রপ্তানীকৃত বস্তুগুলি নিত্যব্যবহার্য আবশ্যিক সামগ্রী, অপরদিকে আমদানীকৃত বস্তুগুলি বিলাসসামগ্রী। চাল, চিনি, সরিষার বীজ, এবং অন্যান্য মূল্যবান বস্তুগুলি প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী করা হচ্ছে এবং মদ, বিলাসদ্রব্য ও প্রচুর পরিমাণে রাস্তা তৈরী করার পাথরকুঁচি আমদানী করা হচ্ছে। এই বিনিময়ে যেটুকু মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে তাও মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সম্পত্তি বৃদ্ধি করছে এবং নিম্নশ্রেণীর জনগণ বিন্দুমাত্র উপকৃত হচ্ছে না ··(হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৭ মে, ১৮৫৮)।

পেট্রিয়টে ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। সিপাহীযুদ্ধের পূর্ব থেকেই হিন্দু পেট্রিয়টে কেন্দ্রীভূত শাসনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছিল —এই প্রসঙ্গে 'Policy of the Government should be Federal' নিবন্ধটি উল্লেখযোগ্য (হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৪ জানুয়ারী, ১৮৫৬)। অপর একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছিল যে কেন্দ্রীভূত শাসন নয়, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ভারতবর্ষের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং সিপাহীযুদ্ধ থেকে সরকারের উক্ত শিক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন (হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৩ জানুয়ারী, ১৮৫৯)। পেট্রিয়টে ভারতীয় ব্রিটিশ প্রশাসনের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর খারাপ দিকটির নিন্দা করে একাধিক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। অনুরূপ একটি পত্রের কিয়দংশের সারমর্ম উদ্ধৃত করছি:

···সরকারের স্বরূপ তার নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। গণতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারী, উদারনৈতিক প্রভৃতি নানা জাতীয় সরকারের সঙ্গে তাদের নীতিগুলির গভীর সম্বন্ধ বর্তমান। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে সরকারের নীতিগুলি দিয়ে ভারতবর্ষের সরকারের চরিত্র যথাযথ উপলব্ধি করা যাবে না। পার্লিয়ামেন্টারী সরকারের আদর্শ আমাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করলেও নীতিগুলির ভীতিজনক অপব্যবহার আমাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে। ভারতবর্ষের সরকার জাতিবিদ্বেষ প্রচারে উৎসাহ দিয়ে পার্লিয়ামেন্টারী ব্যবস্থার ভাবমূর্তিকে বিনষ্ট করেছে। এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনেতারা নিপীড়িত দেশবাসীর কথা চিন্তা করেন না···(হিন্দু পেট্রিয়ট, ২৪ মার্চ, ১৮৬০)।

পেট্রিয়টের একটি নিবন্ধে প্রশাসনকে জনগণের পক্ষে কল্যাণকর করে

তোলার প্রয়োজনে আইনসভায় ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের দাবী জানানো হয় (হিন্দু পেট্রিয়ট, ১৭ মার্চ, ১৮৬০)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে যশোর, নদীয়া, পাবনা এবং নিম্নবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে নীলের চাষ আরম্ভ হয়। নীলকররা অল্প-ব্যয়ে অধিক লাভের জন্য বলপূর্বক দাদন প্রদান করে রায়তদের উৎকৃষ্ট জমিতে নীল চাষে বাধ্য করত ও অন্যান্য অবৈধ উপায় অবলম্বন করত। রায়তরা অস্বীকৃত হলে প্রহার, কয়েদ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি নানা ধরনের নৃশংস অত্যাচার চালাত। অনেক সময় নীলকররা জমিদার হয়ে রায়তদের ধনে-প্রাণে শেষ করত। নীলকরদের অত্যাচার থেকে অনেক সময় জমিদাররাও রেহাই পেত না। এই প্রসঙ্গে হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত 'The Zeminder and the Planter' শীর্ষক সংবাদটি উল্লেখযোগ্য (৭ জানুয়ারী, ১৮৬০)।

নদীয়া জেলার দৌলতপুর থানার অন্তর্গত দিগম্বরপুরের জমিদার কৈলাস-চন্দ্র রায়ের পিতামহ শম্ভুনাথ রায় জর্জ হ্যারিসকে খালবোয়ালিয়া অঞ্চলে কিছু জমি লীজ দেয় (১৮১০ খৃঃ)। ঐ সময় থেকে ঐ অঞ্চলে নীল চাষ শুরু হয় এবং ঘটনার সময় খালবোয়ালিয়া অঞ্চলের নীলকুঠিগুলি Bengal Indigo Companyকর্তৃক পরিচালিত ছিল। নীলকরদের লোকজন কৈলাসচন্দ্র রায়ের জমিদারীর ক্ষতি করায় এবং খাজনার ব্যাপারে হয়রানি করায় কৈলাসচন্দ্র তালুকদার প্রাণকৃষ্ণ পালকে উক্ত অঞ্চলের পত্তনি দেয়। পত্তনিদানের খবর পেয়ে নীলকরদের লোকজন কৈলাসচন্দ্রের গৃহে হামলা করে—ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নালিশ করায় পুলিশ কৈলাসচন্দ্রের লোকজনকে ধরে নিয়ে যায়। কৈলাসচন্দ্র কৃষ্ণনগরে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। কৈলাসচন্দ্র নীলকরদের ভয়ে পুনরায় উক্ত অঞ্চলের পত্তনি প্রাণকৃষ্ণ পালের কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে Bengal Indigo Company-কে পত্তনি দিতে বাধ্য হয় (১০ বৎসরের জন্য)। নীলকুঠিতে এনে কৈলাসচন্দ্রকে কয়েদ করে ৫000 হাজার টাকা জরিমানা চাওয়া হয়। কৃষ্ণনগরের মহারাজার হস্তক্ষেপে ২000 হাজার টাকার জরিমানা দিয়ে এবং কৃষ্ণনগরে বসবাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৈলাসচন্দ্র মুক্তি পায়।

জমিদার সম্প্রদায়ের অনুরূপ দুর্দশা থেকে রায়তদের দুরবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। ১৮৫৯ খৃঃ লক্ষ লক্ষ প্রজা ধর্মঘট করে নীলচাষে অস্বীকৃত হওয়ায় নীলকরদের অত্যাচারের মাত্রা খুব বেড়ে যায়। একদিকে নীলকর, অন্যদিকে রায়ত—এই বিবাদে জেলার শ্বেতাঙ্গ প্রশাসকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীলকরদের

পক্ষাবলম্বন করত। অনুরূপ অবস্থায় হিন্দু পেট্রিয়ট নীলচাষীর সপক্ষে জনমত সংগঠন করার জন্য নীলকরদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিল। রায়তদের প্রতিরোধে উৎসাহ দিয়ে হরিশচন্দ্র মুখার্জী হিন্দু পেট্রিয়টে 'The Indigo Question' নামে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন (১৯ মে, ১৮৬০)। তিনি বলেছিলেন, নীল আন্দোলন শুরু হওয়ার পর থেকে বাঙলাদেশের কৃষকেরা যে নৈতিক শক্তির পরিচয় দিয়েছে তার জন্য আমরা গর্বিত হতে পারি। সরকার, আইন আদালত, সংবাদপত্র এবং অন্যান্য দুর্ধর্ষ ক্ষমতার সবরকম উপকরণ নীলকরদের করায়ত্ত। এই প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক জ্ঞান ও ক্ষমতাবিহীন, নেতৃত্ববিহীন দরিদ্র নীলচাষীর মৃত্যুপণ লড়াই যে কোন দেশের বিপ্লবের ইতিহাসের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। নীলচাষীরা অত্যাচারের প্রতিরোধ করতে গিয়ে চূড়ান্ত মূল্য দিয়েছে—তাদের গ্রাম পুড়েছে, পুরুষেরা কয়েদখানায় গিয়েছে। ইতিমধ্যে অত্যাচারীরা অনুভব করতে পেরেছে যে তাদের অত্যাচারের দিন শেষ হয়ে আসছে। রায়তরা যদি এভাবে আর কিছুদিন প্রতিরোধ চালাতে পারে তবে তাদের সামাজিক অবস্থার মধ্যে যে বিপ্লব সংগঠিত হবে তা দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবিত করবে। (মর্মানুবাদ —১৯ মে, ১৮৬০)। মূলতঃ পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখার্জীর অগ্নিবর্ষী লেখনী সরকারকে ১৮৬০ খৃঃ 'ইণ্ডিগো কমিশন' নিয়োগে বাধ্য করে। এই কমিশন ১৮ মে থেকে ১৪ আগস্ট পর্যন্ত ১৫ জন সরকারী কর্মচারী, ২১ জন নীলকর, ৮ জন পাদ্রী, ১৩ জন জমিদার এবং ৭৭ জন রায়তের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং ২৭ আগস্ট রিপোর্ট পেশ করেন। নীল কমিশনের একমাত্র ভারতীয় সদস্য চন্দ্রমোহন চাটার্জি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। একমাত্র তিনিই 'কালা আইন' আন্দোলনের সময়ে ইংরেজদের সমর্থন করেছিলেন। কিছু কিছু জমিদারও লাভজনক নীল ব্যবসায়ে জড়িত থাকায় এবং চন্দ্রমোহন চ্যাটার্জী কমিশনে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি থাকায় হিন্দু পেট্রিয়টে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল। রায়তদের অথবা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিত্ব করার নৈতিক অধিকার চন্দ্রমোহনের ছিল না। হরিশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে হিন্দু পেট্রিয়টে লিখেছিলেন: জমিদার ও রায়তদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা নীল কমিশনের কর্তব্য হওয়া উচিত। অনেক ক্ষেত্রে জমিদার ও নীলকরের স্বার্থ অভিন্ন বলে বিবেচিত হতে পারে। চন্দ্রমোহনবাবু নিজে জমিদার হওয়ায় রায়তদের স্বার্থ রক্ষার্থে খুব সচেষ্ট

হবেন না। তাঁর নীলকুঠি পরিচালনা করার অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি নীলকরদের অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে খুবই সচেতন থাকবেন। (মর্মানুবাদ—হিন্দু পেট্রিয়ট, ১২ মে, ১৮৬১)। বাঙলাদেশের জমিদারশ্রেণীর নিপীড়নকারী ভূমিকা সম্পর্কে হরিশচন্দ্র যে সজাগ ছিলেন উপরোক্ত উদ্ধৃতি তা প্রমাণ করে।

১৮৩০ খৃঃ কুখ্যাত পঞ্চম আইন (Regulation v of 1830) নীলকরদের স্বার্থে পাশ হয়। উক্ত আইনে দাদন গ্রহণকারী কৃষকের নীলচাষ না করা. আইন-বিরুদ্ধ বলে ঘোষিত হয়। উক্ত আইন নীলকরদের অনিচ্ছুক কৃষককের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতে অভিযোগের সুযোগ দিয়েছিল। ১৮৩৫ খৃঃ জনমতের চাপে উক্ত আইন বাতিল করা হয়। নীল-হাঙ্গামার সময় ১৮৬০ খৃঃ উক্ত আইন পুনরায় প্রবর্তিত হলে হিন্দু পেট্রিয়টে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। এই প্রসঙ্গে The Contract of Indigo (৭ এপ্রিল, ১৮৬০), The Ryots Coercion Law (১৪ এপ্রিল, ১৮৬০) প্রভৃতি নিবন্ধ-গুলি উল্লেখযোগ্য।

নতুন চুক্তি আইন প্রয়োগ করে অসংখ্য রায়তকে জেলে পুরেও তাদের দিয়ে নীলচাষ করানো গেল না। চুক্তির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলে সরকার অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিলেন। হরিশচন্দ্র এই সম্পর্কে হিন্দু পেট্রিয়টে (১০ মার্চ, ১৮৬০) লিখেছিলেন,···মফস্বলে ম্যাজিস্ট্রেটরা এখন প্রতিবিঘা নীল জমির জন্য ২০ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন। নীলচাষের ক্ষতি হওয়ার জন্য যেখানে প্রতিবিঘা জমিতে ৮ অথবা ৯ টাকার বেশি ক্ষতিপূরণ, অসঙ্গত শর্তানুসারেও হতে পারে না, সেখানে মিঃ হাসেল খালবোয়ালিয়া কুঠির জন্য বিঘাপ্রতি ১৯ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন। কাছিকাটা কুঠি গত বছরের ১২০০০ বিঘা জমিতে নীলচাষ করে ১,৪৫,০০০ টাকা লাভ করেছিল। বর্তমান বৎসরে উক্ত কুঠির ৬০০০ বিঘায় নীলচাষ না হওয়ায় তারা ১,২০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে। অর্থাৎ নীলচাষ না করে তারা যা লাভ করে তার তিন গুণ লাভ করবে। (মর্মানুবাদ)

হিন্দু পেট্রিয়ট নির্ভীকভাবে নীলকরদের স্বরূপ উদঘাটন করতে থাকায় পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্রকে শাসিয়ে নীলকররা পত্র দিতে থাকে। অনুরূপ একটি পত্রে শাসানো হয়ঃ "নিগার! তুমি কি ভুলে গিয়েছ যে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে তোমার জাতের অবস্থা ক্রীতদাসের চেয়ে ভালো

নয় ? ..যদি আমি তোমাকে কোনদিন শহরে অথবা গ্রামে দেখতে পাই তবে ঘোড়ার চাবুক দিয়ে চাপকাব।" ..হরিশচন্দ্র পত্রটি 'Americanism in Nadia' নাম দিয়ে হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশ করেছিলেন (২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬০)।

নদীয়া জেলার নীলকর আর্চিবল্ড হিল (১২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৬০) মাথুর বিশ্বাসের পুত্রবধূ হরমণিকে বলাৎকারের উদ্দেশ্যে অপহরণ করে। পুলিশ রিপোর্টে বলা হল যে অপহরণের ঘটনা সত্য হলেও ধর্ষণের কাহিনী কাল্পনিক। মাথুর পুলিশের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে পুত্রবধূকে ফিরে পেলে সে হিলের বিরুদ্ধে মামলা আনবে না। সুতরাং নতুন ম্যাজিস্ট্রেট হার্শেল অভিযোগটি নাকচ করে দিলেন। হরিশচন্দ্র সংবাদটি হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশ করায় হিল তাঁর বিরুদ্ধে ১০,০০০ টাকার খেসারত দাবী করে মামলা দায়ের করে। ইতিমধ্যে ১৮৬১ খৃঃ ১৪ জুন হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তখন আর্চিবল্ড হিল আলিপুর কোর্টে হরিশচন্দ্রের বিধবা পত্নীকে প্রতিবাদী গণ্য করে মামলা দায়ের করে। একথা অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় যে হরিশচন্দ্রের বিধবা পত্নীর সপক্ষে মামলা চালানোর জন্য কোন সাহায্য পাওয়া যায় নি। শেষ পর্যন্ত অসহায় বিধবা হিলকে এক হাজার টাকা মামলার খরচ দিয়ে আপসে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে বাধ্য হন।

নীলচাষীরা ধর্মঘট করে নীলচাষে অস্বীকৃত হওয়ার পূর্বেই হিন্দু পেট্রিয়টে নীলকরদের অনাচার বিষয়ে বহু সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। নীলকররা কিভাবে বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে থাকেন এই বিষয়ে "Indigo Planters as Justices' শীর্ষক সংবাদটি উল্লেখযোগ্য (৩ জুলাই, ১৮৫৬)। এই অনাচার বিষয়ক কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সংবাদের সূত্র উল্লেখ করছি :

1. Indigo Planters in the Mofussil (৭ আগস্ট, ১৮৫৬)
2. ,, ,, ,, ,, (২১ আগস্ট, ১৮৫৬)
3. The Indigo Planters' Petitions to the Governor General of India and the British Parliament (১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭)

ব্রিটিশ নাগরিক হওয়াতে নীলকরদের পক্ষ থেকে নেটিভদের সাহায্যে বিচার, জুরির সাহায্যে বিচার, প্রশাসনিক কার্যে দেশীয় দারোগাদের অযোগ্যতা প্রভৃতির উল্লেখ করে প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা থেকে অব্যাহতি চেয়ে উপরোক্ত আবেদন করা হয়েছিল। এই সম্পর্কে হিন্দু পেট্রিয়টের মন্তব্য

প্রণিধানযোগ্য :…বহুজনের স্বার্থের প্রতি মনোযোগী হওয়া সরকারের কর্তব্য—সুতরাং মুষ্টিমেয় আবেদনকারীর আবেদনের প্রতি কর্ণপাত করা সরকারের পক্ষে অবিধেয় (১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭)।

4. **Indigo Planters** (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৬)

5. **Missionaries' Memorial** (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৬)

পুলিশ ও বিচারব্যবস্থা, জমিদার ও নীলকরদের অত্যাচার, দরিদ্র-শ্রেণীর উপর অত্যাচার প্রভৃতি বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ কমিশন নিয়োগের আবেদন করা হয়েছিল। আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন পাদরি জেমস লঙ, পাদরি আলেকজাণ্ডার ডাফ, পাদরি লালবিহারী দে, পাদরি জোসেফ মুলেন্স ও অন্যান্যেরা।

6. **The Missionaries and the Planters** (২৪ এপ্রিল, ১৮৫৬)

১৮৫৯ খৃঃ নীলচাষকে কেন্দ্র করে রায়তদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং রায়তরা নীলের দাদন নিতে ও নীল বুনতে অস্বীকার করে ধর্মঘট করে এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। নীল হাঙ্গামা ও তাতে ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সমর্থন সম্পর্কে রক্ষণশীল ইংরাজদের পত্রিকা Friend of India (৮ মার্চ, ১৮৬০) লিখেছিল :…কৃষ্ণনগর থেকে প্রাপ্ত খবর খুব আশঙ্কাজনক না হলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় উক্ত অঞ্চলের শান্তি বিপন্ন হতে পারে। রাযতদের আন্দোলন কলকাতা হতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে বলে সন্দেহের অবকাশ আছে। য়ুরোপীয় জমিদারদের বিতাড়নের চিন্তা এদেশীয় দেশপ্রেমিকদের মধ্যে সুস্পষ্ট।· প্রকৃতপক্ষে বাঙলাদেশের কোন অঞ্চলেই সৈন্যবাহিনী নিয়োগ না করে যথার্থ শান্তি বজায় রাখা সম্ভব নয়। আমরা আশা করব যে সরকার শেষ মুহূর্তে সৈন্যবাহিনী নিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না।· যদি আমরা ভীতিজনক বিপর্যয় ও অবিরাম কৃষক বিদ্রোহ না চাই তবে যে কোন উপায়ে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে (মর্মানুবাদ)। উদ্ধৃত অংশে নীল বিক্ষোভের ব্যাপকতা ও শিক্ষিত মধ্য-বিত্তের উক্ত বিক্ষোভের সঙ্গে যোগাযোগের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে।

পেট্রিয়টে প্রকাশিত নীল হাঙ্গামার সমসাময়িক যুগের লিখিত প্রবন্ধ-গুলির গুরুত্ব অপরিসীম। কয়েকটির উল্লেখ করছি :

1. **The Gomastha—A Tale of Indigo Planting** (১৪ জানুয়ারী, ১৮৬০)

2. Anarchy in Bengal (৪ জানুয়ারী, ১৮৬০)

3. Planter-Zeminder in Naddea (৪ জানুয়ারী, ১৮৬০)

4. Mofussil Magistrate (৩ মার্চ, ১৮৬০)

5. Indigo Planting in Bengal (১৭ মার্চ, ১৮৬০)

১৮৬০ খৃঃ ঢাকা শহর থেকে প্রকাশিত নীলদর্পণ নাটকটি ১৮৬১ খৃঃ ইংরাজীতে প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে পাদরি লঙ মানব-দরদীর পবিত্র কর্তব্য পালন করেছিলেন। নীলদর্পণের অনুবাদ প্রকাশকে কেন্দ্র করে সর্বত্র ঝড় উঠেছিল এবং লঙের জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছিল। লঙের পক্ষে জনমত সংগঠনে পেট্রিয়টের ভূমিকা প্রশংসনীয়। পেট্রিয়টে মন্তব্য করা হয়েছিল—'সিপাহী যুদ্ধের পরবর্তীকালে শাসক ও শাসিতের বন্ধন শিথিল হয়ে গিয়েছে। ব্রিটিশ ভারতীয় রাজনীতি এর জন্য দায়ী।' (১২ জুন, ১৮৬১)। ইংরেজ প্রশাসনের প্রতি আস্থাহানি আমাদের জাতীয়তাবোধের বিকাশের পথ খুলে দিয়েছে।

হিন্দু পেট্রিয়টে পাদরি লঙ সংক্রান্ত বিষয়গুলির সুদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশিত হত। লঙের বিচারের সময় এ দেশের সর্বশ্রেণীর মানুষের লঙের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন সৃষ্টিতে পেট্রিয়টের বিশেষ ভূমিকা ছিল। লঙ সংক্রান্ত কতকগুলি সংবাদের সূত্র উল্লেখ করছি :

1. The Trial of the Revd. Mr Long (২৫ জুলাই, ১৮৬১)

2. Long's Letter (১৫ আগস্ট, ১৮৬১)

3. The Libel and the Nil Darpan (১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৬১)

4. The Nil Durpan Affair in England (,, ,,)

5. Mr. Long's Trial (২৪ অক্টোবর, ১৮৬১)

6. The Church Missionary Society on the Conviction and Imprisonment of the Rev. James Long for Libel (২১ নভেম্বর, ১৮৬১)

7. Address to the Rev. James Long from the Aborgines Protection Society (২১ নভেম্বর ১৮৬১)

8. English Opinion of Nil Durpan Trial (২ ডিসেম্বর, ১৮৬১)

নীলদর্পণ নাটকের অনুবাদ প্রকাশের জন্য লঙের বিরুদ্ধে লাইবেলের অভিযোগ আনা হয়। বাদী ল্যাণ্ডহোল্ডারস এণ্ড কমার্শিয়াল অ্যাসোসিয়েশন

অব ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার সদস্য ওয়াল্টার ব্রেট। প্রতিবাদী পাদরি লঙ। বাদীর কৌঁসুলি পিটারসন সওয়ালের শুরুতে বলেন, 'দেশের সরকার আদালতের কাঠগড়ায় উপস্থিত হয়েছে।'

হিন্দু পেট্রিয়টে মন্তব্য করা হয়েছিল, 'ব্যাপারটি আরও গুরুতর। প্রতি-বাদীরা সংখ্যায় এত যে আদালতের পক্ষে তাদের স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। প্রতিবাদীরা দেশের সরকারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ' (২৫ জুলাই, ১৮৬১)।

সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে হিন্দু পেট্রিয়ট কোন বিশেষ শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে নি। মেদিনীপুরে জনৈক ব্যক্তি রায়তদের দুর্দশার জন্য জমিদারী প্রথাকে দায়ী করে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। উক্ত পুস্তিকায় সরকারকে রায়তদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়েছিল। এই বিষয়ক সংবাদটির শিরোনামা ছিল 'A Renewed Permanent Settlement' (৩ এপ্রিল, ১৮৫৬)। সিপাহীযুদ্ধের পূর্ববর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপের দাবী যেমন অভিনব, ঠিক তেমনি অভিনব উক্ত বিষয়ে সংবাদ পরিবেশন। আবার পেট্রিয়টের পাতায় (১২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭) বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুস্তিকার উপর নির্ভর করে বাঙলাদেশের জমিদার-শ্রেণীর প্রগতিশীল ভূমিকার কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল।

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ ও পত্রাদিতে আন্ত-র্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। জনৈক রায়তের নামে প্রকাশিত 'The Zeminder and the Ryot' নামক এক পত্রে রাশিয়ার সার্ফদের মুক্তিদাতা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের ভাষণের প্রতি পত্রদাতা বাঙলাদেশের জমিদারশ্রেণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মস্কোয় অভিজাত শ্রেণীর এক সভায় জার রাশিয়ার আধুনিকীকরণের স্বার্থে, সার্ফদের মুক্তির সপক্ষে এক বক্তব্য রেখেছিলেন। উনিশ শতকের পাঁচের দশকে ইংরেজ শাসনের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ নব্য জমিদারগণের দৃষ্টি জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের সংস্কারের প্রতি আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

উনিশ শতকের পাঁচের দশকে বাঙলাদেশের কৃষকসমাজ অসংগঠিতভাবে কিছু ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট সম্বন্ধে হিন্দু পেট্রিয়টে একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির নাম 'English Strikes and Bengallee Dhurmghuts', প্রবন্ধটিতে বলা হয়েছে: '...বাঙলাদেশের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের ধর্মঘট অনেকটা ইংরেজ শ্রমিকশ্রেণীর স্ট্রাইকের অনুরূপ। উভয়

ক্ষেত্রেই সামাজিক বিপর্যয়ের সাধারণ লক্ষণ আছে। এই বিপর্যয় সমাজের উচ্চ এবং নিম্ন সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতার পরিণতি। সমাজের উচ্চশ্রেণীর, নিম্নশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া উ চত।'

কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত 'Hindu Intelligencer' বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের প্রস্তাবকে সময়োপযোগী বলে মনে করে নি। হিন্দু পেট্রিয়টে তার সমালোচনা করে 'The Remarriage of Hindoo Widows' (১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬) নামে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অন্য একটি প্রবন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রচলনের আন্দোলনকে সময়োপযোগী বলে মনে করে মন্তব্য করা হয়েছিল, '…বিধবা বিবাহের ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রতার ফল ভালো না হতে পারে এবং রাজবল্লভের প্রচেষ্টার মত বর্তমান বিধবা বিবাহ প্রচলন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে' (২২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৫)।

হিন্দু পেট্রিয়টে পতিতা নারীর মানবিক সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা হয়েছে। হিন্দু পেট্রিয়টের সংবাদ থেকে জানা যায় যে ১৮৫২-৫৩ খৃঃ কলকাতায় পতিতা নারীর সংখ্যা ছিল ১২,৪১৯ জন (১৫ জুন, ১৮৫৪)।

প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপনের প্রাক্কালে 'Papers relating to the esta blishment of the Presidency College of Bengal' শীর্ষক একটি সরকারী প্রস্তাব বাঙলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়। নিম্নলিখিত পাঠ্যসূচী প্রস্তাবে উল্লেখিত হয়েছিল :

General Branch : Language and litersture, History, Philosophy, Logic, Political Economy, Mathematics, Physics.

Legal Branch : General Jurisprudence, Civil, International, English, Hindoo, Mohamedan, Mercantile and Regulation Law.

Civil Engineering Branch : Drawing, use of Instrument, Surveying, Machinery, Materials, Architecture, Mining and Economic Geology, Public Works.

লর্ড ডালহৌসী ল্যাটিনকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত রাখতে চান নি। হিন্দু পেট্রিয়টে 'An apology for a university' নামক নিবন্ধে ডালহৌসীর প্রস্তাব সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয় :

দেশীয় যুবকগণ প্রাচীন য়ুরোপীয় ক্লাসিকের অধ্যয়নকে উদারনৈতিক

শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করে থাকেন। ল্যাটিন ও গ্রীক-ভাষা য়ুরোপের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বদ্ধ রেখেছে—আমরা প্রেসিডেন্সী কলেজকে সেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ দেখতে চাই…। (মর্মানুবাদ, ৮ জুন, ১৮৫৪)।

৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ নবজাগরণের সুবর্ণ যুগ। প্রথমার্ধে ইংরাজীর মাধ্যমে ইওরোপের উন্নত সভ্যতার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমাদের চিন্তাকাশে যে সূর্যোদয় হয়েছিল সেই সূর্যোদয়ে অনেক আশা ও সম্ভাবনা ছিল। আমরা ইংরেজের সহযোগিতায় চিন্তার ক্ষেত্রে নবলব্ধ দেশপ্রেম, জাতীয়তা প্রভৃতির বাস্তব অবয়ব প্রত্যাশা করেছিলাম। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে বণিক ইংরেজের বাস্তব প্রশাসন, ইংরেজের পক্ষপাতিত্ব ও জাতিবিদ্বেষ আমাদের মনে আস্থা হানির সূত্রপাত করেছে। ইওরোপের প্রগতিশীল চিন্তার উত্তরসাধক এবং গণতন্ত্র ও অন্যান্য বুর্জোয়া মূল্যবোধের ধারক-বাহক ইংরেজ সম্পর্কে আমাদের এই মোহভঙ্গের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর কারণ হল, নতুন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় অর্থাৎ ১৮১৩ খৃঃ এর পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ শিল্প-পুঁজির ভারত শোষণের নতুন অধ্যায় যত দৃঢ় হয়েছে আমাদের তত প্রত্যাশা হানি হয়েছে। রেলপথের প্রতিষ্ঠা ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে এবং ১৮৫৭ খৃঃ এর সিপাহীযুদ্ধের পর কোম্পানীর শাসনের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটলে এদেশে ব্রিটিশ পুঁজির শোষণের জাল আরও বিস্তার লাভ করে। ১৭৫৭ খৃঃ হতে ১৮১৩ খৃঃ পর্যন্ত বাণিজ্য পুঁজির যুগ—১৮১৩ খৃঃ এর পর হতে শিল্প পুঁজির বিকাশ শুরু হয় এবং পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ হলে কোন কোন শিল্পে ভারতীয় পুঁজির বিকাশের সুযোগ উন্মুক্ত হয়; কিন্তু প্রতি-যোগিতার সম্ভাবনা দেখা দিলেই ব্রিটিশ পুঁজি রাষ্ট্রযন্ত্রের সহায়তায় দেশীয় পুঁজির কণ্ঠরোধ করত।

পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের ফলে দুটি সচেতন শ্রেণীর উদ্ভব হল—প্রথমটি বুর্জোয়াশ্রেণী, দ্বিতীয়টি নতুন ভাবধারায় উদ্দীপ্ত পেটিবুর্জোয়াশ্রেণী। একটি স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত (পেটিবুর্জোয়াশ্রেণী) সম্প্রদায়ের কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পেল—শুরু হল

সচেতন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। জনৈক গবেষক যথার্থই বলেছেন, 'উদীয়মান এই বুর্জোয়াশ্রেণী ও পেটিবুর্জোয়াশ্রেণী পরাধীন সমাজের খোলসের মধ্যে আত্মস্ফুরণের সুযোগ পেল না। তাই বিদেশী শাসনের সঙ্গে তাদের বিরোধ উপস্থিত হল' (নরহরি কবিরাজ—স্বাধীনতার সংগ্রামে বাঙলা, চতুর্থ সংস্করণ)।

হিন্দু পেট্রিয়টে এই দুই সজাগ শ্রেণীর সচেতন বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তার প্রতিফলন আছে। এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই পেট্রিয়ট দেশের সমস্যার মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালীরা নবাবী অত্যাচার, বর্গীর আক্রমণ, প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব, সবলের অনাচার প্রভৃতিকে বিধাতার লিখন বলে মেনে নিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা সমস্ত অনাচার ও অত্যাচারের মূল কারণগুলি কি তা ভেবে দেখার চেষ্টা করেছেন—নিয়মতান্ত্রিক পথে তা দূর করার চেষ্টা করেছেন—এটাই বাঙলাদেশের নবজাগরণের ইতিবাচক দিক। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইওরোপের চিত্তবৃত্তির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাঙলাদেশে সীমাবদ্ধ নবজাগরণের যে জলকল্লোল শুরু হয়েছিল, দ্বিতীয়ার্ধে সেই কল্লোলের জোয়ার অনেকখানি স্তিমিত হয়ে গিয়েছে অথচ ভাঁটার সময়ও আসে নি। প্রথমার্ধের কর্ষণ—দ্বিতীয়ার্ধের ফসল। উপনিবেশ হওয়ায় জীবনের অন্যান্য দিক অপেক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ফসল বেশি ফলেছে। উপনিবেশের মাটিতে বুর্জোয়া মূল্যবোধের সৌধ নির্মিত হওয়ায় বিরোধমূলক মনোভাবের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে আপসমূলক মনোভাব অনিবার্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই দ্বৈততা উপনিবেশের জাতীয় জাগরণের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। এই দ্বৈততাজনিত কারণেই পরাধীনতা সর্ব দুঃখের কারণ জানা সত্ত্বেও ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা বারবার ব্যক্ত হয়েছে। সিপাহী অভ্যুত্থানের মত পুরানো ধরনের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ, কৃষক অভ্যুত্থানের ভূমিকা যথাযথ উপলব্ধির অভাব, অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত জীবনযাপনের প্রতি ঝোঁক প্রভৃতি উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের চিন্তার নেতিবাচক দিক। বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকের বিশদ আলোচনার অবকাশ কম। হিন্দু পেট্রিয়টের রচনায় এই দ্বৈততার প্রতিফলন সত্ত্বেও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাগরণের মর্মবস্তু সুপরিস্ফুট। এই মর্মবস্তুর মধ্যে শুধু বুর্জোয়া বা

পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ প্রতিফলিত হয়েছে তাই নয় পরবর্তীকালে কৃষক ও শ্রমিকেরাও এর সদ্ব্যবহার করেছে।

হিন্দু পেট্রিয়টের অবশ্যই একটি প্রশংসনীয় ইতিবাচক ভূমিকা ছিল। যথার্থ সংবাদপত্র জাগরণের মাধ্যম। হিন্দু পেট্রিয়ট উপনিবেশ ভারতবর্ষের ভ্রূণাবস্থায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দু পেট্রিয়ট দুটি প্রধান বিরোধের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রথম বিরোধ, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর বিরোধ এবং এই বিরোধের সঙ্গে দেশের স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাধীনতার প্রশ্ন জড়িত; দ্বিতীয় বিরোধ, ব্রিটিশ পুঁজির সঙ্গে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষকসমাজের বিরোধ। হিন্দু পেট্রিয়ট নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিরোধ দুটির সমাধানের কথা ভেবেছে—ইংলণ্ডের উদারনৈতিকদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে—ভারতবর্ষের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেছে। আজকের চিন্তায় এই দ্বৈততা দুর্বলতার প্রকাশ বলে চিহ্নিত করা যায়; কিন্তু তদানীন্তন যুগ পরিবেশে নতুন ধরনের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সচেতন মানসিকতা সৃষ্টিতে হিন্দু পেট্রিয়টের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

হিন্দু পেট্রিয়টের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হল নীলচাষীদের সপক্ষে জনমত সংগঠন। উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীদের, শিক্ষিত শহুরে মধ্যবিত্তদের যাঁরা বৈপরীত্যের অভিযোগে বাতিল করতে চান, তাঁরা হিন্দু পেট্রিয়টের কৃষকদরদী ভূমিকাটির কথা স্মরণ করবেন। শ্রমজীবী শ্রেণীর সংগ্রামে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সহযোগী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে—উনিশ শতকের নবজাগরণের যুগে অন্তত: সীমিত অর্থে শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা সেই সহযোগী শক্তির ভূমিকা পালন করেছে। (সীমিত অর্থে, কেননা কৃষকের ন্যায্য স্বার্থের পক্ষে কলম ধরলেও এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ অথবা নীলকরদের উচ্ছেদের দাবী জানায় নি অথবা কৃষক বিদ্রোহকে সরাসরি সমর্থন করে নি।) হিন্দু পেট্রিয়ট অনেকাংশে মধ্যবিত্তকে তার ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছে একথা বলা যায়।

উন্নত সভ্যতার মূল্যবোধের সঙ্গে পরিচিতি ও শাসক-শাসিতের সংঘাত আমাদের জাতীয়তাবোধের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল। পেট্রিয়ট একদিকে এই উন্নত সভ্যতার মূল্যবোধের ফসল রক্ষার জন্য বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলন, লিবারেল শিক্ষা ব্যবস্থা, ইওরোপের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রভৃতি

বিষয়ে সরবে প্রচার করেছে, অন্যদিকে নিপীড়িত প্রজাদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে জনমত সংগঠনে ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে সক্রিয় হয়েছে ।

নবজাগরণের ধারক-বাহক শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীকে এবং উক্ত শ্রেণীর মুখপত্রগুলিকে দালাল ও দালালীর মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা কিছু দেশী-বিদেশী পণ্ডিতের রচনায় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। উপনিবেশের বুর্জোয়া ভাবাদর্শ ইওরোপের ভাবাদর্শের সমমানের হতে পারে না। এর কারণ রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পার্থক্য। এই পার্থক্যই দ্বৈততার (dualism) ভিত্তিভূমি। জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে এই দ্বৈতচরিত্রযুক্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি স্থান আছে। এই স্তরটিকে অস্বীকার করা অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। সুতরাং বৈপরীত্য ও সীমাবদ্ধতা দেখে বাঙলা নবজাগরণের ধারকবাহকদের দালাল শ্রেণীভুক্ত করা অথবা ঐ জাগরণের মুখপত্রগুলিকে দালালীর মাধ্যম হিসাবে চিহ্নিত করা অযৌক্তিক। ইংরেজের অসম বাণিজ্য-নীতি ও তার ফলে ভারতীয় জনগণের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরা, স্বায়ত্তশাসনের সপক্ষে বক্তব্য রাখা, ব্রিটিশ র‍্যাডিক্যালিজমের প্রশংসা ও ইণ্ডিয়ান অফিসিয়ালিজমের নিন্দা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী, কৃষকদের রায়তী স্বত্বদানের ব্যাপারে রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার উচ্ছেদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা প্রভৃতি কি প্রশংসনীয় কাজ নয়? এই সব বিষয়ে সংবাদ ও পত্রাদি প্রকাশ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালালী করেছে? বরং বাঙলা নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিন্দু পেট্রিয়ট শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে সমাজমুখিন কর্মযজ্ঞে, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় চিন্তা থেকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রীয় চিন্তার জগতে সমুন্নত করতে চেয়েছে এবং এটাই হিন্দু পেট্রিয়টের সাংবাদিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ ইতিবাচক নিদর্শন।

দেশের জাগরণ : "সোমপ্রকাশের" চোখে

নন্দিনী সেন

১৮৫৮ সনেব ১৫ নভেম্বব "সোমপ্রকাশ" প্রথম প্রকাশিত হয। এই সাপ্তাহিক পত্রেব সম্পাদক ছিলেন সংস্কৃত কলেজেব অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাসাগব মহাশযেব পবামর্শ ও পবিকল্পনা অনুসাবে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেশেব বাজনীতি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক চিন্তা প্রভৃতি বিষযে আলোচনাব অবতাবণা কবে "সোমপ্রকাশ" বাঙলা সাংবাদিকতাব জগতে এক নতুন অধ্যায বচনা কবেছিল।

সোমপ্রকাশের পরিচয়

বাঙলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে উনিশ শতকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুক্তিনিষ্ঠ উদার মানবতাবোধসম্পন্ন মানসিকতার প্রাজ্ঞ পরিণত সুস্মিত রূপটি ফুটে উঠেছিল সোমপ্রকাশের রাজনীতি-সচেতন সাংবাদিকতায় —তার বিষয়বস্তু নির্বাচনে, সংবাদ পরিবেশনায় এবং সম্পাদকীয় দৃষ্টি-ভঙ্গীতে। সোমপ্রকাশের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতি। আলোচনার বিষয়বস্তু, দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট, জনপ্রিয়তা, প্রচার সংখ্যা—যে কোন দিক থেকে বিচার করলে, সোমপ্রকাশ ছিল নিঃ-সন্দেহে উনিশ শতকের বাঙলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপত্র। সেকালের আর একখানি প্রভাবশালী ও প্রগতিশীল দেশীয় সংবাদপত্র, 'অমৃতবাজার পত্রিকার' চোখে সে ছিল 'the father of the vernacular press in Bengal'।(১) বস্তুতপক্ষে, গত শতাব্দীর ছয়ের এবং সাতের দশকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-স্থানীয় পত্র-পত্রিকা-গুলির মধ্যে সোমপ্রকাশ ছিল যথার্থই নেতৃস্থানীয়। আদর্শগতভাবে সেকালের দেশীয় সংবাদপত্র জগতে এটি ছিল এক বিশিষ্ট অভিনব ধারার

সৃষ্টিকারী। পরাধীন ভারতবর্ষে সংবাদপত্রকে মাতৃভাষায় জাতির রাজনীতি শিক্ষার মঞ্চরূপে গড়ে তোলার সুষ্ঠু সচেতন পরিকল্পনা নিয়েই তার আবির্ভাব এবং একথা আদৌ অতিভাষণ নয় যে 'ইহাতেই প্রথমে বঙ্গবাসীকে রাজনৈতিক শিক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের রুচি জন্মাইয়া দেয়।'(২)

সমকালীন ইওরোপীয় সভ্যতার মর্মবস্তু বিশুদ্ধ যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত মানবিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ সোমপ্রকাশের বিশিষ্টতার প্রকাশ বিশ্বের সকল অংশে সকল নির্যাতিত জাতিগোষ্ঠীর প্রতি তার সুগভীর সহমর্মিতা প্রকাশে, সমকালীন সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বপক্ষতা করায়, স্বদেশের ও বিদেশের সমাজে নির্যাতিত উৎপীড়িত অংশের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রদর্শনে এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী পূরণে আহ্বান জানিয়ে বলিষ্ঠ জনমত গড়ে তোলার প্রয়াসে।

সমকালীন বিশ্ববিকাশের স্তরে সামন্ততন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণ পর্বে এক একটি বিশিষ্ট পদক্ষেপসম আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী—আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, পোল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন, জারবিরোধী নিহিলিষ্ট আন্দোলন ইত্যাদি—সোমপ্রকাশের গভীর আগ্রহের বিষয়। এইসব ঘটনা প্রসঙ্গে ব্যক্ত অভিমতে তার প্রগতিশীলতার ছাপ অতি স্পষ্ট। সে তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ধনতন্ত্রবাদ ও উপনিবেশবাদ সম্পর্কেও প্রশ্ন তুলেছে। বুর্জোয়া সভ্যতার মারাত্মক বিচ্যুতি সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছে. কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক, প্যারী কমিউনের আদর্শ, কমিউনিজম সোস্যালিজমের চিন্তাদর্শের সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এশিয়া, আফ্রিকার দেশে দেশে সভ্যতাগর্বী ইওরোপের ঔপনিবেশিক অভিযানের মুখোশ, যতদূর পেরেছে, খুলে দিয়েছে, বুর্জোয়া সভ্যতার বিকৃতি, মানবজাতির চরম শত্রু সমরবাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছে; সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে আফগানিস্থানে, চীনে, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে যে জাতীয়তাবাদী জাগরণ আরম্ভ হয় তাকে সমর্থন জানিয়েছে। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সোমপ্রকাশ এদেশে আন্তর্জাতিকতাবোধের উদ্বোধন করেছে।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতে অর্থনৈতিক শোষণের নগ্নচরিত্রটি সে যতদূর পেরেছে তুলে ধরেছে এবং অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার দিকে দেশের

মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই প্রসঙ্গে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সে কৃষকের স্বত্বের প্রশ্নটি উত্থাপন করেছে। জমির উপর কৃষকের স্বত্ব যেসব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেইসব দেশে (ফ্রান্স, জার্মানী, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড প্রভৃতি) কৃষকদের কতখানি 'শ্রীবৃদ্ধি' হয়েছে তার ছবি দেশবাসীর সামনে গভীর আগ্রহে তুলে ধরেছে। ব্রিটিশ শাসনে এদেশে বারে বারে যে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছে তার মূল কারণ যে জমির উপর কৃষকের স্বত্বহীনতা, এবং ব্রিটিশ শাসনে দেশের 'স্বত্ববিশিষ্ট রায়ত' কিভাবে ক্রমে 'স্বত্বহীন মজুরে' পরিণত হচ্ছে ও তা থেকে উদ্ভূত অর্থনৈতিক সামাজিক বিপর্যয় —ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফলের এই দিকটির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি সে বারবার আকর্ষণ করেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এবং সমগ্রভাবে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থার সমালোচনা ও দুর্গত কৃষকের পক্ষ অবলম্বন করে অজস্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। দেশে কৃষকেব সমস্যা যে সবচেয়ে বড় জাতীয় সমস্যা এবং এটির সমাধান ব্যতীত দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা (যা তার দৃষ্টিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বশর্ত) যে কখনই অর্জন করা যাবে না সেকথা দেশবাসীকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

মূলকথা, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর এবং ইংরেজ শাসনের সঙ্গে দেশের জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ কৃষকসমাজের বিরোধটিকে তুলে ধরে সোমপ্রকাশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্ততন্ত্রবিরোধী চেতনার পরিচয় দিয়েছে এবং নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিরোধ দুটির মীমাংসার কথাও ভেবেছে—যদিও আজকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলে তা অনেক দুবল।

একথা স্বীকার করতেই হবে শত দুবলতা সত্ত্বেও, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের জাগরণের প্রশ্নটি তুলে ধরে এবং আন্তর্জাতিকতাবোধের উদ্বোধন করে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সার্থক মুখপত্র সোমপ্রকাশ দেশবাসীর মধ্যে রাজনীতি সচেতনতা সৃষ্টি করেছিল। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায় দেশীয় সাংবাদিকতার জগতে সোমপ্রকাশ এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল। তার দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই ঔপনিবেশিকতাবিরোধী, সামন্ততন্ত্রবিরোধী গণতান্ত্রিক চেতনার আভাস লক্ষ্য করে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী রীতিমত শঙ্কিত হয়েছিল। তাই তার দৃষ্টিভঙ্গীর নির্ভীকতা ও বলিষ্ঠতার জন্যে সোমপ্রকাশকে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ আইনের দমননীতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

জাতির জীবনে এহেন পত্রিকার আবির্ভাব নভেম্বর ১৮৫৮ সালে, যখন কোম্পানীর শাসনের ভিত্তি কাঁপিয়ে তোলা ভারতীয় জনগণের মহাবিদ্রোহটি সবে বহুকষ্টে অবদমিত হয়েছে। পরাধীন দেশের জনগোষ্ঠীর জীবনে এই ঐতিহাসিক ভূমিকা-সম্বলিত সংবাদপত্রের রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। যথার্থ পরিমার্জনা দ্বারা তার বিশিষ্ট চরিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলার প্রধান কৃতিত্ব তার স্বনামখ্যাত সম্পাদক, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'পরম-বন্ধু' সংস্কৃত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের। সূচনা থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় সোমপ্রকাশের সঙ্গে সক্রিয় আগ্রহ নিয়েই যুক্ত ছিলেন। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় কলকাতার চাঁপাতলা অঞ্চল থেকে। অল্প কিছুদিন পর এটি কলকাতার নিকটবর্তী গ্রাম চাংড়িপোতা (বর্তমান সুভাষগ্রাম, ২৪ পরগণা) হতে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট' (মার্চ, ১৮৭৮)-এর প্রতিবাদে সোমপ্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং প্রায় এক বছর ধরে তার প্রকাশ বন্ধ থাকে। যতদূর জানা যায় ১৮৮৬ সালের ২৩ আগস্ট বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুর পরও সোম-প্রকাশ কিছুকাল প্রকাশিত হয়। সোমপ্রকাশ পত্রিকার মূল বক্তব্য: ইংরেজ শাসনে দেশের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র ও সার্বিক অবনতির মূল হল দেশের অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা। এই অবস্থা থেকে দেশের মুক্তির একমাত্র পথ হল, উন্নততর কিন্তু স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশ, যার পূর্বশর্ত, তার মতে, ভূমিতে কৃষকের স্থায়ী স্বত্ব প্রতিষ্ঠা।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের স্বরূপ

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর কোম্পানীর লুণ্ঠনাশ্রয়ী শাসনব্যবস্থায় আনুষ্ঠানিকভাবে ছেদ টেনে দিয়ে যখন ইংলণ্ডের শিল্পপুঁজির স্বার্থে ভারত-শোষণের নতুন অধ্যায় উন্মুক্ত হল, তখন একদিকে ব্রিটিশ পণ্যের খোলা বাজার আর একদিকে ব্রিটিশ কারখানার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহের উৎস হিসাবে ভারতকে গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু হল। সেজন্য এই পর্বে ভারতে ইওরোপীয়দের মালিকানায় শুরু হল আধুনিক কৃষিখামারে চা, কফি, রবার ইত্যাদির ব্যাপক চাষ-আবাদ। সেই সঙ্গে চলল কাঁচা তুলা, পশম, তিসি, পাট ইত্যাদির ও খাদ্যশস্যের ক্রমশ অধিক থেকে অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন ও রপ্তানীতে উৎসাহদান। ব্রিটেন থেকে পণ্য আমদানী ও ভারত

থেকে ব্রিটেনে কাঁচামাল রপ্তানীর কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যে ইংরেজ শাসনের উদ্যোগে ভারতে এই পর্বে শুরু হল রেলপথ স্থাপন, আধুনিক রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি। বলাই বাহুল্য এইসব উদ্যোগ আয়োজন ভারতে সভ্যতার আলো বিকীরণ করার জন্যে নয়, বস্তুত, আরও বিজ্ঞানসম্মত কায়দায় ভারত শোষণের প্রয়োজনে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতে ইংরেজ শাসনের উদ্যোগে সেইসব আয়োজন লক্ষ্য করে সোমপ্রকাশ লিখেছে: বর্তমানে দেশে প্রতিবছর তুলোর চাষ ও তার রপ্তানী বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে তুলো ইংলণ্ডে গিয়ে সুতো ও বস্ত্র হয়ে (ফিরে) আসছে; এদেশীয়েরা কেবল মজুরী করে তার উৎপাদন করছে মাত্র, সেই তুলোর প্রকৃত ফলভোগী হতে পারছে না।(৩) এই প্রসঙ্গে সে আরও লিখেছে যে বরং পূর্বে যখন বস্ত্র বয়নের এবং তুলো উৎপাদনের কাজ এই দেশেই সম্পন্ন হত তখন যে শুধু বয়নের কাজে এদেশের বহু লোকের জীবিকার সংস্থান হত, তাই নয়, তখন তার জন্য যে অর্থব্যয় হত এদেশের লোকেরাই তার ফলভোগী হত। তার মতে তাতে যে দেশের কত মঙ্গল হত তা বলা যায় না।(৪) কাজেই এদেশীয়দের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান ব্যবস্থা সম্পর্কে সে প্রশ্ন তুলেছে 'এদেশে তুলা জন্মিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গেল, তাহাতে এদেশের কি শ্রীবৃদ্ধি হইল? এদেশীয়দিগের মজুরী লাভ, ইহাই কি শ্লাঘনীয় শ্রীবৃদ্ধি?'(৫) সোমপ্রকাশ দেখছে রাজপুরুষেরা প্রচার করেন ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকেরা নাকি ভারতবর্ষের মহোপকার করছে।(৬) দেশীয়-দেরও একাংশ ভাবেন, ইংরেজ শাসনের সুফলস্বরূপ সস্তায় বিলেতী কাপড় সহজলভ্য হয়েছে। রাজপুরুষদের সেই মিথ্যা প্রচার আর দেশীয়দের একাংশের ঐ ভ্রান্ত ধারণা লক্ষ্য করে দেশীয়দের প্রকৃত স্বার্থ সম্পর্কে প্রখর চেতনা-সম্পন্ন সোমপ্রকাশ বিদ্রূপের সুরে মন্তব্য করেছে 'আমার প্রতিবেশী ধনবান হইলে আমি তাহার বাগানের মালী হইব, এ আশা আর আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারকে তুলা দিয়া স্বচ্ছন্দে বস্ত্র পরিধান করিব, এই আশা সমান।' তাই আক্ষেপ করে আরও লিখেছে 'যে সৌভাগ্য কয়েকজন বিদেশীয় তন্তুবায়ের যত্ন ও স্বার্থসিদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে, সে সৌভাগ্য কি (প্রকৃত) সৌভাগ্য?'(৭) ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের প্রকৃতই কতটুকু কি উন্নতি হচ্ছে তার হিসেব করতে গিয়ে সোমপ্রকাশ আর এক জায়গায় লিখেছে ইংরেজ শাসনে, দেখা যাচ্ছে, একদিকে বাষ্পীয় তাঁত

প্রভৃতির প্রাচুর্য আর একদিকে ইংলণ্ডের তাঁতীদের সুবিধার জন্যে মধ্যে মধ্যে আইন হওয়াতে (এ দেশের) বস্ত্রের বাণিজ্য লোপ পেয়েছে; অথচ ইংরেজ গবর্ণমেন্ট কেবলই বলেন তাঁরা নাকি 'ভারতবর্ষের অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন' করছেন। এই প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—ভারতবর্ষে বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে যে তুলো উৎপন্ন হচ্ছে তা দিয়ে এদেশেই ম্যাঞ্চেষ্টারের মত বাষ্পীয় তাঁতের সাহায্যে বস্ত্র তৈরী করে পৃথিবীর সর্বত্র রপ্তানী করার কথা গবর্ণমেন্ট ভুলেও ভাবেন না। 'আমরা ইংলণ্ডের উপর বস্ত্রের জন্য নির্ভর না করিয়া ইংলণ্ড আমাদিগের উপরে নিভর করিবেন, গবর্ণমেন্ট কি কখনও এরূপ কথা মুখে আনিয়াছেন? যদি তাহা না হইল, তবে আমাদিগের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি কোথায়?'(৮)

ভারতবর্ষের শাসনভার কোম্পানীর হাত থেকে মহারাণীর হাতে যাওয়া অবধি এদেশে ইংরেজ শাসনে 'রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানা প্রকার সভ্যতাসূচক কার্য্যের অনুষ্ঠান' লক্ষ্য করে দেশীয়দের যে অংশটি মনে করে এই সবের দ্বারা ইংরেজ শাসনে 'দিন দিন দেশের সৌভাগ্যই বাড়িতেছে…'(৯) সোমপ্রকাশ তাদের কাছে প্রশ্ন রেখেছে 'কিন্তু কিয়ৎক্ষণ স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া বল দেখি, ভরতবর্ষবাসী কয় ব্যক্তি এই সকল দ্বারা যথার্থ লাভবান হইতেছেন? · চা, কফি, রেলওয়ে ও পতিত ভূমি কর্ষণ প্রভৃতিতে মূলধন বিনিয়োজিত হইতেছে সে অযথার্থ নহে, কিন্তু এদেশের কয়জন তত্তদ্বিষয়ে মূলধন বিনিয়োগ করিয়া তাহার লাভভাগী হইতেছেন? উহার উপস্বত্ব কি ইউরোপ-খণ্ডগত হইতেছে না? ঐ সকল বিষয়ে এদেশীয়দিগের চাকুরী ও মজুরী সম্বন্ধে যে কিছু লাভ এই মাত্র। এক্ষণকার লোকদিগের কয়জন অতুল ঐশ্বর্য্য অর্জন করিয়াছেন? পক্ষান্তরে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এদেশের প্রাচীন ধণীরা ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিতেছেন।'(১০) তার নিজের কাছে অবশ্য প্রকৃত ব্যাপারটা হল এইরকম: 'এক্ষণে (আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের দরুণ উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলে) ম্যাঞ্চেষ্টার বিপদাপন্ন হইয়াছেন, তাই গবর্ণমেন্ট চতুর্দ্দিকে শূন্য দেখিতেছেন, তাঁহাদিগের আর দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই। (তাই) কোথাও তূলোৎপাদন ক্ষেত্র অন্বিষ্ট হইতেছে, কোথাও রেইলওয়ে, কোথাও ট্রামওয়ে, কোথাও বা কন্‌ট্রক্ট বিলের প্রস্তাব হইতেছে, এইরূপে চতুর্দ্দিকে মহা ধূমধাম লাগিয়াছে'।(১১) তাই ইংরেজ শাসনে 'ভারতবর্ষের বাহ্য সৌভাগ্য চিহ্ন দর্শন' করে দেশীয়দের যে অংশটি

'বিমোহিত' সোমপ্রকাশ তাদের দূরদর্শিতা সহকারে ভেবে দেখতে অনুরোধ করেছে 'কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের হিতার্থ গবর্ণমেন্ট কি স্বপ্নেও এসকল মনে করিয়াছিলেন ?'(১২)

নীলকর ও চা-করেরা নিজেদের এদেশের 'শ্রীবৃদ্ধিকারী'(১৩) বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। কারণ তারা নাকি এদেশের কৃষিতে উন্নত প্রণালী প্রয়োগ করে এদেশের শ্রীবৃদ্ধিতে সহায়তা করছেন ; অতএব তাঁরা ভারতবর্ষের বন্ধু। কিন্তু ইংরেজ শাসনেব ছত্রছায়ায় এই তথাকথিত শ্রীবৃদ্ধিকারীর দল বস্তুতঃ এদেশের কেমন শ্রীবৃদ্ধি সাধন করছেন সোমপ্রকাশ তার দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখেছে 'নীলপ্রধান প্রদেশে কৃষিকার্য্যে তাহার (কৃষকের) যে স্বাধীনতা ছিল তাহা বিনষ্ট হইল, তাহাকে পরাধীন হইয়া কথঞ্চিৎ দিন যাপন করিতে হইল, তাহার অন্নকষ্ট হইল, স্বাধীনতা গেল, নীলকর সার তুলিয়া লইলেন, পরের পরিশ্রমে তাহার নবাবী বাড়িল, তিনি বিলক্ষণ দশটাকার সঙ্গতিশালী হইয়া উড্ডীয়মান পক্ষীর ন্যায় স্বদেশে উড়িয়া গেলেন।' (১৪) ইংরেজ শাসনে এদেশের কৃষিতে বিদেশী পুঁজির শোষণ সম্পর্কে সোমপ্রকাশের তীব্র সচেতনতাটি লক্ষ্যণীয়। এদেশের উন্নতিতে উক্ত 'শ্রীবৃদ্ধিকারী' দলেব ভূমিকা নির্ধাবণ করতে গিয়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সোমপ্রকাশ মন্তব্য করেছে 'কিন্তু আমবা ভাবতবর্ষের বিশেষতঃ কৃষকশ্রমজীবী ব্যক্তিদিগের অনিষ্ট বিনা ইষ্টলাভ দেখিতেছি না। শ্রীবৃদ্ধিকারীদিগের হস্তে পতিত হওয়াতে তাহাদিগকে চিরকাল কষ্টভোগ করিতে হইতেছে। তাহাদিগের যে কেবল স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে এরূপ নহে, তাহারা শরীর সমর্পণ করিয়াও উদর পূরণে পর্যাপ্ত অর্থলাভে সমর্থ হইতেছে না।'(১৫) অতএব যাঁরা নীলকর চা-করদের এদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনকারী রূপে বর্ণনা করেন এবং তাদের ভারতবর্ষেব বন্ধু হিসেবে গণ্য করেন, সোমপ্রকাশ তাঁদের কাছে ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করেছে 'যে সকল ব্যক্তি এদেশীয়দিগের, বিশেষতঃ কৃষক ও মজুরদিগের স্বাধীনতালাভ চেষ্টায় সহায়ক না হইয়া প্রত্যুত তাহাদিগকে দাসবৎ পরাধীন করিয়া রাখিবার চেষ্টা পাইতেছেন, তাহারা ভারতবর্ষের কি প্রকার বন্ধু ? কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগের নিকটে এদেশের যথার্থ স্বাধীনতা, সৌভাগ্য ও সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ প্রত্যাশা করেন ?···কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি কয়েকজন নিরন্ন নীলকর ও চা-করের স্বার্থলাভকে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি বলিয়া গণনা করিতে উৎসাহী হইবেন ?'(১৬)

অতএব ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের ক্রমে উন্নতি হচ্ছে এই ধারণা সৃষ্টিতে যারা প্রয়াসী তাদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে সোমপ্রকাশ লিখেছে 'যখন হতাশ কৃষকদিগের দীর্ঘশ্বাস, অত্যাচার নিবন্ধন মজুরদিগের ক্রন্দন, ভদ্রলোকদিগের অবমাননা ও স্বত্বহানিজনিত আর্তনাদ নিরন্তর আমাদিগের শ্রুতিপথের উন্মার্গকারী (?) হইতেছে, তখন কোন্ ব্যক্তি সাহস করিয়া বলিতে পারেন, ভারতবর্ষের উন্নতি হইতেছে ?'(১৭) এখানে লক্ষ্য করার বিষয় সোমপ্রকাশের চোখে ভারতবর্ষ বলতে বুঝিয়েছে ইংরেজ শাসনের তল্পিবাহক মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী সম্প্রদায়টিকে নয়, বুঝিয়েছে সেই শাসনে নির্যাতিত শোষিত কৃষক শ্রমজীবী মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়টিকে—এক কথায়, দেশের ব্যাপক জনগণকে।

ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের কতটুকু কি শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে তার বিচার প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশের একমাত্র মাপকাঠি হল ভারতীয়দের স্বার্থ। এ বিষয়ে তার সুস্পষ্ট অভিমত 'ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি কথার অর্থ অন্বেষণ করিতে হইলে অত্রত্য হিন্দু ও মুসলমানেরাই নিঃসন্দেহে শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্য হয়, ইউরোপীয় ও আমেরিক প্রভৃতি লক্ষ্য হয় না।'(১৮) সেই হিসেবে বিচার করলে, সোম-প্রকাশের মতে 'এদেশেব দৈনন্দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে একথা অযথার্থ নহে। কিন্তু তাহা প্রকৃত ভারতবর্ষীয়দের সম্বন্ধে হইতেছে না।'(১৯) এখানে লক্ষ্য করার বিষয় সোমপ্রকাশের অগ্রসর চেতনায় উনিশ শতকের মধ্যভাগেই ভারতীয় জাতীয় স্বার্থবোধের প্রগতিশীল ধারণাটি সুপরিস্ফুট। ইংরেজ শাসনে 'ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতির' মূল্যায়ন করতে গিয়ে, বস্তুতঃ, সে দেখছে 'শূন্যগর্ভ।'(২০) সে দেখছে 'ভারতে ভারতবর্ষ শাসন ও ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন এই দুই মনোহর বাক্য···ব্যাধের মধুর সঙ্গীত দ্বারা মৃগবশীকরণের ন্যায় পুনঃপুনঃ উচ্চারণ দ্বারা লোককে মোহিত করিয়া বস্তুতঃ (ইংলণ্ড তার নিজের) স্বার্থ সাধন করিতেছেন।'(২১) ভারতে তথাকথিত 'উন্নত' 'সুসভ্য' ইংরেজ শাসনের প্রকৃত রূপ প্রথম থেকেই সোমপ্রকাশের চিনতে মোটেই ভুল হয়নি।

বস্তুতপক্ষে, সাত আটশ বছরের মুসলমান শাসনের বিপরীতে গত একশ বছরের ইংরেজ শাসন এ দেশের পক্ষে, সোমপ্রকাশের দৃষ্টিতে যে বৈপ্লবিক ফলাফল সৃষ্টি করেছে, (২২) তার মর্মটি হল 'যে পরিমাণে লোকের প্রবৃত্তি কামনা প্রভৃতি বিস্তৃত হইয়াছে এবং যে পরিমাণে ব্যয়বাহুল্য অত্যাবশুক হইয়া উঠিয়াছে, আজিও তদনুরূপ অর্থাগমের দ্বার উদঘাটিত হয় নাই। যে সকল

যার উদঘাটিত ছিল তাহাও ক্রমে বন্ধ হইতেছে...দ্রব্যাদি দুর্মূল্য হওয়াতে সুখী জীবিকা নির্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, অথচ লোকে জীবিকা নির্বাহোপ-যোগী অর্থপার্জনেরও পথ দেখিতে পাইতেছে না।...এইরূপে যতই দিন যাইতেছে কি ভদ্র কি অভদ্র সকল শ্রেণীর লোকেই একপ্রকার নৈরাশ্যে অভিভূত হইতেছে।'(২৩)

সোমপ্রকাশ দেখছে ইংরেজ শাসনে, 'বিদেশী কলাকৌশল নিষ্পন্ন দ্রব্যাদির সংঘর্ষণে'(২৪) এবং বিদেশী বণিকের সহায়ক সরকারী শুল্কনীতির ফলে এ দেশের শিল্প লুপ্ত হয়ে গেছে।(২৫) সে দেখছে, বস্তুতপক্ষে 'ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকেরা বিধিমতে আমাদের দরিদ্র তন্তুবায়দিগের শত্রুতা সাধন করিতেছেন।'(২৬) জাতব্যবসা হারিয়ে দেশীয় কারিগর সম্প্রদায় ব্যাপকহারে জীবিকাচ্যুত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় অধিকাংশ মানুষেরই কোন কাজকর্ম নেই, কোন কাজকর্ম করবে, সে উপায়ও নেই। এদের জীবন একপ্রকার বিড়ম্বনায় পরিণত হয়েছে।(২৭) জীবিকাচ্যুত এইসব কারিগর ও শিল্পী সমাজের গলগ্রহ স্বরূপ হয়ে পড়েছে।(২৮)

ইংরেজ শাসনে ব্যাপকহারে এদেশের শিল্প ক্রমে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করে গভীর নৈরাশ্যের সুরে সোমপ্রকাশ লিখেছে 'কোন দেশ আমাদিগের শিল্পের উপর নির্ভর করিতেছে? আমরা নিজে কোন্ প্রয়োজনোপযোগী অথবা বিলাসদ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিতেছি? আমাদিগের যাহা ছিল তাহাও ক্রমে লোপ পাইতেছে।'(২৯) উপরন্তু দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ড এদেশেরই পাট নিয়ে এদেশবাসীকে পরিধেয় দিচ্ছে, এদেশের বসা নিয়ে ইংলণ্ড বাতি প্রস্তুত করছে। এদেশের ইক্ষুদণ্ড, কদলীবৃক্ষ ও চাল নিয়ে এদেশবাসীকে কাগজ যোগাচ্ছে। আর এদেশবাসী নির্জীব হয়ে আছে আর ক্রমেই তাব দারিদ্র বৃদ্ধি পাচ্ছে।(৩০) প্রাক্ ব্রিটিশ শাসনপর্বেব শিল্প রপ্তানীকারী দেশ থেকে ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষকে, আরও সুশৃঙ্খলভাবে শোষণের উদ্দেশ্যে, ইংলণ্ডের শিল্পদ্রব্য আমদানীকারী দেশে পরিণত করার ষড়যন্ত্রটি সোমপ্রকাশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি।

সোমপ্রকাশের কাছে আরও আক্ষেপের বিষয়, দেখা যাচ্ছে দেশীয় শিল্প-নৈপুণ্য ধ্বংস হয়ে গেলেও তার জায়গায় ইউরোপীয় ধরনের আধুনিক 'বৈজ্ঞানিক কলকারখানা'ও বিশেষ গড়ে ওঠেনি।(৩১) ইদানীং চটকল, সুতাকল প্রভৃতি যে সামান্য আধুনিক শিল্প স্থাপিত হয়েছে তাতে দেশের যে

পরিমাণ শ্রমজীবীর জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে তাদের 'সংখ্যা পূর্বকার শিল্পজীবী-দের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প।'(৩২) বর্তমানে দেখা যাবে একদিকে লোক-জনের চলবার ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে রাস্তাঘাট ও রেলওয়ে, ওদিকে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্যে খাল, সেদিকে বস্ত্রের কল, চতুর্দিকে অতুল বিভব। এক একটি নগরে প্রবেশ করলে বোধহয়, লক্ষ্মী যেন মূর্তিমতী হয়ে বিরাজ করছেন। প্রসঙ্গক্রমে সোমপ্রকাশ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে কিন্তু সেই ঐশ্বর্য ভারতবাসীর ভোগের জন্যে নয়, দারিদ্র দুর্ভিক্ষে নিত্য জর্জর চিররুগ্ন ভারত-বাসীর শুধু করুণ চোখে চেয়ে দেখাব জন্যে।(৩৩) বরং সেই শিল্পকার্য বিদেশীয়ের হাতে ন্যস্ত থাকায় তা থেকে উৎপন্ন প্রচুর লাভ তারা বিদেশে বসে ভোগ করে।(৩৪) এতে, সোমপ্রকাশের মতে, এদেশীয়দেব চাকরী বা মজুরী-লাভ ভিন্ন বিশেষ কিছু লাভ দেখা যায় না।(৩৫) এখানে লক্ষ্য করার বিষয় বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগে শিল্পবিকাশের ফলে দেশীয় স্বার্থ যে রক্ষা হয় না, সেবিষয়ে, প্রথম থেকেই, সোমপ্রকাশ পূর্ণ সচেতন।

সোমপ্রকাশের মতে বর্তমানে (ইংরেজ আমলে) এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে প্রধানতঃ কৃষিজ পণ্যের রপ্তানীকে বোঝায়। এখন এদেশে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের বাণিজ্য চলছে, তাতে এদেশীয়দের কোন অংশ নেই। ইউরোপীয় বণিকেরাই সমুদায় বাণিজ্য একচেটিয়া করে রেখেছেন।(৩৬) ঐ বৈদেশিক বাণিজ্য সম্ভূত লভ্যাংশ বিদেশেই সঞ্চিত ও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং তার মতে এদেশীয়দের তাতে কোন লাভ নেই, বরং ক্ষতি হচ্ছে।(৩৭)

ইংরেজ শাসনে দেশের শিল্প বাণিজ্যের এই পরিস্থিতির দরুণ, সোমপ্রকাশ মনে করে, ভূমিই এদেশীয়দের জীবিকার একমাত্র উৎস,(৩৮) কৃষিকর্মই এদেশীয়দের একমাত্র আয়দ্বার। আবার এই 'বিপুল রাজ্যের অপরিসীম ব্যয়ও' নিষ্পন্ন হয় কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ থেকে। সুতরাং এক ভূমিই ভারতবর্ষের ধন এবং ভূমি প্রসাদেই ভারতবর্ষীয়েরা কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করছেন।(৩৯) একারণ ভূমির তীব্র চাহিদা।(৪০) এই পরিস্থিতিতে সোমপ্রকাশের অভিজ্ঞতা—'সুন্দরবনের গহন বন ভিন্ন মনুষ্যের পদার্পণোপযোগী এমন এক বিঘাও ভূমি দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে লাঙ্গল পড়ে নাই।'(৪১) সে লিখেছে 'এখন আর তিল পরিমাণ ভূমি কোথাও পতিত নাই।'(৪২) সুতরাং তার চোখে সমস্যা হল এত লোক প্রতিপালিত হতে পারে সেরূপ ভূমিই বা কই ?(৪৩) অথবা বলা যায় 'আর কত লোক সেই

কার্যে নিযুক্ত হইতে পারে?'(৪৪) আবার কৃষিকর্মই ভারতবর্ষের অর্থাগমের একমাত্র উপায় হওয়ায় কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করেই তার লভ্যাংশ হতে এই 'বিপুল রাজ্যের অপরিসীম ব্যয়'(৪৫) নিষ্পন্ন হয়। অথচ, সোমপ্রকাশের মতে, বর্তমানে এদেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তার প্রধান কারণ, তার মতে ইংরেজ শাসনে এদেশের ভূমিব্যবস্থা ও সরকারের রাজস্ব প্রণালী।(৪৬) একথা সে নানা প্রসঙ্গে নানাভাবে ব্যক্ত করেছে। সে দেখিয়ে দিয়েছে ইংরেজ অধিকারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যতপ্রকার ভূমি-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে তার কোনটিতেই ভূমিতে কৃষকের স্থায়ী স্বত্ব ও দেয় খাজনার হার চিরতরে নির্দিষ্ট না থাকায় ভূমিতে কৃষকের মমতা থাকে না ও সেকারণ ভূমির উন্নতি দ্বারা কৃষির উন্নতি সম্ভব হয় না। অতএব সমগ্রভাবে বিচার করলে, তার বক্তব্য, স্বীকার করতেই হবে, ভূমি সংক্রান্ত রাজস্ব প্রণালী প্রশংসনীয় নয়। যাবতীয় করভার শেষ পর্যন্ত কৃষকের উপরেই পড়ে।(৪৭) এতকাল যদিও এদেশীয়েরা মনে করত, সে লিখেছে, 'যে জাতিই এদেশে প্রভুত্ব করুন, যতই অত্যাচার হউক না কেন, কেহই আমাদিগের ভূমি মস্তকে করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না। কিন্তু ইনকম ট্যাক্স, মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স, রথ্যাকর প্রভৃতিতে ভূমির সমুদায় রস শোষণ করিতেছে। যাবতীয় করভার দরিদ্র কৃষকের উপরেই পতিত হইতেছে।'(৪৮) এখানে লক্ষ্য করার বিষয় মুসলমান আমলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে ইংরেজ আমলের ঐ ব্যবস্থার মূলগত পার্থক্য, বর্তমান ব্যবস্থা যে বিদেশী শোষণের হাতিয়ার, সোমপ্রকাশ সে বিষয়ে বেশ সচেতন। কৃষকের দুরবস্থার কারণ হিসেবে সে আরও লিখেছে বর্তমানে এদেশে এমন কতকগুলি লোক এসে জুটেছে যারা প্রজাদের ভূস্বামীত্ব লোপ করে তাদের দৈনন্দিন শ্রমজীবী করে তোলার চেষ্টায় আছে।(৪৯) এরা এদেশের কৃষকের স্বাধীনতা হরণ করে, তাকে দিয়ে পশুবৎ খাটিয়ে বিলক্ষণ 'দশ টাকার সঙ্গতিশালী' হয়ে ওঠে, তারপর একদিন ধনী হয়ে দেশে ফিরে যায়।(৫০) ইংরেজ শাসনে দেশের কৃষি ও কৃষকের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে সোমপ্রকাশ লিখেছে বর্তমানে কৃষিকর্মে কৃষকের লাভ নেই। একজন কৃষক ভূমি কর্ষণ দ্বারা যা উৎপন্ন করে, তাতে তার পারিবারিক জীবিকা নির্বাহ ও অভাব মোচন হয়ে কিছুই সঞ্চয় থাকে না। বরং অনেক স্থলে আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় হয়, সুতরাং মহাজনদের বা জমিদারের কাছে দেনাদার হতে হয়। এর উপর যদি অজন্মা হলো তবে আগামী পাঁচ

বছরেও বহু চেষ্টায় নিজের অবস্থার সংশোধন করতে পারে না। ক্রমে তার হাল গরু জমি বিক্রয় হয়ে যায়, দুর্দশার চরম সীমায় সে উপস্থিত হয়। কাল কি খাবে কৃষকের ঘরে তার সংস্থান থাকে না। কাজেই কৃষিজ আয়ের দ্বারা যেমন কৃষকের আর স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহ হয় না, তেমনি ভূমির উপস্বত্ব ভোগীদেরও সেই আয়ে আর চলে না।(৫১) ইংরেজ শাসনে এদেশে বিদেশী শাসন ও শোষণের স্বার্থে কৃষিতে মধ্যযুগীয় ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের একদিকে নবতর বিন্যাস আর একদিকে সেই কাঠামোর মধ্যে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে এদেশের কৃষি ও কৃষকের জীবনে যে অভূতপূর্ব সংকট ঘনিয়ে এসেছিল, যথেষ্ট অগ্রসর চেতনার অধিকারী সোমপ্রকাশ তাকে বিশ্লেষণ করেছে এইভাবে, তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে।

সোমপ্রকাশ দেখেছে এদেশে ইংরেজ শাসনে সভ্যতা প্রভাবে সমাজে নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম ক্রমে বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায়, সমাজে অপেক্ষাকৃত উচ্চ বর্ণের লোকেদের তা থেকে যে আয় হত তা রুদ্ধ হয়ে আসে। কাজেই এদের অনেকেই "স্বকৃত ভঙ্গ করে" জীবিকার সন্ধানে চাকরী শুরু করেন। এখন সে পথেও কাঁটা পড়েছে। এখন সহস্র সহস্র লোক চাকরী চাকরী করে আর্তনাদ করছেন। সোমপ্রকাশের কাছে সমস্যা হল এত লোকের ক্ষুধা শান্তি হয় এত চাকরী কোথায়।(৫২) অথচ দেখা যাচ্ছে, ইংরেজ শাসনে একদিকে যেমন ভারতবাসীর জীবিকা অর্জনের সুযোগ ক্রমেই দুর্লভ হয়ে এসেছে, এবং সেই সঙ্গে উত্তরোত্তর রপ্তানী বৃদ্ধির দরুণ দ্রব্যসামগ্রী অতিশয় মহার্ঘ হয়ে উঠেছে, আর একদিকে তেমনি 'সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে' নতুন নতুন ভোগ্য বস্তু নতুন নতুন সামগ্রী অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। সেগুলি না হলে সমাজে হেয় ও অবগণিত হতে হয়। কাজেই ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়াতে, সোমপ্রকাশের মতে, আমাদের অভাব বেড়েছে,(৫৩) ভোগবাসনা অত্যন্ত প্রবল হয়েছে।(৫৪) অতএব, ইংরেজ শাসনে, জীবনযাত্রা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে। অথচ একান্নবর্তিতা, বাল্যবিবাহ, পিতামাতার শ্রাদ্ধ ও পুত্রকন্যার বিবাহে ব্যয়-বহুলতা, চিরবৈধব্য, জাতিভেদ ও জাত্যাভিমান—ইত্যাদির মত সমাজের পুরনো রীতিনীতি ও প্রথা, যা বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, এখনও প্রচলিত। অতএব 'যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থাগম হয়' তাতে বর্তমানে সংসার যাত্রায় বিশেষ সাহায্যবোধ হয় না।(৫৫) দেশে বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর ইংরেজশাসনে

বিদেশী পুঁজিবাদী অর্থনীতির অনুপ্রবেশের ফলে মর্মান্তিক বিপর্যয়ের চিত্রটি সোমপ্রকাশের স্বচ্ছ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে এইভাবে।

আর এক জায়গায় সোমপ্রকাশ লিখেছে দেশের সাম্প্রতিক অবস্থা অনুসারে দেখা যাচ্ছে বছর বছর সহস্র সহস্র লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করছেন বটে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হতে বেরিয়ে তাঁরা চারিদিকে অন্ধকার দেখেন।(৫৬) কারণ বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় আর যাই হোক 'কার্য্যক্ষম হওয়া যায় না।' নানা প্রকার শিল্প কৌশল, বিজ্ঞান প্রভৃতি অর্থকরী ও কার্যকরী শিক্ষা, এদেশে নেই বললে অত্যুক্তি হয় না।(৫৭) এই শিক্ষা শিক্ষিতদের মধ্যে চাকুরীপ্রিয়তা বৃদ্ধি করা ছাড়া অন্য কোন স্বাধীন চিন্তাশীল ও শ্রমের কর্মে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করে না।(৫৮) এদেশীয়দের শিল্পবাণিজ্য শিক্ষা-দানের প্রসঙ্গ হলেই একদিকে তাদের কুসংস্কার, অযোগ্যতা ইত্যাদির দোহাই দেওয়া হয়,(৫৯) আর একদিকে সরকারী নীতির দ্বারা দেশীয় মূলধন বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করা হয়।(৬০) সোমপ্রকাশ লক্ষ্য করেছে, এত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও শিক্ষিত সমাজের যদি কেউ শিল্পকাজে হস্তক্ষেপ করেন অমনি দেখা যাবে বিলেতের ধনাঢ্য এবং সর্বশক্তিমান বণিকের দল রাজার সহায়তায় তাদের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়ে সর্বনাশ করেন।(৬১) এই পরিস্থিতির দরুণ এদেশীয়দের শিল্পবাণিজ্যের প্রতি আগ্রহ উৎসাহিত হতে পারছে না। অথচ, সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে একমাত্র শিল্পবাণিজ্য দ্বারাই ব্যাপক জনগণের জীবিকার সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব। তার মতে 'ভারতবর্ষে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও স্বল্প মূল্যে শ্রমের অভাব নাই।' দেশে বিনিয়োগোপযোগী অর্থের অপ্রতুলতা অস্বীকার করার নয় বটে, তবু এও সত্য যে কিছু অর্থ আছে, সে মনে করে, তাকে বুদ্ধি করে বিনিয়োগ করতে পারলে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করা যায়। কিন্তু অপরাপর প্রবল ও ধনবান জাতি সকলের, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের মত বাণিজ্যবিষয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেশের প্রতিযোগিতার মুখে ভারতবর্ষের মত নির্ধন ও দুর্বল দেশের শিল্প সরকারী সংরক্ষণ নীতির সহায়তা ছাড়া বাঁচতে পারে না। কিন্তু, সে দেখছে, দেশের সরকার সেই নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী নয়।(৬২) উপরন্তু দেখা যাচ্ছে বর্তমানে ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকদের স্বার্থসিদ্ধি করতে ভারতবাসীর 'অজাতদন্ত নিঃসহায় শিশুতুল্য' শিল্প প্রচেষ্টাকে সরকার অঙ্কুরে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছেন।(৬৩) বিদেশী শাসনের নাগপাশে আবদ্ধ অসহায় ভারতবাসী

চোখের সামনে দেখছে অপর দেশের লোকে এদেশে এসে প্রভূত উপার্জন করে নিয়ে যায়, অথচ নিজেদের দেশজাত দ্রব্যে তারা নিজেরা লাভবান হতে পারে না। বিদেশী শাসনে ভারতবাসীর গভীর মর্মবেদনার মূল কারণটি সোমপ্রকাশের কাছে খুবই স্পষ্ট। সে লিখেছে, (এখন এদেশে) 'ফলতঃ কি বাণিজ্য, কি শিল্প, কি অন্য বিষয় যাহাতে অধিক লাভের সম্ভাবনা আছে, তৎসমুদায়ই ইউরোপীয়েরা হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। কেবল চাকুরী করাই আমাদের লেখাপড়া শিক্ষার মহৎ লক্ষ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ উপাধিধারী অবধি নিকৃষ্টতর শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সকলেরই চাকুরী দ্বারা জীবিকা উপার্জন করা উদ্দেশ্য।'(৬০) এই প্রসঙ্গে ইংরেজ শাসনকালের বিপরীতে ইংরেজশাসনপূর্ব কালের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে সোমপ্রকাশ লিখেছে 'তখন ভারতের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক পল্লী অধিক কি প্রত্যেক স্বাধীনচেতা মনুষ্যহৃদয় বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী এই হৃদয়োত্তেজক বীজমন্ত্রের ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন না হইলে কেহই প্রাণান্তেও পরের সেবায় দেহ নিযুক্ত করিত না। তখন বাণিজ্যের নিম্নে কৃষি ব্যবসায় ছিল · কালচক্রের কুটিল আবর্তনে সেই ভারত প্রতিধ্বনিত বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী 'এই স্বাধীনতা ও হৃদয়োত্তেজক বীজমন্ত্র ভারতবাসীর অদৃষ্ট দোষে কালচক্রের নিম্নভাগে পড়িয়া গিয়াছে। এখন তৎপরিবর্তে হা অন্ন হা ভিক্ষাবৃত্তি!' এই হৃদয়বিদারক চীৎকার শব্দে কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্যন্ত ভারতভূমি স্থানে স্থানে পরিপূরিত হইতেছে।…'চাকুরিই আমাদিগের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে।'(৬৫) এই তুলনার মধ্যে যে ঐতিহাসিক সারমর্মটি আছে কে তা অস্বীকার করবে!

কাজেই, সোমপ্রকাশ দেখছে ইংরেজ শাসনে দেশে চাকরী ক্ষেত্রে 'কর্ম অপেক্ষা প্রার্থী অধিক' হওয়ায়, 'দশ পনর টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য দশ হাজার প্রার্থী পাওয়া যাইতেছে।'(৬৬) ইংরেজ শাসনে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ক্রমবর্ধমান তীব্র বেকার সমস্যা লক্ষ্য করে, 'বঙ্গদেশ ইংরাজ গভর্ণমেন্টের অধীনে উন্নতির সোপানে অধিরূঢ় হইয়াছে বলিয়া' যাঁরা 'প্রায়ই গর্ব করিয়া থাকেন' তাদের প্রতি কটাক্ষ করে বিদ্রূপের সুরে সোমপ্রকাশ মন্তব্য করেছে 'ভদ্র সন্তানেরা ঝেঁটা লাথি খাইয়াও (আক্ষরিক অর্থেই) ১৫ টাকার চাকুরীর নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছেন,' সে কেমন উন্নতি!(৬৭) সোমপ্রকাশের নিজের অভিজ্ঞতা হল প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রার্থী হওয়ায় চাকরীর বাজার

সস্তা হয়েছে। শ্রম-বিক্রয়ে এখন যে অর্থ মেলে তাতে দারিদ্র কিছুমাত্র অন্তর্হিত হয় না।(৬৮) ইংরেজ শাসনে দ্রব্যসামগ্রী যেমন অতিশয় মহার্ঘ হয়ে উঠেছে, তেমনি মানুষের ভোগবাসনা অত্যন্ত প্রবল হয়েছে। অতএব ইংরেজ শাসনে, তার মতে, জীবনযাত্রা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়েছে।(৬৯) কাজেই দেখা যাচ্ছে, গুটিকত টাকার জন্যে তারা (ভদ্রসন্তানেরা) মুখে রক্ত তুলে পরিশ্রম করে।(৭০) অথচ সেই আয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ হওয়া দুর্ঘট। তাদের সামাজিক অবস্থা যেমন তাতে নিত্য সাংসারিক ব্যয় ছাড়া, নৈমিত্তিক অনেক ব্যয় করতে হয়।(৭১) অতএব, সোমপ্রকাশ মনে করে, ইংরেজ শাসনে দেশের প্রধান কষ্ট দারিদ্র।(৭২) এবিষয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে সোমপ্রকাশ লিখেছে সমাজের মধ্যে যাঁরা উচ্চ শ্রেণী বলে গণ্য অর্থাৎ অনেক অর্থ উপার্জন করেন, তাঁবাও বিশেষ সঞ্চয় করে যেতে পারছেন না। নিম্ন শ্রেণীর লোকের কথা বলা বাহুল্য মাত্র। তারা ঋণদায়ে বিব্রত ও অন্নচিন্তায় জর্জর।(৭৩) শ্রমজীবী এবং সামান্য চাকুরে লোকেদের ত কথাই নেই, হঠাৎ একটা বিপদ হলে ঘর থেকে এক পয়সা বের করার সঙ্গতি নেই।(৭৪)

প্রসঙ্গত সোমপ্রকাশ আরও লিখেছে 'শ্রমবিক্রয়ের উৎকৃষ্টাংশ রাজপুরুষ ও রাজানুগৃহীদের একচেটে'(৭৫) হয়ে রয়েছে। এবিষয়ে তার বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে সে লিখেছে 'মুখে একথা বলা হয়, ইংলণ্ডেশ্বরীর এই ঘোষণাও আছে, জাতিবর্ণভেদ না করে ভারতবর্ষের সমুদয় রাজকার্য সম্পন্ন করা হইবে।' কিন্তু ইউরোপীয়দের প্রতি পক্ষপাত প্রতি পদে পদে লক্ষ্য করা যায়। সেইজন্যেই লাভকর উচ্চ পদগুলি ইউরোপীয়দের জন্য রক্ষিত, প্রসাদী যা কিছু এদেশীয়েরা পান।(৭৬) এই প্রসঙ্গে ইংরেজ শাসনকালের সঙ্গে তুলনায় মুসলমান আমলের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সোমপ্রকাশ লিখেছে 'মুসলমান আধিপত্যকালে এদেশীয়েরা সকল কার্য্যেই নিয়োজিত হইতেন···মুসলমান সম্রাটগণ দেশীয়দিগের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। কিন্তু বিদেশীয় রাজা বলিয়া ইংরাজের রাজত্বে প্রথম অবধিই বিপরীত ব্যবহার দেখিতেছি।' 'স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয়ের প্রতিপালন ইংরেজ গভর্ণমেন্টের যে মুখ্য উদ্দেশ্য' তা এদেশে, সোমপ্রকাশের মতে, ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত অবধি লক্ষ্য করা গেছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যখন এদেশে প্রথম রাজত্বলাভ হয়, তখনও তাঁরা স্বদেশীয়-

দের সুবিধা খুঁজতেন। উচ্চ পদগুলি তাঁদেরই দিতেন…এদেশীয়দের সামান্য বেতনে নিযুক্ত করতেন।(৭৭) তারপর শাসনভার যখন ইংলণ্ডেশ্বরীর হাতে গেল তখন তিনি, দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিতে সোমপ্রকাশ লিখেছে, 'প্রজাদিগকে স্তোকবাক্যে কতই পুলকিত' করলেন, 'চাঁদটি আনিয়া হাতে দিব' এই রকম অঙ্গীকার করে বসলেন, কিন্তু তার বক্তব্য, 'তবু প্রজার দুঃখ দূর হইল না।'(৭৮) বরং উত্তরোত্তর মন্দ হতে লাগল।(৭৯) তার কারণ, সোমপ্রকাশ মনে করে, 'ব্রিটিশ বংশীয়েরা প্রথমে এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তন্মূলক রাজ্যলাভ হয়। সেই বণিগবৃত্তি আজিও ভুলিতে পারেন নাই। রাজকার্য্যেও তাহা খাটাইতেছেন।'(৮০) লক্ষ্য করার বিষয়, ভারতে ইংরেজ শাসনের মূল চরিত্র অনুধাবনে সোমপ্রকাশের আদৌ ভুল হয়নি।

যাই হোক, সোমপ্রকাশ দেখছে রাজপুরুষ ও রাজানুগৃহীতদের সঞ্চিত ধনের ও পেন্সনের অধিকাংশই বিদেশে চলে যায় ও সেখানে ব্যয়িত হয়। বিদেশীয়দের যোগ্যতা বা শ্রম যে মূল্যে দেশীয় ধন দ্বারা ক্রয় করা হয় তার চেয়ে অল্প মূল্যে দেশীয় যোগ্যতা ও শ্রম পাওয়া যায়।(৮১) কিন্তু বিদেশী সরকারের স্বজনপোষণ নীতির দরুণ সেটি সম্ভব হচ্ছে না।(৮২) বরং যত দিন যাচ্ছে, এদেশীয়েরা আপন স্বত্ব যত সুন্দর করে বুঝতে শিখছেন,(৮৩) উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন হয়ে ইংরেজদের প্রতিযোগী হয়ে উঠছেন,(৮৪) ততই 'ভারতবর্ষ ইংরাজজাতির হস্ত পরিভ্রষ্ট হইয়া যাইবে'(৮৫) এই আতঙ্কে এবং স্বদেশীয় ও অনুগতদের 'অন্নে বালি পড়ার'(৮৬) আশঙ্কায় বিজাতীয় ঘৃণা ও ঈর্ষাবশতঃ প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার মত বিভেদ নীতির কৌশলে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের চাকরীর সুযোগ সংকুচিত করা হচ্ছে,(৮৭) যাতে তারা কোনমতেই 'মস্তকোত্তলন' করতে না পারে ক্রমাগত সেই চেষ্টা চলছে।(৮৮) সোমপ্রকাশ মনে করে শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা এখন রাজার কোপদৃষ্টিতে পড়েছেন।(৮৯) তাঁদের বিরুদ্ধে বিদেশীয়দের প্রধান অভিযোগ 'তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য বিষয় লাভের নিমিত্ত যত্ন করিতে তাঁহাদের সাহস জন্মিয়াছে।' এই অভিযোগ সম্পর্কে সোমপ্রকাশ মন্তব্য করেছে 'এখানেই ভারতবাসীদিগের যত অপরাধ।'(৯০) বস্তুতপক্ষে তাঁরাও (ভারতীয়রাও) অনুগত ও নিকৃষ্ট হয়ে আর চলতে রাজী নয়।(৯১)

এদিকে দেখা যাবে বিপুল আয় থাকতেও গভর্ণমেন্টের আর অর্থের স্বচ্ছল হয় না, বছর বছর তাকে প্রচুর ঋণ করতে হয়। কারণ, সোমপ্রকাশের

অভিমত, যেন তেন প্রকারেণ ইংলণ্ডের স্বার্থসাধন গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য। তার সঙ্গে আছে গবর্ণমেন্টের অসংগত অপব্যয়। গবর্ণমেন্ট সর্বদা দেশ ভ্রমণ, দরবার ও ভোজ দিতে বিশেষ অনুরক্ত। অত্যধিক বেতন দিয়ে ইংরেজ কর্মচারী পোষা হয় অল্প ব্যয়ে দেশীয়দের দ্বারা অধিক কার্য সম্পাদনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও। সোমপ্রকাশের কাছে আর একটি ভয়ঙ্কর অপব্যয়—গরীব ভারতবাসীর শোণিত শুষ্ক করে সাহেবরা জ্ঞাতিকুটুম্ব নিয়ে প্রতি বছর মহা সমারোহে শৈলবিহারে যান। কোম্পানীর আমলেব চেয়ে বর্তমানে অপব্যয় আরও বেড়েছে। তার কারণ. সোমপ্রকাশ মনে করে, ভারতের শাসনভার ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্টের অধীনে আসায় গবর্ণমেন্টের স্বার্থ সাধন স্পৃহা দমন না হযে বরং দিন দিন আরও বলবতী হয়েছে। সুতবাং প্রজাব কাঁধে চাপে অসংগত ট্যাক্সভার।(৯২) সোমপ্রকাশ লিখেছে বর্তমানে ভারত শরীবে কতদিকে যে জোঁক বসেছে তাব ঠিক নেই।(৯৩) এদিকে প্লাবন, পীড়া ও দুর্ভিক্ষে দেশ উৎসন্ন হল, সর্বত্র লোকসংখ্যা কমছে তথাপি গবর্ণমেন্ট ক্ষান্ত নন্।(৯৪) সোমপ্রকাশ দেখছে মফঃস্বলের অবস্থা কর্তারা যত তন্ন তন্ন করে জ্ঞাত হচ্ছেন প্রজাদের উপর ততই চাপছে করভার।(৯৫) এদিকে ভারতবর্ষ দিন দিন ঋণজালে জড়িয়ে পড়ছে।(৯৬) এই অবস্থার বিরুদ্ধে ভারতবাসী তীব্র প্রতিবাদ জানালেও কোন ফল হয় না। তার কারণ, সোমপ্রকাশ মনে করে, ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষ শাসন করেন বটে কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে তাঁহারা ইংলণ্ডের যাবতীয় বণিক সম্প্রদায়ের সাক্ষাৎ প্রতিনিধিস্বরূপ। নামে না হউন, কার্য্যতঃ তাহাই বটে।…কাজেই…এদেশেব ব্যবসায়ের কণ্ঠরোধ করিয়া বিলাতের বাণিজ্য বৃক্ষের মূলে জলাভিষেক কবা তাঁহাদের কর্তব্যপালন।'(৯৭) তাই দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষে যেই কাপড়ের কল হতে আরম্ভ করেছে, অমনি ইংলণ্ডের বণিকদের ভারতীয়দের সস্তায় কাপড় পরাবার উপচিকীর্ষাবৃত্তি জেগে উঠেছে। আর ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট মুখে 'ভারতবাসীর হিতার্থে ভারতশাসন তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য' বলে দাবী করেন, কিন্তু বস্ত্রের শুল্ক রহিত করলে ভারতবর্ষের রাজস্বের ক্ষতি হবে এবং সেই ক্ষতি পূরণ করতে দরিদ্র ভারতবাসীর উপর নতুন করে কর বসাতে হবে—এটি জেনেও ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকদের অনুরোধে ভারত সরকার বস্ত্রের উপর থেকে আমদানী শুল্ক রহিত করতে চলেছেন।(৯৮) ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকারের কথায় ও কাজে এই অসংগতির মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে

সোমপ্রকাশ লিখেছে, আসল কথা, যত দিন যাচ্ছে, (ইংলণ্ড) আমেরিকানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না। কেবল আমেরিকাই নয়, ফ্রান্স, বেলজিয়ামও ইংলণ্ডের বাণিজ্যের পথে কাঁটা হয়ে উঠেছে তাই সোমপ্রকাশের আশঙ্কা, 'ব্রিটিশ সিংহ আমেরিকা ইউরোপের অন্য অন্য প্রদেশবাসীদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাভূত হইয়া যদি ক্ষুধাকাতর হন, ভারতেরই ঘাড়ের রক্ত পান করিয়া ক্ষুধার শান্তি করিবেন সন্দেহ নাই।'(৯৯)

সোমপ্রকাশ এই প্রসঙ্গে আরও লিখেছে সাম্প্রতিককালে ইংলণ্ডের স্বার্থ সাধন স্পৃহা এতদূর বেড়েছে যে দেখা যাচ্ছে আবিসিনিয়ার যুদ্ধের মত যে সব কাজ ও ঘটনার সঙ্গে ভারতবর্ষের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই অথবা নামমাত্র সম্পর্ক আছে, সে সকল বিষয়েও কেবল এক ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্যই ভারতবর্ষীয় ধনাগার হতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।(১০০) ইংরেজ শাসনের প্রথম দিন থেকেই দেখা যাচ্ছে ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের নাম করে এখান থেকে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা ইংলণ্ডের সুবিধার জন্যে নিচ্ছেন।(১০১) যখন ভারতবর্ষ কোম্পানীর অধিকারে ছিল তখনও, দেখা গেছে, 'কি ছোট কি বড় সকল কর্মচারীরই · অসংগত অর্থ উপার্জনেব স্পৃহা অতিশয় বলবতী ছিল। সকলেরই লুঠের চেষ্টা, সকলেই কিছু দিন ভারতবর্ষে থাকিয়া কুবের তুল্য ধনী হইয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান কবিত। ভারতবর্ষেব ধন এইরূপে বিদেশে নীত হয় এবং ভারতবর্ষ ক্রমে দরিদ্র হইয়া যায়।'(১০২) কিন্তু কোম্পানীর হাত থেকে শাসনভার ইংলণ্ডেশ্বরীর হাতে গেলেও, সোমপ্রকাশ দেখছে, ভারতবর্ষের অর্থ এইভাবে ইংলণ্ডে চলে যাওয়া বন্ধ ত হয়নি, বরং যত দিন যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষের অর্থ 'চঞ্চলগামিনী তরঙ্গিণীর প্রবাহেব ন্যায় ভারতভাণ্ডাব শূন্য করিয়া অগাধ জলধিজলে বিলীন হইতেছে।' সোমপ্রকাশ মন্তব্য করেছে 'এদেশের রাজা ইংবাজ, এই বিপুল অর্থ ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে লইয়া যাইতেছেন।'(১০৩)

অথচ, এই বিপুল আয় থাকা সত্ত্বেও, সোমপ্রকাশ দেখছে, এশীয়দের কল্যাণমূলক কাজে গবর্ণমেণ্টের টাকা থাকে না। আসলে, মুখে তাঁরা 'ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সৌহাদ্র্য বৃদ্ধিব' জন্যে যত কথাই বলুন না কেন, ভারতবাসীর আর বুঝতে বাকী নেই যে, বস্তুতপক্ষে 'ইংরাজরা ইংলণ্ডের জন্য ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন।'(১০৪) কাজেই তাকে বলতেই হচ্ছে ইংলণ্ড যে বলে ভারতবাসীদিগের নিমিত্ত ভারতশাসন 'এটি শুনতে অতি মধুর,

(রাজপুরুষগণের) অনেকে এ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া নিঃস্বার্থ উদারচিত্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ভারতবাসীরাও এটি শুনিলে মুগ্ধ হইয়া যান,' কিন্তু এই প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, প্রথমত, 'বিদেশী রাজার রাজত্বে এতদনুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া ভারতবাসীদিগকে চরিতার্থ করিতেছেন কিনা ?' দ্বিতীয়ত 'বিদেশী শাসকের এই প্রকার মধুর বাক্যে যাঁহারা সরল বিশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া যান' সোমপ্রকাশ তাঁদের কাছে প্রশ্ন রেখেছে 'ইংরাজেরা এদেশটি জয় করিয়াছেন, এদেশের সমুদায় রাজকার্ইগুলি এদেশীয়দিগকে দিবেন, এদেশীয়েরা এদেশের সমুদয় অর্থ উদরসাৎ করিবেন, তবে কি ইংরাজরা এদেশে তীর্থ করিতে আসিয়াছেন ?· ·এরূপ নিঃস্বার্থ লোক কি ভূমণ্ডলে আছে ?'(১০৫) এদের সম্পর্কে গভীর স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ সোমপ্রকাশের মস্ত আক্ষেপ—এঁরা এই মূল সত্যটাই জানেন না যে বিদেশী রাজা আর প্রজার স্বার্থ অভিন্ন নয়।(১০৬)

ইংরেজ শাসনে এদেশে বিদেশী সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতি নিয়মের ব্যাপক ফলাফল এবং ইওরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে উদ্ভূত পরিস্থিতির সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে সোমপ্রকাশ যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তা হল, এদেশে বর্তমানে যে পরিমাণ ধনোৎপন্ন হয় তাতে দেশীয়দেরই কোনমতে জীবিকার সংকুলান হয় না, তার উপর আবার বিদেশীয়েরা ও বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সেই ক্লেশার্জিত অনটন ধনের অংশ দ্বারা পরিতুষ্ট হন।(১০৭) কাজেই ভারতবাসীর দারিদ্র দিন দিন বেড়েই চলেছে।(১০৮) কাজেই সোমপ্রকাশ মনে করে (ভারতবাসীর স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে) ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের উত্তরোত্তর মন্দ হচ্ছে।(১০৯) অথচ 'চতুর্দিকে উন্নতি উন্নতি শব্দে কর্ণকুহর বধির' হচ্ছে। তাই বিস্মিত সোমপ্রকাশের জিজ্ঞাস্য বাস্তবিক দেশের 'সারবতী উন্নতি কোথায় ?'(১১০) দেশের সারবতী উন্নতি বলতে যথার্থ দেশ-হিতৈষী সোমপ্রকাশ নিজে যা বোঝে—শিক্ষার উন্নতি, কৃষিবাণিজ্যের উন্নতি, রাজনীতির উন্নতি, স্ত্রীজাতির উন্নতি, সামান্য লোকদিগের উন্নতি—তার কোনটার সূচনাই হয় নি। প্রসঙ্গত সে মন্তব্য করেছে হবে কোথা থেকে ! কারণ লোকে দেশহিতকর কাজে উৎসাহিত হবে কি, বর্তমানে অন্নচিন্তায় তাদের উদরের অন্ন তণ্ডুলত্ব প্রাপ্ত হচ্ছে।(১১১) বস্তুতপক্ষে, বর্তমানে অনাহারে বা অপর্যাপ্ত আহারে অনিদ্রায় ও নানা প্রকার দুর্ভাবনায় ভারত-বাসীর শরীর দুর্বল নিস্তেজ নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে, মানসিক বৃত্তিসকল দিন

দিন লুপ্ত হচ্ছে।(১১২) ইংরেজ শাসনে দেশের প্রধান কষ্ট দারিদ্র্য। (১১৩) কাজেই ইংরেজ শাসনে দিন দিন দেশের লোকের অসন্তোষ এবং হতাশা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেকথা কি বৃদ্ধ কি যুবা সকলেই স্বীকার করেন। অথচ এরপর যাঁরা গভর্ণমেন্টের মত স্বপ্ন দেখেন ভারতবর্ষের ধনসম্পদ ক্রমে বৃদ্ধি হচ্ছে, (১১৪) তাঁদের সেই দেখায় যে কতটা সত্য আছে, সোমপ্রকাশ মন্তব্য করেছে, এক দুর্ভিক্ষেই তা প্রমাণ করে দিচ্ছে। বর্তমানে, এক বছর যদি অনাবৃষ্টি হয়ে দুর্ভিক্ষ হয় অমনি ভারতে হাহাকার শব্দ ওঠে। সোমপ্রকাশ তাই প্রশ্ন করেছে, এই কি ভারতবর্ষের স্বচ্ছলতার লক্ষণ? (১১৫) এবিষয়ে তার নিজের অভিমত 'পূর্বকালে অন্নকষ্ট এবং দুর্ভিক্ষ এককালে ছিল না, এমন নহে।...কিন্তু এপ্রকার ঘরে ঘরে ছিল না;, দুর্ভিক্ষ ছিল, কিন্তু এমন বৎসর বৎসর ঘটিত না...রাজনীতিজ্ঞ রাজার গুণে দুর্ভিক্ষ তদ্রূপ এখন নৈসর্গিক নিয়মগত হইয়া পড়িয়াছে, বৎসর ফিরিলে কোন না কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ নিশ্চিত আসিবে।'(১১৬) অতএব সোমপ্রকাশের বক্তব্য অন্ন বস্ত্রের কষ্ট যতদূর হতে পারে ইংরেজ শাসনে তা হয়েছে। (১১৭) ফলে, সে দেখছে, 'যতই দিন যাইতেছে কি ভদ্র কি অভদ্র সকল শ্রেণীর লোকেই এক প্রকার নৈরাশ্যে অভিভূত হইতেছে।...সাধারণ লোকে গভর্ণমেন্টকেই এই সকল অনর্থের মূলীভূত কারণ মনে করে।' আর এই জন্যেই, সে মনে করে, 'প্রজাদের রাজভক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতেছে।'(১১৮) তাই দেখা যাচ্ছে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে 'ইংরেজ রাজ্য রামরাজ্য, এই ভ্রম আর অনেকের মনে নাই।' এই প্রসঙ্গে সে মন্তব্য করেছে 'বলিবেন যে উচ্চ শিক্ষা দ্বারা লোকের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তজ্জন্যই লোকে এমন কথা বলে, তাহা নয়। আমরা নিরক্ষর লোকের মুখেও বর্তমান রাজার শাসন প্রণালীকে নিন্দা করিতে শুনিতে পাই।' (১১৯) ইংরেজ শাসনের প্রতি দেশের লোকের মনোভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সোমপ্রকাশ আর এক জায়গায় মন্তব্য করেছে 'এতদিন ইংরাজেরা অজ্ঞ লোকেদের চক্ষে দেবতুল্য পবিত্র পুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের ন্যায়পরতা বিচার প্রজা পালন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য সকলের চক্ষে পবিত্র বোধ হইত। সুশিক্ষিত লোকেরা আধুনিক ইংরাজদের চিত্ত প্রবৃত্তি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছেন।...সত্যকে অধিকক্ষণ গোপন রাখা যায় না; অজ্ঞ লোকেরাও এখন তাদের মনের স্বার্থপরতা ভাব বুঝিতেছে...পূর্বে যে রাজাকে সকলে শুভ বলিয়া সম্মান করিত, আজ তাঁহাকেই চক্রী ও শোষক

রাজা বলিতে সন্দিগ্ধ হইতেছে না।'(১২০) এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ সোমপ্রকাশের মতে 'সুখ দুঃখের দ্বারাই রাজার গুণাগুণ বিবেচিত হয়। অতএব সহজ বুদ্ধির নিকট প্রকৃতাবস্থা অধিককাল গোপন থাকে না।'(১২১) আর দেশের মানুষের সেই সুখ দুঃখের পরিপ্রেক্ষিতে এদেশে ইংরেজ শাসনের চূড়ান্ত মূল্যায়নে সোমপ্রকাশের সার কথাটুকু হল 'লোকের সুখের মধ্যে এই দেখিতে পাই, আমরা দস্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি…এতদ্ব্যতীত আমাদের আর কি সুখ আছে…? নবাবের রাজত্বকালে দস্যুভয় ছিল বটে, কিন্তু তৎকালেই এদেশে ধনবান ব্যক্তির সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।…ইংরাজ শাসনকালে কয়জন জগৎ শেঠ উৎপন্ন হইয়াছে? কত ঘর বর্ধমান ও নবদ্বীপ জন্ম লইয়াছে? এই বিশাল ভারতবর্ষ অনুসন্ধান করিলে একটিও মিলিবে না।…পূর্বে দস্যুভয় ছিল বটে, কিন্তু এত কঠিন পরাধীনতা শৃঙ্খল কাহারও পদে আবদ্ধ ছিল না। লোকে অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা সুখ ভোগ করিত। প্রজাদিগের এত দৈন্য দশাও ছিল না, অন্নবস্ত্রের সুখ, জীবনের স্বচ্ছন্দতা প্রচুর রূপে সকলেই ভোগ করিতে পাইত।… (কিন্তু ইংরেজ শাসনে) ভারতবর্ষ নিঃস্বত্ব হইয়া পড়িয়াছে।'(১২২) ভাবতে ইংরেজ শাসনের ফলাফল সম্পর্কে সোমপ্রকাশের এই মূল্যায়নে যে ঐতিহাসিক সত্যটি লুকিয়ে আছে কে তা অস্বীকার করবে?

দেশের মুক্তির পথ

স্বদেশ হিতৈষণায় সতত চিন্তাশীল সোমপ্রকাশের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জেগেছে ইংরেজ শাসনে এই শোচনীয় দুরবস্থা থেকে দেশের পরিত্রাণের উপায় কি? এই সর্বনাশা পরিণতি হতে দেশের মুক্তি আসবে কোন্ পথে? এই প্রশ্নের আলোচনা প্রসঙ্গে এক জায়গায় সে লিখেছে, অনেকেই স্বাধীনতার কথা বলেন বটে, কিন্তু তাঁদের জানা নেই কিভাবে সেই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে। (১২৩) গভর্ণমেন্টের অন্যায় অযৌক্তিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশবাসী তীব্র প্রতিবাদ জানান সত্ত্বেও বিদেশী সরকার তাতে কর্ণপাত করে না। (১২৪) কিন্তু দেশবাসীর প্রতি বিদেশী সরকারের এই উপেক্ষা সম্ভব হচ্ছে কিভাবে? সেই উপেক্ষার কারণ হল এদেশীয়দের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, জীবনের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী হতে নিতান্ত তুচ্ছ বস্তুটির জন্যে তাদের পরমুখাপেক্ষিতা। দেশের উন্নতি সাধনে কি কি নিতান্ত আবশ্যক সেবিষয়ে

আলোচনা করতে গিয়ে সোমপ্রকাশ লিখেছে 'ইউরোপীয়রা এদেশে কৃষি কার্য করিয়া এদেশীয় কৃষকদিগকে উৎকৃষ্ট কৃষিকার্য্য প্রণালী শিক্ষা দেন ইহা মঙ্গলের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু...আমরা যদি কৃষিকার্য্যের উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষা করিয়া দেশের অধিকাংশ ভূমি আপনারা কর্ষণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের যথার্থ্য সৌভাগ্য লাভ হয়। নতুবা ইউরোপীয়-দিগের চা, নীল অথবা তুলা ক্ষেত্রে কেবল মজুরী করিলে কৃষকদিগের এখনও যে দশা, তখনও সেই দশা থাকিবে। অপর, আমরা যদি আপনারা তুলা প্রভৃতির উৎপাদন বিষয়ে সমর্থ হই আমাদিগের উপরই ইংলণ্ডের নির্ভর করিতে হইবে সন্দেহ নাই। এরূপ হইলে কি আমাদিগের যুক্তিসংগত প্রার্থনা সকল এখনকার ন্যায় তখন অগ্রাহ্য হইবে? তখন কি আর অসার ও অপদার্থ বোধ করিয়া ইউরোপীয়েরা আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারিবেন? ...আমরা যদি আপনারাই ভূমির অধিকারী ও কৃষক এ উভয়ের কার্য্য নির্বাহ করি, ইংলণ্ড আমাদিগেব অধীনস্থ হইবেন; আর যদি নীলকর প্রভৃতির মজুরী কার্য্যে দেহক্ষয় করি, আমাদিগকে প্রত্যেক স্বার্থপর ইউরোপীয়ের দাস হইতে হইবে।'(১২৫) সোমপ্রকাশের এই বক্তব্য গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতার মর্ম যে বস্তুতপক্ষে অনেকখানিই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, (১২৬) একথা সে সরাসরি না বললেও, প্রথম থেকেই সে বোধের উপস্থিতি তার অগ্রসর চেতনায় যেমনই স্পষ্ট তেমনই বলিষ্ঠ, আর সেই অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের উপায় আলোচনা প্রসঙ্গে সে যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছে। ইংরেজ শাসনে এদেশের কৃষিশিল্প সমন্বিত পুরনো অর্থনৈতিক কাঠামোটি ভেঙ্গে পড়ায় দেশে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে তার জন্যে বারে বারে আক্ষেপ জানালেও, দেশেব আর্থিক পুনরুজ্জীবনের, তার দৃষ্টিকোণ থেকে, একমাত্র সম্ভাব্য পথ হল উন্নততর উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ যার বিশেষ অঙ্গ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্প। কৃষিশিল্পের ক্ষেত্রে সর্বত্রই সে উন্নততর উৎপাদন সম্পর্কের স্বপক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেছে বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে, সমকালীন ইউরোপ আমেরিকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সহযোগে।(১২৭)

কিন্তু সোমপ্রকাশের এই চিন্তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যময় দিকটি হল স্বাধীন বিকাশের স্বপক্ষে তার বলিষ্ঠ অভিমত। ইংরেজ শাসনে এদেশে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগে বিদেশীর নিয়ন্ত্রণাধীনে গড়ে ওঠা কৃষিশিল্প

ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি কিভাবে দেশীয় স্বার্থকে ক্রমাগত নিদারুণ বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছে (১১৮) সে বিষয়ে দেশবাসীকে সজাগ করতে সোমপ্রকাশ অজস্র প্রবন্ধে নানা প্রসঙ্গে বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছে। স্বাধীন বিকাশ ব্যতীত দেশের যথার্থ কল্যাণ যে কোনমতেই সাধিত হতে পারে না, বস্তুতঃ এই চেতনাই তার সমগ্র চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। তাই দেখা যায়, দেশের সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের সেই অংশটি, যাঁরা মনে করতেন ইংরেজ শাসনের দয়ায় আর তাদেরই ছত্রছায়ায়, দেশে আধুনিক ইওরোপের অনুরূপ উন্নততর সভ্যতার বিস্তার ঘটবে, তাঁদের সেই অবাস্তব ধারণার সমালোচনা করে সোমপ্রকাশ লিখেছে: 'অন্যে কি চেষ্টা পাইয়া আমাদিগের শ্রেয় সাধন করিয়া দিবেন? আমরা কি অন্যের মুখ প্রতীক্ষা করিয়া রহিব?' তার বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত অবিচল প্রত্যয় সহকারে সে নিজেই উত্তর দিয়েছে, 'কখনই না।' কারণ তার মতে 'সে মঙ্গল বিশুদ্ধ ও স্থিরতর নহে।' অতএব, তার সুস্পষ্ট অভিমত 'আপনাদিগের মঙ্গল আপনারাই চেষ্টা করিয়া লইতে হইবে।' তার এই সুচিন্তিত অভিমতটি পরিস্ফুট করতে সে আরও লিখেছে 'আমরা যে জাতির অধিকারে বাস করিতেছি, তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক সাহায্য লাভ হইতে পারে সন্দেহ নাই। তাঁহারা আমাদিগকে পথপ্রদর্শন করিতে পারেন,...কিন্তু যাবতীয় কল্যাণ-সাধন করিতে পারেন না।' অতএব তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 'সমুদায় দেশের উন্নতি সাধন বিদেশীয়দিগের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নয়।'(১২৯) কারণ সে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে 'আপনার ক্ষমতা, আপনার বাহুবল, আপনার যত্ন ব্যতিরেকে কখন আপনার মঙ্গল হয় না।' এই জন্যেই সে তার 'স্বদেশীয়দিগকে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিয়া স্ব সুখ বৃদ্ধির পরামর্শ' (১৩০) দেয়। প্রসঙ্গক্রমে ইংরেজ শাসনে এদেশে সমকালীন ইওরোপের উন্নততর সভ্যতার যেসব উপকরণ, যথা রেলওয়ে, যন্ত্রশিল্প ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটেছে এদেশের প্রকৃত উন্নতিতে তাদের ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে সোমপ্রকাশ মন্তব্য করেছে 'ইঁহারা (ভারতীয়েরা) যাবৎ সেইগুলি স্বয়ং ও স্বহস্তে সম্পাদন করিতে সমর্থ না হইবেন: তাবৎ এদেশের সম্যক শ্রীবৃদ্ধিলাভ সম্ভাবনা নাই।'(১৩১)

সোমপ্রকাশের এই দৃষ্টিভঙ্গী মনে করিয়ে দেয় 'ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল' এবং 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন' শীর্ষক প্রবন্ধ দুটিতে ভারতের

উন্নততর বিকাশ সম্পর্কে কার্ল মার্কসের মূল বক্তব্যটি : "উদ্দেশ্য তার যাই থাকুক না কেন ইংরেজ উন্নততর সভ্যতার নতুন উপকরণের সঙ্গে ভারতবাসীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ; কিন্তু ইংরেজ শাসনের দয়ায় বা ইংরেজ শাসনের ছত্রছায়ায় থেকে ঐ বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি দ্বারা ব্যাপক জনগণের মুক্তি অথবা সামাজিক অবস্থার বাস্তব সংশোধন ঘটবে না···শুধু উৎপাদনী শক্তির বিকাশের ওপরেই নয়, জনগণ কর্তৃক তাহাদের (এই বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলির) স্বত্ব গ্রহণের ওপরেও নির্ভরশীল।'(১৩২)

দেশে উন্নততর উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের জন্যে, সোমপ্রকাশের দৃষ্টি-কোণ থেকে, আবশ্যিক পূর্বশর্ত হল দেশে প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার সংস্কার : ভূমিতে কৃষকের স্থায়ী স্বত্ব প্রতিষ্ঠা। কারণ দেশের প্রচলিত অর্থনৈতিক কাঠামোয় যেখানে দেশের শতকরা ৯০ জন কৃষিজীবী, সেখানে কৃষির উন্নতি ও কৃষকের স্বচ্ছলতা ব্যতীত (১৩৩) দেশে শিল্প সংগঠনে প্রয়োজনীয় মূলধনের সংস্থান এবং উপযুক্ত জনশক্তি গড়ে ওঠা যে কোনমতেই সম্ভব নয় একথা সে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে অজস্র প্রবন্ধে নানা প্রসঙ্গে। কারণ ইংরেজ শাসনে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে সে দেখিয়ে দিয়েছে 'ভারতবর্ষ কৃষিজীবী দেশ···এক ভূমিই মনুষ্যের প্রাণ ধারণের উপায়।··কতকগুলি ধনাঢ্য লোক ভিন্ন অসংখ্য ব্যক্তি কেবল 'হাতে মুখে' কষ্টেসৃষ্টে বাঁচিয়া আছে। তাহাদের এক পয়সার সঙ্গতি নাই। কিছু মাত্র পুঁজি নাই। এক বৎসর ভূমি হইতে লাভ না হইলে দুদিন বসিয়া খাইবে, তেমন সম্ভাবনা নাই।'(১৩৪) সোমপ্রকাশ লক্ষ্য করেছে, দেশে প্রচলিত ভূমিব্যবস্থায় বিদেশী গবর্ণমেন্টের একমাত্র লক্ষ্য হল 'ভূমিতে কিছুমাত্র শস্যোৎপত্তি' হোক বা না হোক নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা,(১৩৫) আর জমিদারের লক্ষ্য হল কৃষকের কাছ থেকে কি করে কত বেশী আদায় করা যায়।(১৩৬) এই প্রসঙ্গে যে বিষয়টি সোমপ্রকাশকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছে তা হল যে ভূমি গবর্ণমেন্ট ও জমিদারের বিপুল আয়ের উৎস তার উৎকর্ষ সাধনে তাদের কারও কোন আগ্রহ নেই। (১৩৭) বস্তুত সে দেখছে 'জমিদার ও রাজার কেবল করের সহিত সম্বন্ধ।'(১৩৮) সোমপ্রকাশ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা জমিদারকে ভূস্বামী করা হয়েছে বটে, কিন্তু সকলেই স্বীকার করবেন যে 'ভূমির শ্রীবৃদ্ধি বাহুল্যরূপে কৃষকের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে'(১৩৯)

কাজেই তার অভিমত 'লাঙ্গল যাহাদিগকে ধরিতে হয় ভূমির উপর তাহাদের স্থায়ী স্বত্ব না হইলে ভূমির ··প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব।'(১৪০) ভূমিতে রায়তের অধিকার অস্থায়ী এবং অনিশ্চিত হওয়ায়, তার উৎকর্ষ সাধনে সে কোন আগ্রহ বোধ করে না।(১৪১) এবিষয়ে সোমপ্রকাশের অভিজ্ঞতা হল কৃষক তার ভূমির উৎকর্ষ সাধন করলে, জমিদার সেই ভূমির কর বৃদ্ধি করতে উৎসাহী হয়ে ওঠে।(১৪২) কাজেই দেখা যায়, কর বৃদ্ধি আর জমি হস্তান্তরের ভয়ে কৃষক ভূমির উৎকর্ষ সাধনে যত্ন করে না।(১৪৩) তাছাড়া ভূমির উৎকর্ষ সাধন করার সামর্থ্যও তাদের নেই। কারণ ভূমি সংক্রান্ত রাজস্ব প্রণালীর দোষে তারা অত্যন্ত দরিদ্র, কারণ সেই ব্যবস্থায় 'করভার বাহুল্যরূপে দরিদ্রের স্কন্ধেই পতিত হয়'।(১৪৪) গবর্ণমেন্ট যতই কর বসান না কেন, দেখা যাবে, তা জমিদারকে স্পর্শ করতে পারে না।(১৪৫) এ বিষয়ে সোমপ্রকাশের অভিজ্ঞতা (জমিদারদের) 'আপনাদিগের স্কন্ধে কোন নূতন ব্যয়দান পতিত হইলে (তিনি) প্রজার স্কন্ধে তাহা নিক্ষেপ করেন।' (১৪৬) এই ভাবে জমিদার সর্বদাই শোষণ করে কর নেন বলে, সোমপ্রকাশ মনে করে, কৃষকের অসঙ্গতি ও দুর্দশা পুরুষানুক্রমিক হয়ে উঠেছে। তাদের অধিকাংশই ঋণের দায়ে সারা জীবনের মত মহাজনের কাছে দাসত্ব-পাশে আবদ্ধ।(১৪৭) তারা অবর্ণনীয় দারিদ্রে আর ঘোর অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন।(১৪৮) অথচ, সোমপ্রকাশের দৃষ্টিতে, এই কৃষকদের নিয়েই দেশ। (১৪৯) কাজেই সে মনে করে 'কৃষিবিদ্যার উন্নতি সহকারে কৃষকদিগের উন্নতি না হইলে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।'(১৫০) জন্মাবধি সোমপ্রকাশ এই অভিমত পোষণ করে (১৫১)। দেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেই সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে দারিদ্র দুঃখ পীড়িত, নিরাশ্রয়, অজ্ঞান কৃষক সম্প্রদায়কে, দেশের ব্যাপক জনগণকে দারিদ্র হতে মুক্ত করে সঞ্চয়শালী করে তোলার, তাদের সমৃদ্ধি-সম্পন্ন, উন্নত চিরসুখী করে তোলার একমাত্র উপায়, ভূমিতে কৃষকের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সে লিখেছে 'ভূমিই এখানকার লোকের অর্থাগমের একমাত্র প্রধান উপায়। এই নিমিত্তই আমরা সেই ভূমির সাধারণ প্রজার সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করিয়া আসিতেছি।'(১৫২) আর এই প্রস্তাব সে করে এসেছে বিভিন্ন প্রসঙ্গে অজস্র প্রবন্ধে। মনে রাখতে হবে, তার এই প্রস্তাব নিতান্ত যুক্তি সর্বস্ব কিংবা পরীক্ষা-মূলক নয়, তার এই প্রস্তাবের ভিত্তি হল সমকালীন ইওরোপ আমেরিকার

অন্তর্গত বিভিন্ন দেশের—কম্বরল্যাণ্ড, ওয়েষ্টমোরল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে, সুইডেন, জার্মানী প্রভৃতি—সুখী, সমৃদ্ধ, ভূমিতে স্বত্ববান কৃষকসমাজের দৃষ্টান্ত। 'কৃষকদিগের ভূমিতে আপনার বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে কি মহালাভ হয়, তাহা আমেরিকা ও ইউরোপ খণ্ডের যে যে প্রদেশে কৃষকদিগের স্থায়ী স্বত্ব ও কৃষকাধিকার প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সেই স্থানের কৃষিকার্য্যের উন্নতি দর্শন করিলেই বিদিত হইবে।...ঐ উন্নতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেনা বলিবেন যে, কৃষকদিগের ভূস্বামিত্বই উহার মূল।'(১৫৩) সুতরাং সোমপ্রকাশের সুচিন্তিত অভিমত যাবৎ ভূমিতে কৃষকের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা দ্বারা দেশে কৃষক সম্প্রদায়কে স্বচ্ছল সমৃদ্ধশালী এবং সঞ্চয়শীল না করে তোলা হবে, তাবৎ দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।(১৫৪) সেই জন্যেই দেখা যাবে 'সোমপ্রকাশ জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি ভূমিতে প্রজাকে স্থায়ী স্বত্ব ও প্রকৃত ভূস্বামীত্ব দিয়া বঙ্গদেশকে সৌভাগ্যশালিনী করিয়া তুলিবার প্রস্তাব করিয়া আসিতেছে।'(১৫৫) আর দেশে ভূমিব্যবস্থার প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে ভূমিতে কৃষকের সেই স্বত্ব প্রতিষ্ঠার আদর্শ উপায় হলো, সোমপ্রকাশের মতে, জমিদারের সাথে গবর্ণমেন্টের মত, কৃষকের সঙ্গে জমিদারের একটি স্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা দেয় খাজনার পরিমাণ চিরতরে স্থির করে দেওয়া। সে লিখেছে 'সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজার সহিত রাজার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত।' কিন্তু যেহেতু গবর্ণমেন্ট ইতিমধ্যে জমিদারদের সঙ্গে স্থায়ী বন্দোবস্ত করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ায় এরকম বন্দোবস্ত করার পথ বন্ধ, সেহেতু এখন একমাত্র বাস্তবোচিত সমাধান হল, 'জমিদারকে মধ্যে রাখিয়া প্রজার সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত' এবং 'যে যে স্থানে জমিদারদের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, তত্তৎ স্থানে প্রজার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্থায়ী বন্দোবস্ত করা।' মোটের উপর, সোমপ্রকাশের মতে, 'গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য এই, তাঁহারা জমীদারদিগকে লইয়াও কৃষকদিগের নিজ নিজ জোতের ভূমিতে অল্প হারে মৌরসী পাট্টা দেওয়ান।' 'একটি নির্দিষ্ট হারে কৃষকের সহিত স্থায়ী বন্দোবস্ত করার' এই আবেদন সোমপ্রকাশ জানিয়ে আসছে ১৮৬২ অবধি।(১৫৬) কিন্তু দীর্ঘকালের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সোমপ্রকাশ যখন বুঝতে পেরেছে যে এদেশে ভূমিব্যবস্থার প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে ভূমিতে কৃষকের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করা প্রকৃতপক্ষে কখনই সম্ভব নয়, তখন তার সেই একনিষ্ঠ অবিচল দাবীর বাস্তব রূপায়ণের

জন্যে সে বরং নির্দ্বিধায় প্রচলিত ভূমিব্যবস্থারই অবসানের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এসেছে : 'জমিদারেরা শস্য ও স্বত্ব গ্রহণ করিয়া ক্ষান্ত থাকেন, গবর্ণমেন্ট স্বয়ং আটিসমেত গিলিয়া ফেলেন। এই উভয়বিধ রাজস্ব সংগ্রহ বিধির সম্পূর্ণ পরিবর্তন না করিলে প্রজাগণের কিছুতেই উন্নতি হইবে না, ক্রমশঃ তাহারা আরও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। সে কারণ আমাদের একান্ত অভিলাষ, রুশ গবর্ণমেন্ট যেমন জমিদারদিগকে ভূমির মূল্য দিয়া প্রজার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টও ভারতবর্ষে তদ্রূপ উপায় অবলম্বন করুন। প্রত্যেক ভূস্বামীকে তাঁহার জমিদারীর মূল্যস্বরূপ লাভের বিশগুণ পণ প্রদত্ত হউক। ঐ পণের অর্দ্ধেক প্রজাগণ দিবে অর্দ্ধেক গবর্ণমেন্ট দিউন। প্রজারা নিষ্কর ভূমি ভোগ করুক। ইহাতে মহোপকার সাধিত হইবে।'(১৫৭) মুখ্যত কৃষকস্বার্থের সমর্থক সোমপ্রকাশ কৃষকের স্বার্থরক্ষা করতে অবশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করার পরামর্শ দিয়েছে। দেশে উন্নততর উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ সংক্রান্ত তাঁর নিজস্ব অভিমতটির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রক্ষা করেই সে প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার অবসানের দাবী উত্থাপন করেছে। এটি নিঃসন্দেহে সোমপ্রকাশের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়।

দেশে উন্নততর উৎপাদন সম্পর্কের স্বাধীন বিকাশের যে পথ সোমপ্রকাশ নির্দেশ করেছে, নিঃসন্দেহে সেটি ধনতন্ত্রের সীমার মধ্যে আবদ্ধ। তবে ধনতান্ত্রিক পথের সার্থকতার প্রশ্নে তার মনে ফুটে উঠেছে অস্ফুট দ্বিধা। সমকালীন ইওরোপে প্রচলিত ধনতান্ত্রিক সমাজে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য, (১৫৮) সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে শ্রমজীবিদের ভয়াবহ দুর্দশা, (১৫৯) বুর্জোয়া সভ্যতার অপসংস্কৃতির দিকটি সম্পর্কে সে বেশ সচেতন। এই জন্যে স্বদেশের পুনরুজ্জীবনে 'কৃতবিদ্য সম্প্রদায়'কে সে বার বার সতর্ক করে দিয়েছে সমকালীন ইওরোপীয় সমাজের বিচ্যুতিগুলি সম্পর্কে এবং পরামর্শ দিয়েছে সযত্নে সেগুলিকে পরিহার করে চলতে।(১৬০) কিন্তু বস্তুত সেটি কিভাবে সম্ভব তার নির্দেশ অবশ্য সে দিতে পারে নি, অর্থাৎ সুপরিচিত ধনতান্ত্রিক পথটির কোন বিকল্পের সন্ধান দিতে পারে নি।

দেশকে নেতৃত্ব দেবে কারা?

এই নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রশ্নেও সোমপ্রকাশ যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর

পরিচয় দিয়েছে। সুগভীর প্রত্যয় নিয়ে সে ঘোষণা করেছে 'এদেশের যে কিছু সদনুষ্ঠান হইয়াছে, হইতেছে, হইবে তাঁহাদিগের (শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের) হইতেই হইয়াছে, হইতেছে, হইবে।...তাঁহাদিগের হইতেই এদেশের উন্নতি হইবে, এই আশা আছে।'(১৬১) তার এই প্রত্যয়ের উৎস, সে য বিকাশের কথা বলে, তার চরিত্র সম্পর্কে তার স্বচ্ছ ধারণা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে সে যে বিকাশের কথা বলেছে, বস্তুতপক্ষে সেটি হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিকতা, ইওরোপে তখন চলছে যার উত্তরণ উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে। সোমপ্রকাশের চিনে নিতে আদৌ ভুল হয় নি, চরিত্রগতভাবে এদেশের ধনাঢ্য সম্প্রদায়টি নয় (যেটি প্রধানতঃ দেশের সামন্ত ভূস্বামী ও রাজন্যবর্গকে নিয়ে গঠিত) বরং বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়টিই সমকালীন ইউরোপের বুর্জোয়াদের সমগোত্রীয়। কাজেই এই সম্প্রদায়টির শিক্ষা সংকোচনের সরকারী নীতির প্রতিবাদে তার সুচিন্তিত মন্তব্য 'যদি তাঁহা-দিগের (শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের) উচ্চ শিক্ষার পথ বন্ধ করা হয়, দেশ অন্ধ হইবে সন্দেহ নাই।'(১৬২) সেই জন্যেই লক্ষ্য করার বিষয়, দেশের উন্নততর বিকাশে ধনের একটা বিরাট ভূমিকা আছে এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের মত ব্যাপক দারিদ্রের দেশে যৎসামান্য যে ধন আছে, তা ঐ ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের হাতেই আছে, একথা বিলক্ষণ জানা থাকা সত্ত্বেও, ধনাঢ্য ভূস্বামী ও নিঃস্ব কৃষকের স্বার্থদ্বন্দ্বে, সোমপ্রকাশ প্রধানতঃ কৃষকের স্বার্থের সমর্থনকারী। কারণ তার দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের বিকাশসাধনে সে মনে করে নেতৃস্থানীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যোগ্য সহযোগী হতে পারে এদেশের উক্ত ধনাঢ্য সম্প্রদায়টি নয়, তার পরিবর্তে এদেশের কৃষক-শ্রমজীবী সম্প্রদায়। দেশের উন্নততর বিকাশে নেতৃস্থানের প্রশ্নে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়টির এই সহযোগী নির্বাচন নিঃসন্দেহে সোমপ্রকাশের ঐতিহাসিক বাস্তবতাবোধের পরিচায়ক। কারণ সম্প্রদায় হিসেবে যোগ্যতার প্রশ্নে তুলনামূলক বিচারে সে দেখেছে, জমি-দারেরা উচ্চ শ্রেণীর লোক বটে, কৃষকদের চেয়ে তাদের বুদ্ধি এবং অর্থও অধিক, সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিক হলে কি হবে, তাকিয়া ও আলবোলা যে এক অবলম্বন এবং প্রজাপীড়ন করে করে অর্থ উপার্জন করার যে একটি রোগ তাদের আছে, তাতেই সব শেষ করে রেখেছে। অতএব তার বক্তব্য 'এ সকল উপদ্রব সত্ত্বে জমিদারদিগের হইতে দেশের উন্নতি লাভ সম্ভাবনা কি?' দ্বিতীয়ত তার বক্তব্য ধনী ব্যক্তিদের অর্থসামর্থ থাকলেই বা কি! রেলওয়ে নির্মাণ

ইত্যাদির মত ব্যয়সাপেক্ষ কাজে অর্থ ব্যয়ের কোন আগ্রহ তাদের নেই। তাঁরা বরং দোল-দুর্গোৎসবে অর্থব্যয় করেন।(১৬৩) তাছাড়া সচরাচর প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় রাজা কিম্বা জমিদার সাবালক হলেই সাহেব ঘেঁষা হন এবং সাহেবদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে খানা খাওয়া ও মদ্যপান করাকে কর্তব্য মনে করেন। '...যে কয়দিন বেচে থাকেন সে কদিন এঁদের অনেকে অনেক রকম লীলা খেলা দেখান', যথা বহুব্যয়ে বিবির নাচ, তোষাখানায় খানা খাওয়ান এবং টাউন হলে 'বল' প্রদান। মনে ভাবেন এরকম করলেই সাহেবরা তাঁদের উচ্চ উপাধি দেবেন। দুঃখের বিষয় তাদের এ জ্ঞান থাকে না যে তাঁদের চেয়ে সাহেবরা অনেক সুচতুর। যদি সে জ্ঞান তাদের থাকত, তবে ঐ টাকায় তাঁরা কলকারখানা স্থাপন করে দেশের যথেষ্ট উপকার করতে পারতেন।(১৬৪) মোটের উপর দেশের উন্নতি সাধনে ধনাঢ্য রাজা-জমিদার সম্প্রদায়ের ভূমিকা সম্পর্কে সোমপ্রকাশের বক্তব্যের সারটুকু হল সম্প্রদায় হিসেবে তাদের চরিত্রগত অযোগ্যতার কথা বাদ দিলেও, তাদের আর্থিক সামর্থ সম্পর্কে বলা যেতে পারে, যেসব কাজে ব্যয় করলে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা আছে সেসব কাজে ব্যয় করার স্পৃহা তাদের নেই। অতএব তার বক্তব্য 'ধনীরা কিছু করিতে পারিবেন না বলিয়া আর কাহার দ্বারা কিছু হইবে না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা ন্যায়ানুগত নয়।' বলাই বাহুল্য, এখানে 'আর কাহার দ্বারা' বলতে সোমপ্রকাশ বুঝিয়েছে কৃষক সম্প্রদায়কে। ধনী শিক্ষিত জমিদার সম্প্রদায়ের পরিবর্তে দরিদ্র অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে সোমপ্রকাশের এই সুগভীর আস্থার কারণ তারা 'শ্রমশীল'(১৬৫) এবং সে মনে করে 'জমিদারগণের কাজের লোক হইবার যত প্রতিবন্ধকতা আছে, কৃষকগণের তত নাই।'(১৬৬) আর তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাবের প্রশ্নে সোমপ্রকাশের দৃঢ় প্রত্যয়, তাদের অন্নকষ্ট দূর হলেই অবস্থার উন্নতি হবে, লেখাপড়া প্রবৃত্তি ও আগ্রহ জন্মাবে। লেখাপড়া শিখলেই নিজেদের অধিকার ও স্বত্ব বুঝতে পারবে, কর্তব্যাকর্তব্য জ্ঞান জন্মাবে।(১৬৭) সবচেয়ে বড় কথা, সোমপ্রকাশের দৃষ্টিতে তারাই দেশের ব্যাপক অংশ। তাদের নিয়েই দেশ।(১৬৮) কাজেই সে মনে করে তারা (কৃষক) 'স্বচ্ছল হইলেই দেশ স্বচ্ছল হইবে।' তাহলেই দেশের উন্নতি সাধনে প্রয়োজনীয় সম্পদও সঞ্চিত হতে পারবে।(১৬৯) সুতরাং দেশের উন্নততর বিকাশের কাজে সম্প্রদায়গত বিন্যাস সম্পর্কে সোমপ্রকাশের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীজাত স্পষ্ট অভিমত, 'দ্বিতীয় ও তৃতীয়

শ্রেণী হইতেই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে।'(১৭০) তার যুক্তির সারবত্তা প্রমাণ করতে সমকালীন ইউরোপে অনুরূপ বিকাশের দৃষ্টান্ত সে তুলে ধরেছে। সে মনে করে বর্তমানে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী যে নিজেদের উন্নতি সাধনে সক্ষম হয়েছেন সেটি সম্ভব হয়েছে ঐসব দেশের লর্ড জমিদারদের বিরুদ্ধে উক্ত দুই শ্রেণীর ঐক্যের ফলেই।(১৭১) দেশের নেতৃত্বদানের প্রশ্নে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মুখপত্র সোমপ্রকাশের এই সহযোগী নির্বাচন নিঃসন্দেহে গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

দেশের উন্নততর বিকাশের লক্ষ্য

সোমপ্রকাশের সূচনা এদেশে উনিশ শতকে সামাজিক শক্তি হিসেবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়টির আর্বিভাবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। উক্ত সম্প্রদায়টির অন্যতম সেরা মুখপত্র সোমপ্রকাশের প্রধান বৈশিষ্ট্য তার জীবনের প্রথম থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত সমাজে কৃষক শ্রমজীবীর স্বার্থরক্ষায়, বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে দেশের ব্যাপক জনগণের স্বপক্ষে নিরলস লেখনী-সঞ্চালন। কিন্তু মনে রাখতে হবে তার সেই প্রেরণার উৎস ছিল, বস্তুতপক্ষে, তার সুগভীর মানবতাবোধ যা থেকে গড়ে উঠেছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়টির মধ্যে বিদেশী শাসন ও শোষণে জর্জরিত কৃষক শ্রমজীবী সম্প্রদায় সম্পর্কে গভীর সহমর্মিতা। সমাজে আবহমানকালের ধনী দরিদ্রের বৈষম্য প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ মন্তব্য করেছে 'কেহ দরিদ্র কেহ ধনী জগতের গতি এইরূপ বটে কিন্তু কতকগুলিকে ধনী করিতে হইবে বলিয়া কতকগুলিকে দরিদ্র করিবার ইচ্ছা করাও সঙ্গত নহে।'(১৭২) কাজেই সে 'তৃতীয় শ্রেণীর উন্নতি দর্শন কামনা' করে।(১৭৩) সুতরাং বিদেশী শাসনে নির্যাতিত শোষিত দুই অভিন্ন শরিকের অন্যতম, সমাজের অপেক্ষাকৃত অগ্রসর অংশ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়টির প্রতিনিধি স্থানীয় সোমপ্রকাশ এগিয়ে এসেছিল অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎপদ অংশ কৃষক শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে। তার বহুদর্শী বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সে বিলক্ষণ বুঝেছিল সেই পশ্চাৎপদ অংশের অগ্রগতি ব্যতীত সে যে সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, তারও মুক্তি সম্ভব নয়, কোন মতেই। সোমপ্রকাশ দেখেছে যেখানে 'ধনীর পূজা ও দরিদ্রের মৃত্যু' সেই ধনী প্রধান দেশ 'ইংলণ্ডের ছাঁচে (ইংরেজ শাসনে, এদেশে)' 'যে শাসন প্রণালী গঠিত' (হল) · (সেখানেও) 'সমাজের উপরিস্থিত শ্রেণীদিগের জন্য নানা প্রকার

আয়োজন হইল ; কিন্তু সকলের চক্ষের নিম্নে যে আর এক শ্রেণী মুখ মুদ্রিত করিয়া রহিল, জগতের আইন পুস্তকে যাহাদের নাম কৃষক ও শ্রমজীবী, দয়ার পুস্তকে যাহাদের নাম দরিদ্র ও অসহায়, এবং ন্যায়ের পুস্তকে যাহাদের নাম সমাজের মূল ভিত্তি অথবা বন্ধু', সোমপ্রকাশ লক্ষ্য করেছে, 'তাহাদের প্রতি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি পড়িল না। গবর্ণমেণ্ট উচ্চ শ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষিত করিলেন, তাহারা আপনাদের অধিকার ও পদ বুঝিয়া লইলেন এবং আপনাদের কষ্টদুঃখ গবর্ণমেন্টের গোচর করিতে লাগিলেন ; কিন্তু সেই দরিদ্রেরা যে মুখ মুদ্রিত করিয়া ছিল, তাহারা মুখ খুলিল না।'(১৭৪) সুগভীর মানবতাবোধ সম্পন্ন সমাজ সচেতন সোমপ্রকাশের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জেগেছে 'সেই কোটি কোটি নির্বাক জীব যাহারা জ্ঞানে বঞ্চিত হইয়া চিরদিন অন্ধকারে বাস করিতেছে, যাহাদের সংবাদপত্র নাই, এসোশিয়েসন নাই, মনের কষ্ট জানাইবার অন্য কোন উপায় নাই, তাহাদের হইয়া বলে অথবা ভাবে কে?'(১৭৫) সঙ্গত কারণেই সে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ এনেছে 'সুসভ্য গবর্ণমেণ্ট তুমি তাহাদের জন্য কি করিয়াছ?' গভীর ক্ষোভের সঙ্গে দেশবাসীর কাছে প্রশ্ন করেছে 'দেশবাসী তোমরাই বা তাহাদের জন্য কি করিয়াছ?'(১৭৬) দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে সোমপ্রকাশ তাই আবেদন জানিয়েছে 'সকল মানবহিতৈষী একত্র হইয়া এই নির্বাক নিরাশ্রয় ও সহিষ্ণু প্রাণীদিগকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করুন।'(১৭৭) এই জন্যেই লক্ষ্য করা যাবে সমকালীন সমাজের যাবতীয় অগ্রগতি 'কৃতবিদ্য সম্প্রদায়' হতেই হয়েছে এবং হবে.(১৭৮) তারাই হল 'সমাজের সারভূত অঙ্গ'(১৭৯)—তার এই সুগভীর প্রত্যয় সত্ত্বেও সে কৃষক শ্রমজীবীর ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে কখনও বিস্মৃত হয় নি। 'দেশটি সমৃদ্ধ একথা বলিলে এই বুঝায়', লিখেছে সোমপ্রকাশ, 'যে, সেদেশের অধিকাংশ লোক বিদ্বান ও ধনবান।'(১৮০) আর তার চোখে সেই 'অধিকাংশ লোক' হল 'মধ্য ও ইতর শ্রেণী' যারা আছে মুষ্টিমেয় ধনাঢ্যের বিপরীতে সারা দেশ জুড়ে : 'জমিদার কয়জন, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীতেই দেশ ছাইয়া আছে।'(১৮১) দেশের উন্নতিতে সেই নিম্ন শ্রেণীর ভূমিকা প্রসঙ্গে তার দ্ব্যর্থহীন অভিমত 'নিম্ন শ্রেণী উন্নত না হইলে দেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া পরিগণিত হয় না।'(১৮২) অতএব তার সুচিন্তিত ও সুসংগত অভিমত 'তাহাদিগের (কৃষক সম্প্রদায়ের) উন্নতি হইলেই দেশের উন্নতি হইবে',(১৮৩) তাহাদিগের স্বাধীনতা ও সৌভাগ্য লাভ হইলেই তন্মূলক

ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি হইবে।'(১৮৪) সুতরাং সোমপ্রকাশের দৃষ্টিতে দেশের উন্নতি বলতে বুঝিয়েছে: কৃষক শ্রমজীবীর প্রতি যথার্থ সুবিচারের ব্যবস্থা। সেই সুবিচার প্রতিষ্ঠায়, তার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম পদক্ষেপটি হল ভূমিতে কৃষকের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা। এই জন্যেই সে কৃষকের স্বার্থের অনুকূলে প্রচলিত ভূমিব্যবস্থার সংস্কার সাধন করতে জনমত গড়ে তুলতে সর্বদা চেষ্টা করেছে। ভূমি স্বত্বভোগী সম্প্রদায়ের কাছে তাই বারে বারে সে আবেদন জানিয়েছে: দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, দেশের ব্যাপক জনগণের স্বার্থে রায়তের অনুকূলে ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রস্তাবটি মেনে নিতে। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যখন সে বুঝতে পেরেছে ভূমিব্যবস্থার প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে রায়তের স্বার্থ সংরক্ষণ কোনমতেই সম্ভব নয়, তখনই সোমপ্রকাশ নির্দ্বিধায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটানর জন্যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। কারণ যে ব্যবস্থায় 'কৃষকগণ সম্পূর্ণ শ্রম করিয়াও বহুবিধ করভারে অবনত হইয়া পড়িতেছে পক্ষান্তরে জমিদারেরা আলস্যে কালক্ষেপ করিয়া বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন' সে ব্যবস্থা, তার বিচারে, 'এক মহৎ পক্ষপাত'(১৮৫) অর্থাৎ একটি বিরাট অবিচার। লক্ষ্যণীয়, সোমপ্রকাশের কাছে ইতিহাসগতভাবে বাতিল হয়ে যাওয়া সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক (বিদেশী শাসনে এদেশে যার নবতর রূপ ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তজাত ভূমিব্যবস্থা) শুধু যে একটি বিরাট অন্তরায় বলেই তা বর্জনীয়, তাই নয়, তার কাছে তার চেয়েও বড় কথা, সামাজিক ন্যায়ের মানদণ্ডে এটি একটি বিরাট 'পক্ষপাত'। অতএব সেই পক্ষপাতিত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাটির অবসান কামনা করে সোমপ্রকাশ মন্তব্য করেছে 'এই কুপ্রথাটি কোনক্রমে উপেক্ষণীয় নহে, আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে, সেকারণে ইহাতে লোকের আশ্চর্য্য বোধ হয় না, নচেৎ এবম্বিধ কুরীতি সভ্য সমাজে প্রচলিত থাকে ইহা সামান্য অনুশোচনার বিষয় নহে।'(১৮৬) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে সোমপ্রকাশের এই মনোভাব গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত: সামন্ততান্ত্রিক বৈষম্যজাত অবিচারের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার এই আগ্রহই সোমপ্রকাশের প্রগতিশীল চিন্তাধারার মর্মবস্তু।

সোমপ্রকাশের দৃষ্টির স্বচ্ছতা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকেই, ভারতে ইংরেজ শাসনের এমন বলিষ্ঠ অথচ সরল, এমন তীক্ষ্ণ অথচ সংযত সমালোচনা সোমপ্রকাশের

অসাধারণ দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। তার দেখা ইংরেজ শাসন আর ইংরেজ শাসনের আসল পরিচয় এক না হলেও অনেকটা কাছাকাছি। সেই জন্যেই ঊনিশ শতকের বাঙালী বুদ্ধিজীবীসুলভ অনেক দুর্বলতা ও অসংগতি থাকলেও, ইংরেজ শাসন সম্পর্কে সে যথেষ্ট মোহমুক্ত,(১৮৭) আর সেই জন্যেই কৃষক বিদ্রোহকে সোৎসাহে সমর্থন না করলেও তাব বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের সে বিরোধী ববং তাকে দেখা যায় আন্তরিক সহানুভূতি দিয়ে কৃষকদের সমস্যাটির বিচার করতে। ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা থেকেই সে মধ্যবিত্ত-কৃষকশ্রমজীবীর অর্থাৎ ব্যাপক জনগণের ঐক্যের গুরুত্বটি অনুধাবন করতে পেরেছে। তাব এহেন দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ ও পরিপুষ্টি ঘটেছে ইংবেজ শাসনের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্যে দিযে নয়, বস্তুতঃ ইংবেজ শাসনেব সঙ্গে তার বিবোধেব মধ্যে দিয়ে। সোমপ্রকাশের কাছে ইংরেজ শাসনের অর্থ, এক কথায় সীমাহীন শোষণ, ঘৃণা প্রবঞ্চনা, ব্যাপক বেকারত্ব আব অপরিসীম নিঃস্বতা। তাই বলে ইংরেজ যে সভ্যতার অধিকাবী তা থেকে মুখ ফিরিয়ে ভারতেব অপসৃয়মান সভ্যতার প্রতি সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি, যদিও সে প্রখর স্বাদেশিকতাবোধেব অধিকাবী। এখানেই তার দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা ও সেই জন্যেই, বলিষ্ঠতাও। আমাদের দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে ধারাটি রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পূর্বশর্ত হিসেবে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার প্রবক্তা ছিল, সোমপ্রকাশ সেই ধাবাব পূর্বগামী।

দ্বিতীয় ভাগ

বিতর্ক

ঔপনিবেশিক যুগে ভারতের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা

নির্মাল্য বাগচী

একটি দীর্ঘস্থায়ী ধারণা কিংবদন্তীর মত প্রচলিত যে ইংরেজ শাসকেরা স্বেচ্ছায় সচেতনভাবে উচ্চশিক্ষা প্রসারে উৎসাহী ছিলেন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁদের কল্যাণেই এসেছে। ইদানিংকালে কেমব্রিজ ঐতিহাসিক গোষ্ঠী একটি তত্ত্বপ্রচারে তৎপর হয়ে উঠেছেন : যেহেতু পাশ্চাত্য শিক্ষায় দীক্ষিত হওয়ার ফলে ভারতে জাতীয়তাবাদী চেতনা এসেছে, অতএব ভারতবর্ষে জাতীয়তা-বাদের প্রেরণা জুগিয়েছে ইংরেজ এবং গোটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনটিই ইংরেজের হাতে গড়া।

ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে ইংরেজের কোনও শিক্ষানীতি ছিল না। এই সময়ে 'হস্তক্ষেপ না করার নীতি' অনুসৃত হয়েছে। কলকাতায় মাদ্রাসা, বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ ও এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনের মধ্য দিয়ে তাঁদের প্রাচ্য বিদ্যাপ্রীতি প্রকটিত হয়েছে।

১৮১৩ সালের সনদের একটি ধারায় শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় এবং বিজ্ঞান শিক্ষা বিতরণের অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। শিক্ষার জন্য ইংরেজ সরকারের এই প্রতিশ্রুতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা গেছে, এটা কোনক্রমেই obligatory বা বাধ্যতামূলক ছিল না, তাছাড়া এর ব্যাখ্যা নিয়ে 'প্রাচ্যবাদী' ও 'প্রতীচ্যবাদী'দের মধ্যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে এবং অবশেষে জেনারেল কমিটি এক কথায় বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন :

"Tuition in European Sciences is neither among the sensible wants of the people nor in the power of Government to bestow."

অনুবাদ: 'ইওরোপীয় বিজ্ঞানের শিক্ষাদান জনসাধারণের যুক্তিসঙ্গত চাহিদার মধ্যে পড়ে না ; এ দেবার শক্তি সরকারের নেই।' এবং তারই ফলশ্রুতি দাঁড়াল ১৮২৪ সালে কলকাতার সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক একান্তভাবে আমাদের দেশের মানুষের আগ্রহে ঘটেছে। রাম-মোহন রায় বা রামকমল সেনকে ইংরেজী শিক্ষালাভের জন্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় নি। যুগ সংঘাতের ফলে যে নতুন মানসিকতা জন্ম নিয়েছিল তারই বাস্তব রূপ হল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৭)। এর মধ্যে সরকারের কোন পরোক্ষ বা অপরোক্ষ ভূমিকা নেই। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হাইড ইস্টের লিখিত বিবরণী থেকে জানা যায়, তার প্রতি সরকারের পক্ষে নির্দেশ ছিল, এই ধরনের কোন প্রস্তাবকে আমল না দেওয়া : not to give countenance by giving patronage, land or money. সরকারী আনুকূল্যের আশায় থেকে কলেজ প্রতিষ্ঠায় বৃথা এক বছর দেরী হল। হিন্দু কলেজ সম্পূর্ণ বে-সরকারী উদ্যোগের ফল। ১৮১৪ সালে 'কোর্ট অফ ডিরেক্টারস' নির্দেশ পাঠান ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অনুকরণে কোন কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। তার তিন বছর পরেই হিন্দু কলেজের সদর্প আবির্ভাব। পরবর্তীকালে বার্ষিক সাহায্য যা বর্ণিত হয়েছে তাতে পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্যণীয় : মাদ্রাসা—৫০,০০০, সংস্কৃত কলেজ—২০,০০০, বিদ্যালয়—১০,০০০ টাকা।

কেন এই দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা? এর সঠিক ব্যাখ্যা ১৮৫৩ সালে একজন ইংরেজের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় : 'The natives have an idea that we have gained everything by our superior knowledge; that it is this superiority which has enabled us to conquer India and to keep it; and they want to put themselves as much as they can upon an equality with us.' (W. W. Bird : Parliamentary Select Committee, 30th June, 1853) অনুবাদ : 'এদেশের লোকদের ধারণা আমাদের উন্নত জ্ঞানের সাহায্যে আমরা সব কিছু লাভ করেছি; এই শ্রেষ্ঠত্বের ফলে আমরা ভারতবর্ষ জয় করেছি ও শাসন করছি এরা চায় যতটা সম্ভব আমাদের সমকক্ষ হতে।'

পুঁজি গ্রন্থের প্রথম জার্মান সংস্করণের ভূমিকায় কার্ল মার্কস বলেছেন, 'যে দেশ বেশি শিল্পোন্নত সে অল্প উন্নত দেশকে তার ভবিষ্যতের ছবিটিই তুলে ধরে।' ('The industrially more developed country presents to the less developed country a picture of the latter's future.')

সুতরাং ইংরেজী শিক্ষার প্রতি আগ্রহের পিছনে রয়েছে, ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্বের রহস্যভেদ ও তার সমকক্ষ হয়ে ওঠা, যার ফলে স্বাধিকার লাভ করা সম্ভবপর হবে।

১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর, রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্ট'কে (২) সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানিয়ে যে ঐতিহাসিক পত্র দেন, শিবনাথ শাস্ত্রী তাকে 'নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্খধ্বনি' বলে অভিহিত করেছেন। রামমোহন বলেছিলেন যে সংস্কৃত শিক্ষাব্যবস্থা দেশকে কুসংস্কারের অন্ধকারে রাখার পক্ষে সবচেয়ে ভালো উপায় হয়ে থাকবে। তিনি দাবি করেছিলেন, উদার ও উন্নত নূতন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন, ও গণিত শাস্ত্র, ভৌত বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীর সংস্থান প্রভৃতি কার্যকরী বিদ্যার শিক্ষাব্যবস্থা।

সরকার থেকে এই প্রতিবাদমূলক চিঠির কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। সরকারী মন্তব্যে বলা হল, কে এই রামমোহন। একজন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত এই চিঠি উত্তরের অযোগ্য এবং রামমোহন দেশের লোকের প্রতিনিধিত্বের দাবি করতে পারেন না, চিঠির বক্তব্য সারা দেশের লোকের মনোভাবের পরিচায়ক নয়। সবকিছু অগ্রাহ্য করে ১৮২৪ সালে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল।

রামমোহন প্রভৃতি যাঁরা সেদিন এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন, তাঁদের কাছে ইংরেজী ভাষা ছিল সহজতম মাধ্যম যার সাহায্যে দ্রুততার সঙ্গে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যুক্ত হওয়া, বিশ্ব বাজারের অর্থনীতির মধ্যে প্রবেশ করা, মার্কসের ভাষায় 'মানবজাতির পারস্পরিক নির্ভরতার উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বময় যোগাযোগ'-এর মধ্যে সামিল হওয়া, একটি সামাজিক গড়ন থেকে নূতন এক সামাজিক গড়নে উত্তরণ, সম্ভবপর হবে। বুর্জোয়া বিকাশের পথকেই তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন, এবং এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁদের পদে পদে বিরোধ বেধেছিল।

২

ইংরেজ শাসক গোষ্ঠী 'প্রাচ্যবাদী' ও 'প্রতীচ্যবাদী' এই দুই অংশে বিভক্ত হওয়ার ফলে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটল। এর পিছনে রয়েছে বিশ্ব ধনতন্ত্রের স্তরান্তর—বণিক মূলধন থেকে শিল্প মূলধনে উত্তরণ। ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিস-এর যুগ থেকে বেন্টিঙ্কের আমল এক নূতন পরিবর্তনের সূচনা করে। এই পরিবর্তন শাসকশ্রেণীর চেতনার মধ্যেও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করল।

বেণ্টিঙ্ক-মেকলে-ট্রেভলিয়ন প্রভৃতি সাম্রাজ্য শাসনের প্রয়োজনে ও আর্থিক সম্পদকে ব্যবসা ও শিল্পের স্বার্থে শোষণের উদ্দেশ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী হলেন। 'প্রাচ্যবাদী'দের পরাজয় ঘটল; বেণ্টিঙ্ক ৭ মার্চ, ১৮৩৫ এই প্রস্তাবে স্বাক্ষর দান করেন। রামমোহন যে চিঠি আমহার্স্ট'কে লিখেছিলেন, তার বার বছর পর, এবং তার মৃত্যুর দুই বছর পর, যে নীতির লড়াই তাঁরা করে আসছিলেন, সে নীতি জয়যুক্ত হল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, মেকলের অলঙ্কারের প্রতি ঝোঁকের ফলে ইতিহাসের কাছে সুবিচার পান নি; 'ভার্নাকুলার শিক্ষা'র পক্ষেই তিনি লিখেছেন। অন্যদিকে রামমোহন প্রভৃতি সংস্কারবাদীরা উগ্র ইংরেজীপন্থী ছিলেন না। তারা বাংলায় প্রচুর বই রচনা করেছিলেন, তার প্রমাণ, 'কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) ও পরবর্তীকালে 'ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি'। রামমোহনের নিজের বিদ্যালয়ে বাংলার মাধ্যমে সব বিষয় পড়ানো হত। সে আলোচনা অন্যত্র হতে পারে।

সাম্রাজ্যবাদও ইতিহাসের অধীন, তাকে ইতিহাসের নিয়মকানুন মেনে নিতে হয়, নিজের অজ্ঞাতসারে মার্কসের ভাষায় 'ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ার' হিসাবে কাজ করতে হয়,—'বৈষয়িক পূর্বশর্ত স্থাপনের কাজ না করে পারবে না' (ভারতে বৃটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল)। স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীমতী মর হেলকে এক পত্রে লেখেন, 'আধুনিক ভারতে বৃটিশ শাসনের কেবল একটা মাত্র মাঙ্গলিক চরিত্র আছে, যদিও এই চরিত্র এসেছে বৃটিশের অজ্ঞাতসারে (though unconscious)' (রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৫-৭৭)।

ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের স্বপক্ষে যে স্বীকৃতি ইংরেজ শাসককে দিতে হল, সাম্রাজ্যবাদের ক্রূর স্বার্থেই তার বিরোধিতা তাকে করতে হবে। উচ্চ শিক্ষার প্রসার তাই কখনো স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে ঘটবে না। পদে পদে সন্দেহ অবিশ্বাস দেখা দেবে, স্ববিরোধিতা প্রকাশ পাবে, উচ্চ শিক্ষার বিকাশ বাধা পাবে, খণ্ডিত, বিকৃত, ও দুর্বল করার অপপ্রয়াস চলবে। তার বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলেছে। কার্ল মার্কস লিখেছেন, 'ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত·····একটি শ্রেণী গড়ে উঠেছে।' 'অনিচ্ছাসহকারে' ও 'স্বল্প পরিমাণে' শিক্ষিত এই দুইটি শব্দের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের উচ্চ শিক্ষা নীতির আসল চরিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। ঠিক একই বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ

বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই শিক্ষা হইতে লাভবান হইয়াছেন, আমাদিগকে অপশিক্ষিত করিবার সর্বপ্রকার সরকারী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াই তাঁহাদিগকে এই লাভটুকু সঞ্চয় করিতে হইয়াছে।' (র‍্যাথবোনকে লিখিত চিঠি)

স্যার চার্লস উড তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত প্রস্তাবের (১৮৫৪) জন্য খুবই স্তুতি পেয়ে থাকেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হয়েছে। উড সাহেব উচ্চ শিক্ষা বিশেষ করে কলকাতায় উচ্চ শিক্ষা প্রসারের একেবারেই পক্ষপাতী ছিলেন না। মেকলের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ২০ বছরের মধ্যে চতুর ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছে উচ্চ শিক্ষা আতঙ্কের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। এলেনবরা উডকে সাবধান করলেন এই বলে, 'Education will be fatal to British rule' (শিক্ষা ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে সর্বনাশা হয়ে উঠবে)। উড সাহেব ডালহৌসিকে লিখে পাঠালেন, 'নেটিভরা' শিক্ষা পেয়ে বুদ্ধিমান হয়ে উঠলে বিপদ হবে। মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে উডের আপত্তি ছিল না, যেমন ছিল কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়। তাঁর নির্দেশ ছিল, যদি বাঙালীরা বেকন এবং সেক্সপিয়র পড়তে চায়, তাহলে সে খরচ নিজেরাই যেন বহন করে। এইসব উচ্চ শিক্ষিত 'নেটিভরা' চাকরী না পেলেই সরকার বিরোধী অসন্তুষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হবে। 'I am against providing our future detractors, opponents and grumblers'. রাজের নিরাপত্তা উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের বাধা হয়ে দাঁড়াল।

অবশেষে ডালহৌসির চেষ্টায় উড সাহেবকে রাজি করানো গেল। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। এ হল শিক্ষাদানের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি কর্পোরেশন; দায়িত্ব থাকল: কলেজগুলিকে অনুমোদন দান, পাঠ্যসূচী নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি দান আর ক্যালেণ্ডার মুদ্রণ। সরকারী ব্যয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রেসিডেন্সি কলেজের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকল। লর্ড ক্যানিং-এর স্বপ্ন ছিল কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ডের মত অভিজাত ও উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গণ্ডীবদ্ধ থাকবে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষাকে এভাবে বেঁধে রাখা যায় নি, ইতিহাসের গতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই শিক্ষা প্রসারিত হল। ১৮৬৬ সালের সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্য হেনরী মেইন স্বীকার করলেন: 'The founders of the

University of Calcutta thought to create an aristocratic institution ; and in spite of themselves, they have created a popular institution'.

উচ্চ শিক্ষাকে সঙ্কুচিত ও ব্যর্থ করার উদ্দেশ্য নিয়ে একাধিক সরকারী চক্রান্ত চলতে লাগল। শিক্ষাসূচী এমনভাবে তৈরী করা হল যাতে ছাত্রেরা একটি জীবনবিমুখ অবাস্তব শিক্ষা লাভ করে ; সাহিত্য ও কলার দিকে ঝোঁক বেশি ; ভৌতবিজ্ঞানের স্থান নেই। বিভিন্ন কলেজে গোরা সৈন্যদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিয়োগ করা হত, এতে অল্প মাইনে দিলে চলত, কর্ণেলদের আধিপত্য শুরু হল, অবশ্য ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম। ১৮৬৪ সালে বাংলা ভাষাকে পাঠ্যসূচী থেকে নির্বাসিত করা হল, তার স্থলে প্রাচীন ভাষা শিক্ষা (সংস্কৃত) বাধ্যতামূলক হল, ১৯১০ সালের পর বাংলা ভাষা পাঠ্যসূচীতে স্থান লাভ করল। মুখস্তের উপর মাত্রাতিরিক্ত জোর পড়ল ; পরীক্ষার মান এত উঁচু করা হল যাতে বেশিসংখ্যক ছেলে পরীক্ষায় ফেল করতে বাধ্য হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক হলেন, তাঁদের পক্ষে পরীক্ষায় সব বিষয়ে পাশ করা সম্ভব হয় নি।

পরীক্ষায় ফেল এক বিভীষিকা সৃষ্টি করেছিল, বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হ্যাণ্ড (Hand) সাহেব ১৮৭১ সালে এক প্রতিবেদনে জানাচ্ছেন : 'পরীক্ষার মান বাড়াবার ফলে ছাত্র সংখ্যা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে…বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচী কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ কোর্সের থেকে উঁচু…এর ফলাফল হবে ভয়াবহ ক্ষতিকর।'

ইংরেজ শাসকদের বিবেক মাঝে মাঝে পীড়িত হত, এই ভেবে যে উচ্চ শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করার বদলে দেশের সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁদের কর্তব্য আছে, সেজন্য তাঁরা অনেক সময় প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি দরদী হয়ে উঠতেন। এরকম একটি প্রস্তাব তাঁরা বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর মতামত জানতে। ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৯ বিদ্যাসাগর বাঙলার ছোটলাট গ্র্যান্ট সাহেবকে লিখে জানান, 'সরকার ভেবেছেন যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য ৫।৭ টাকা খরচ করে নতুন শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করবেন। আমার মনে হয় না তাতে কোন কাজ হবে।…ইংলণ্ডে ও আমাদের দেশেও অনেকের মনে একটা ধারণা জন্মেছে যে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা

করা হয়েছে, এখন জনসাধারণের শিক্ষার জন্য কিছু করা দরকার।...কিন্তু এ বিষয়ে অনুসন্ধান করলে একথা সত্য বলে মনে হয় না।...দেশের সমস্ত লোককে শিক্ষিত করে তোলা খুবই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু...ইংলণ্ডের সরকার অত্যন্ত সচেতন হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায়, সেখানকার জনসাধারণের শিক্ষার অবস্থা আমাদের দেশের তুলনায় এমন কিছু উন্নত নয়।' তবু ইংরেজ সরকার বারে বারে গণশিক্ষার কথা তুলে উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। লালবিহারী দে যে পরিকল্পনা করেন বা গোখলে যে প্রস্তাব আনেন, সেসব যেভাবে নাকচ হয়ে গেল, তার থেকে বোঝা কঠিন নয়, গণশিক্ষার জন্য সরকারের দরদ শুধু মাত্র ভান।

৩

১৮৭০ সাল নাগাদ বিশ্ব ধনতন্ত্রের শিল্প পুঁজি থেকে ফিনান্স পুঁজি বা সাম্রাজ্যবাদের স্তরে উত্তরণ। লেনিন তাঁর 'সাম্রাজ্যবাদ: পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়' বইয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন—'পুঁজিবাদের পূর্ববর্তী স্তরের পুঁজিবাদী উপনিবেশিক নীতিও ছিল ফিনান্স পুঁজির উপনিবেশিক নীতি থেকে মূলত পৃথক।' সত্তরের দশকে সরকারের উচ্চ শিক্ষা নীতির তাৎপর্য বুঝতে হলে এই পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে। অর্থনৈতিক সংকট যত তীব্র হতে শুরু করল, তত উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের নীতি বিরুদ্ধ ভূমিকা গ্রহণ করতে লাগল। এই যুগে শুধু সংকোচন ও বাধা সৃষ্টির নীতি যথেষ্ট নয়, এই যুগে উচ্চ শিক্ষাকে প্রত্যাহার (policy of withdrawal) করার নীতি গৃহীত হল। সরকার চারিদিকে চাকরীর স্বল্পতা, শিক্ষিত বেকার, আর রাজদ্রোহের ছায়া দেখতে আরম্ভ করলেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজের নিরাপত্তার পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে উঠল, সংখ্যায় তারা যাই হোক না কেন। জন লরেন্স, লিটন, রিচর্ড টেম্পল, জর্জ ক্যাম্বেল, সকলে একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলেন। পাদ্রী জেমস জনসন খোলাখুলি বললেন, 'The present system is raising up a number of discontented and disloyal subjects.'

প্রথম স্তরে (১৮৭১) লেফটেনেন্ট গভর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্বেল সিদ্ধান্ত করলেন, এক্ষুনি কলেজগুলি একেবারে লোপ না করে, এদের প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পদাবনতি ঘটান হোক। ফলে কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, রাজশাহী

কলেজে বি এ ক্লাস তুলে দেওয়া হল, এফ এ পড়ানোর মধ্যে বেঁধে রাখা হল। বাঙলার শিক্ষিত সমাজ চুপ করে বসে ছিলেন না; রাজপুরুষদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে তাঁরা বিপদের আশঙ্কা করেছিলেন; ১৮৭০ সালের ২ জুলাই, কলকাতার টাউন হলে এক বিশাল প্রতিবাদ সভা আহ্বান করা হল, সেখানে মফঃস্বল থেকেও প্রতিনিধিরা যোগদান করেন।

জর্জ ক্যাম্বেল যে শিক্ষা সংহার নীতি শুরু করেছিলেন, হান্টার কমিশন (১৮৮২) সেই নীতিকে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে নিয়ে গেলেন। হীন-মন্যতায় ঠেলে দিয়ে, ব্যর্থতা প্রমাণ করে, এবার সেই কলেজগুলির উপর সরকারী খড়্গ নেমে আসল। স্থির হল, যদি কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান দায়িত্বভার গ্রহণ করতে রাজী না হয়, তবে এই কলেজগুলি এক নির্দিষ্ট দিন থেকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই তালিকায় পড়ে বহরমপুর, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম কলেজ।

সাম্রাজ্যবাদের আঘাত থেকে উচ্চ শিক্ষাকে বাঁচানো জাতির কাছে সামাজিক প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিল, জাতীয় দায়িত্ব হিসাবে অনুভূত হল। মহারাণী স্বর্ণময়ী ও পরবর্তীকালে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এগিয়ে আসলেন বহরমপুর কলেজকে নূতন জীবন দান করতে। মেদিনীপুর পৌরসভা মেদিনী-পুর কলেজের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। শুধু ধ্বংসোন্মুখ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচাবার প্রশ্ন নয়, এ যেন জাতির পক্ষে মর্যাদার প্রশ্ন হয়ে দেখা দিল।

সেদিন সেই চরম আঘাতের দিনে, একে একে নূতন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা ও বাংলাদেশের মাটির উপর সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে মাথা তুলতে শুরু করল। বিদ্যাসাগর মশায় প্রথম পথ দেখালেন, তিনি ১৮৭২ সালে মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন স্থাপন করলেন; ১৮৭৯ সালে তা প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত হল। বাঙালী অধ্যাপকেরা সব কিছু পড়াতে লাগলেন, সাহেব অধ্যাপক ছাড়াও ভাল ফল করা যায় এটা প্রমাণিত হল। বিদ্যাসাগর মশায় প্রেসিডেন্সি কলেজের একচেটিয়া অধিকার ভাঙলেন; স্বল্প বেতনে পড়বার সুযোগ সৃষ্টি করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাছে উচ্চশিক্ষাকে উন্মুক্ত করে দিলেন। তারপরেই ১৮৮১ সালে সিটি কলেজ, ১৮৮৪ সালে রিপণ কলেজ, ১৮৮২ সালে বঙ্গবাসী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। ঠিক এমনিভাবে বর্ধমান রাজ কলেজ, হেতমপুর কলেজ স্থাপিত হল। একই সময়ে (১৮৭৬) ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞান চর্চার জন্য একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন

করলেন। এসব কিছুর মূলে রয়েছে ঔপনিবেশিকতার গণ্ডীকে ভেদ করার এক বলিষ্ঠ চেতনা। উচ্চ শিক্ষা সাম্রাজ্যবাদের দান নয়, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গভীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উপনিবেশের মানুষকে সবকিছু অর্জন করতে হয়েছে।

৪

এর পরের অধ্যায়টি হল, কার্জনীয় যুগ। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি। স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্টে বলা হল—'নূতন আইনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পূর্ণমাত্রায় সরকাবী বিশ্ববিদ্যালয়।' 'The Indian Universities under the new Act were the most completly governmental universities in the world'. কার্জন সাহেব মূল জায়গাটি ধরলেন, বিশ্ববিদ্যালয়েব হাতে রইল প্রবেশিকা থেকে শুরু কবে এম এ পর্যন্ত পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যবই নির্বাচনের অধিকার। কার্জন শিক্ষক ও ছাত্রের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলেন, 'বিপজ্জনক' চিন্তা থেকে ছাত্রদের দূরে রাখতে বদ্ধপরিকব হলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্যসূচী থেকে ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ানো উঠিয়ে দেওয়া হল। ১৯০১ সালেব বি এ পরীক্ষার পাঠ্যসূচীতে বার্ক-এর ফরাসী বিপ্লব পাঠ্য ছিল, কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে লিখে পাঠালেন, 'harmful even to some young English readers and it is certainly dangerous food for Indian students.' ('ইংরেজ ছাত্রদের পক্ষেই ক্ষতিকর; ভারতীয় ছাত্রদের পক্ষে বিপজ্জনক খাদ্য'।)

অনুরূপভাবে কার্লাইলের 'ফরাসী বিপ্লব', বাইরণের 'চাইল্ড হ্যারল্ড', বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী বহির্ভূত অস্পৃশ্য বলে গণ্য হল। ভয় ছিল, ইতিহাসের অধ্যাপক অতি সহজে 'রাজদ্রোহ' ছাত্রদের মধ্যে প্রচার করতে পারেন। অন্যদিকে লি-ওয়ার্ণারের 'সিটিযেন অফ ইণ্ডিয়া', এন. এন. ঘোষের 'ভারতে ইংলণ্ডের কাজ', মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছাত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করতে হবে।

১৮৭৮ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরের 'স্টেটসম্যানে' প্রকাশিত হল, জনৈক স্মিথ

সাহেবের প্রতি দুইটি ছাত্রের 'অসৌজন্য' দেখানোর অপরাধে এক কলমের খোঁচায় নড়াইল স্কুলের সরকারী অনুদান ১ মার্চ, ১৮৭৮ থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।

১৮৯৮ সালের ৪ মার্চের 'স্টেটসম্যানে' প্রকাশিত হল, আহম্মদ নগরের কয়েকজন শিক্ষক শিবাজী উৎসবে যোগদান করেন, এই অভিযোগে তিনজন শিক্ষককে কর্মচ্যুত করা হয়েছে, কারণ যিনি শিক্ষক তাঁকে রাজনীতির সংশ্রব থেকে দূরে থাকতে হবে।

১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের জন্য আব্দুল রসুল, কাশীপ্রসাদ জয়স্বাল, আব্দুল্লা সুরাহবর্দীকে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন কিন্তু সরকার রাজনৈতিক কারণে এই নিয়োগ নাকচ করে দেন। আব্দুল্লা সুরাহবর্দী পূর্বেই অধ্যাপক নিযুক্ত থাকায় তাঁর চাকুরীটি রক্ষা পায়।

চন্দননগর কলেজের অধ্যাপক চারু রায় স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করায়, ফরাসী সরকার ১৯০৮ সালে কলেজটি বন্ধ করে দেন; দীর্ঘ ২৩ বছর পরে ১৯৩১ সালে কলেজটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায়, ফরাসী সরকার ছাত্রদের রাজনীতিতে যোগদানের অজুহাতে ১৯০৮ সালে স্থানয় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেন; ১৯১৭ সালে পুনবায় উন্মুক্ত হয়।

১৯৪৪ সালে ডি পি আই বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের গবর্নিং বডিকে নির্দেশ দিলেন, যদি অধ্যাপিকা শান্তিসুধা ঘোষ, অধ্যাপক প্রফুল্লরঞ্জন চক্রবর্তী এবং শ্রীযুত সুধীরকুমার আইচকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত না করেন, তবে সরকারী সাহায্য (মাসিক ১২০০ টাকা) বন্ধ করে দেওয়া হবে।

শিক্ষক ও ছাত্র দমন এমনিভাবে ব্রিটিশ শাসনে চলেছে। এগুলি কয়েকটি মাত্র বিক্ষিপ্ত উদাহরণ। উচ্চ শিক্ষার প্রশ্নটি ক্রমশঃ জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনেব সঙ্গে মিলে গিয়েছে। উপনিবেশে উচ্চশিক্ষা কখনও মসৃণ রাজপথ দিয়ে বাহিত হয়ে আসে নি।

গ্রন্থসূচী :

১) **Hundred Years of the University of Calcutta.**
২) **Narendra Krishna Sinha : Asutosh Mookerjee.**
৩) **Boman-Behram : Educational Controversies in India.**
৪) বিনয় ঘোষ : বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, ৩য় খণ্ড.
৫) **Krishnath College Centenary Commemoration Volume.**
৬) **Aparna Basu : Growth of Education and Political Development in India (1898-1920).**
৭) **K. Marx—Future Results of British Rule in India.**

উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণ ও যুগ চেতনা

দীপিকা বসু

উনিশ শতকের বাঙলার জাগরণের ঐতিহাসিক মূল্যটিব—তার প্রগতিশীল ভূমিকার যথার্থ মূল্যায়ন করতে হলে—আধুনিক মানসিকতার রঙে রাঙিয়ে নয়, যুগেব মাপকাঠিতে এর বিচার করতে হবে। সমকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যদি আমরা স্মরণ করি এবং সেই আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের পটভূমিতে উনিশ শতকের এই আন্দোলনের যাঁরা প্রতিনিধি তাঁদের দৃষ্টি-ভঙ্গীটি বিচার করি তাহলে এই আন্দোলন যে যুগেব বিচারে নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল সেবিষয়ে বোধহয় দ্বিমতের কোন অবকাশ থাকে না। প্রচলিত ধারণা, অন্ধ কুসংস্কারের বেড়াজালকে ভেদ করে সেই যুগের অগ্রসর চেতনাকে তাঁরা হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন আর সেই চেতনাকে তাঁরা সঞ্চারিত করেছিলেন দেশের মাটিতে।

ইওরোপে তখন চলছিল এক প্রগতিশীল বিপ্লবী আন্দোলনেব জোয়ার—যে আন্দোলনেব পুরোভাগে ছিল উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী। লক্ষ্য ছিল মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র ও স্বৈবাচারের অচলায়তনকে চূর্ণ করে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শে ইওরোপকে সঞ্জীবিত করা। এই যুগ ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণের যুগ। সমাজ বিকাশের নিয়মে যা ছিল নিঃসন্দেহে উন্নততর ধাপ। এই বৈপ্লবিক উত্তরণের মানসভূমি বচনা করেছিল পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রেনেসাঁস, রিফরমেশন ও এনলাইটেনমেণ্ট আন্দোলন। মধ্যযুগীয় অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারকে অতিক্রম করে, পোপ ও প্রচলিত ধর্ম ব্যবস্থার দুর্নীতি ও স্বৈরাচারকে উপেক্ষা করে বিজ্ঞান ও যুক্তি-সম্মত নতুন জ্ঞানের দীপ্তিতে সমগ্র ইওরোপ তখন উদ্ভাসিত, এক নতুন যুগের উদ্বোধনের জন্য সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ।

আন্তর্জাতিক এই পটভূমিতেই উনিশ শতকের বাঙলাদেশে নব জাগরণ আন্দোলনের সূচনা। এই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিল ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় যাঁরা এই যুগধর্মকেই হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন এবং এদেশের যুগসঞ্চিত কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেদ করে ইওরোপের যুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞান-ভিত্তিক, মানবতার মাহাত্ম্যে প্রোজ্জ্বল মুক্ত চিন্তাকে, স্বৈরাচারের বদলে গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শকে এদেশে প্রবাহিত করতে ব্রতী হয়েছিলেন। বলা যায় এই আন্দোলনের পথিকৃৎ ছিলেন রামমোহন আর এই আন্দোলনকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ডিরোজিওর শিষ্য ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়। তাঁরা সঠিকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে এই কাজটি সম্পন্ন করতে না পারলে জাতির পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়।

রামমোহনের জন্ম শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রামমোহনকে ভারতের আধুনিক যুগের উদ্গাতা বলে উল্লেখ করেছিলেন।(১) রামমোহন ছিলেন মানবতার পূজারী কিন্তু সেই মানবতা খণ্ডিত নয়, দেশের জাতির সংকীর্ণ সীমারেখায় আবদ্ধ নয়। মানবতাকে তিনি তার সমগ্রতায় বিশ্বব্যাপী পরিসরে অবলোকন করেছেন। তাই মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনকে ভেদ করে ইওরোপে নতুন ভাবধারার জয়যাত্রা তাঁকে অভিভূত করেছে। ইওরোপে সাহিত্যের বিকাশ, জ্ঞানের সম্প্রসারণ, যন্ত্রের নিখুঁত ব্যবহার, রাজনীতির অগ্রগতি, উন্নত ও বিলাসবহুল জীবনের সমস্ত প্রলোভন সত্ত্বেও নৈতিক কর্তব্যগুলির প্রতি নিষ্ঠা—তাঁর মনে সমকালীন ইওরোপের অগ্রগতি সম্পর্কে গভীর প্রত্যয়ের সৃষ্টি করেছিল।(২)

ইওরোপের দুই যুগান্তকারী আন্দোলন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও প্রথম ফরাসী বিপ্লব তাঁর মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছিল। মানব স্বাধীনতার উৎসভূমি ইওরোপের ভাষা, সাহিত্য, দর্শন গভীরভাবে অনুশীলন করার আর ইওরোপের এই জ্ঞানদীপ্তিকে হৃদয়ে গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল প্রবল। মিশনারীরা যখন আধুনিক ইওরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে দেখেছিলেন শুধু খ্রীষ্ট ধর্মের ঐতিহ্যকে, রামমোহন এই সভ্যতার অন্য ভিত্তিটিকে উপলব্ধি করেছিলেন—যে ভিত্তি হল বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক। এই ভিত্তিটিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইওরোপে বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় এবং এই বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানকে কলা, শিল্প ও যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগে, যার দ্বারা মানুষ প্রকৃতির উপর তার ক্ষমতা ও শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল।(৩)

ইওরোপের এই নতুন মুক্তমনের চিন্তার যাঁরা জনক—বেকন, নিউটন, টম পেইন, হিউম, বেন্থাম, লক, ভলতেয়ার—তাঁর মনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। পাশ্চাত্যের এই যুক্তিবাদী প্রগতিশীল চিন্তাধারায় অবগাহন করেই রামমোহন এদেশের যুগসঞ্চিত কুসংস্কার, সামন্ততান্ত্রিক অন্ধ অনুশাসন, জাতিভেদ, কৌলীন্য প্রথা, নারী নির্যাতন, সতীদাহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করলেন। আবার, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য তাঁকে যেমন আনন্দ দিয়েছে তেমনি আবার সেই আন্দোলন স্বৈরাচারের কশাঘাতে যখন পরাজিত হয়েছে তখন সেই পরাজয়কে নিজের পরাজয়, সমগ্র মানবতার পরাজয় বলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। বিশ্বের সঙ্গে এই যে আত্মীয়তাবোধ—রবীন্দ্রনাথ তাকেই আধুনিকতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন বলে মনে করেছেন।(৪)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যখন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে এদেশে সীমাবদ্ধভাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের কথা চিন্তা করেছেন, তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রামমোহন এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের দাবী জানিয়েছেন। ইংরেজী ভাষাকে তিনি পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল ভাবধারার বাহন রূপে দেখেছেন। তিনি মনে করেছেন যে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবাসী পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে এবং তার ফলেই ভারতের পুনর্জাগরণ সম্ভব হবে।

শিক্ষার মাধ্যম ও পাঠক্রম সম্পর্কে ১৮২৩ সালে লর্ড আমহার্স্টের কাছে লেখা চিঠিতে রামমোহনের এই চিন্তায় প্রকাশ খুবই পরিষ্কার। শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সরকারী অর্থ সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ব্যয় করার নীতির প্রতিবাদ করে তিনি লিখলেন যে এই শিক্ষার দ্বারা দেশের মানুষের কোন অগ্রগতি সম্ভব নয়। এই শিক্ষা হাজার বছরের পুরনো জ্ঞানের গণ্ডীর মধ্যেই তাদের মনকে আবদ্ধ করে রাখবে এবং অর্থহীন ব্যাকরণের কচকচি আর অধিবিদ্যার আলোচনাতেই শিক্ষাকে ভারাক্রান্ত করে তুলবে। পাশ্চাত্যের জ্ঞান, বিজ্ঞান শিক্ষাকে এদেশে প্রচলন করার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বললেন যে ব্রিটেনে যেমন মধ্যযুগীয় পুরনো জীবনদর্শন বর্জন করে বেকনের নতুন জীবনদর্শন প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল, ঠিক তেমনি ভারতেরও প্রয়োজন মধ্যযুগীয় চিন্তাকে বর্জন করে নতুন জ্ঞান অর্জন করা। নেতিবাদী ভারতীয় দর্শনের বদলে তিনি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক শিক্ষা

প্রচলনের দাবী করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি গণিত, প্রাকৃতিক দর্শন, রসায়ণ বিদ্যা, শরীর বিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রবর্তনের সুপারিশ করলেন।(৫) লক্ষণীয় যে মেকলে যখন ১৮৩৫ সালে তাঁর বিখ্যাত মিনিটে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, রামমোহন তার বার বছর আগে প্রথম পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের দাবী জানালেন।

মানব স্বাধীনতার আদর্শের প্রতিও রামমোহনের সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে বারবার। এখানেও তিনি দেশ ও জাতির গণ্ডীকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিশ্বের যে কোন প্রান্তে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, দমন পীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের আন্দোলনকে তিনি অভিবাদন জানিয়েছেন। ঊনিশ শতকের প্রথম পর্বে ফ্রান্স, স্পেন, নেপলস্, পর্তুগাল, ইতালি, জার্মানী প্রভৃতি দেশে যেখানেই গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল রামমোহন তাকেই সমর্থন জানিয়েছেন।

১৮৩২ সালে সংস্কার বিলকে কেন্দ্র করে যখন ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে প্রচণ্ড বিতর্কের ঝড় উঠেছিল এবং দেশব্যাপী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল তখন রামমোহন সেই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছেন এবং সর্বান্তঃকরণে সংস্কার বিলের সাফল্য কামনা করেছেন। তাঁর মনে হয়েছে এই আন্দোলন শুধু ইংরেজদের নয় সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত। বন্ধু মিসেস উডফোর্ডের কাছে লেখা চিঠিতে(৬) তাঁর আবেগ প্রকাশ করে তিনি লিখলেন- 'এই সংগ্রাম কেবলমাত্র সংস্কারপন্থী ও সংস্কারবিরোধীদের মধ্যে নয়, পরন্তু এই সংগ্রামে একদিকে রয়েছে স্বাধীনতা আর অপরদিকে রয়েছে দমন-পীড়ন ও স্বৈরাচার। এই সংগ্রাম ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে। তিনি দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন যে রাজনীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসক ও ধর্মান্ধদের সমস্ত বিরোধিতা ও একগুঁয়েমী উপেক্ষা করে সর্বত্রই উদারনীতি জয়যুক্ত হচ্ছে। এই সংস্কার বিলের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে তিনি মিঃ উইলিয়াম র‍্যাথবোনকে লিখলেন(৭) যে অভিজাত শ্রেণীর বিরাট প্রতিপক্ষতা ও রাজনৈতিক সুবিধাবাদ সত্ত্বেও সংস্কার বিল আন্দোলন যে সম্পূর্ণ সফল হয়েছে এতে আমি অতীব আনন্দিত। তাঁর মতে জনসাধারণকে সর্বস্বান্ত করে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ধনী হয়ে উঠবে—একটা জাতি বেশিদিন তা

সহ্য করতে পারে না। তিনি শপথ করেছিলেন যে যদি সংস্কার বিল পরাজিত হয় তিনি ইংলণ্ডের সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করবেন।

ইংলণ্ডে যাওয়ার পরে রামমোহন যথেষ্ট সমাদর পান। বিশেষ করে দার্শনিক বেন্থামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বেন্থাম দীর্ঘদিন কোন আগন্তুকের সঙ্গে দেখা করেন নি, কিন্তু রামমোহনের সঙ্গে তিনি দেখা করেন এবং উভয়ের মধ্যে তত্ত্ব আলোচনা হয়। বেন্থাম রামমোহন সম্পর্কে মন্তব্য করলেন যে তিনি সাড়ে তিন কোটি দেবদেবীকে অস্বীকার করেছেন এবং ইওরোপের কাছ থেকে যুক্তির প্রয়োগ শিক্ষা করেছেন। এই ভারতীয়কে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বললেন—রামমোহন 'মানবতার সেবায় নিযুক্ত, বিশেষভাবে প্রশংসাযোগ্য ও একান্ত প্রিয় সহযোগী।'(৮) এমন কি বেন্থাম ইংলণ্ডের নতুন পার্লামেন্টের আসন্ন নির্বাচনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য রামমোহনকে প্রার্থী করতে উদ্যোগী হন।(৯) অন্যান্য যেসব উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি রামমোহনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রবার্ট ওয়েন, যিনি ছিলেন ব্রিটেনে সমাজতান্ত্রিক চিন্তার প্রথম উদ্গাতা।(১০)

ফরাসী বিপ্লব সম্পর্কে রামমোহনের ছিল গভীর সহানুভূতি। দীর্ঘদিন ধরেই রামমোহন 'প্রকৃতির আনুকূল্যপুষ্ট, বিজ্ঞান ও কলার চর্চায় সমৃদ্ধ এবং সর্বোপরি একটি স্বাধীন সংবিধানের অধিকারী' এই দেশ দর্শনের ইচ্ছা পোষণ করতেন। জন ডিগবির লেখা থেকে জানা যায় নেপোলিয়ন যখন 'বিপ্লবের সন্তান' হিসাবে সাম্য মৈত্রীর বাণী নিয়ে আবির্ভূত হলেন, রামমোহন তাঁর শক্তিমত্তায় আকৃষ্ট হয়েছেন। আবার যখন নেপোলিয়ন নিছক স্বৈরাচারীতে রূপান্তরিত হলেন, যখন তাঁর হাতে জনগণের অধিকার ভূলুণ্ঠিত হল তখন নেপোলিয়ন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব বিরূপ হয়ে উঠেছে।(১১)

১৮৩০ সালের ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যকে তিনি স্বাধীনতার আদর্শের সাফল্য বলে মনে করেছেন।(১২)

ইণ্ডিয়া বোর্ডের সম্পাদক মিঃ হাইড ভিলিয়ার্সকে লিখিত পত্রে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি জানালেন যে তিনি হলেন এক পরিব্রাজক এবং উদারনীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ফরাসী জাতির সঙ্গে তিনি একাত্ম।(১৩)

ফরাসী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে লিখিত পত্রে তিনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

ও মানুষে মানুষে মৈত্রীর আদর্শের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ফ্রান্সকে তিনি পৃথিবীর স্বাধীন ও উন্নত দেশগুলির প্রথম সারির দেশ বলে শ্রদ্ধা জানালেন। তাঁর মতে সমগ্র মানবজাতি হল এক বিশাল পরিবার আর বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী হল তারই শাখা প্রশাখা। সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণের কথা মনে রেখে, সবরকমের প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটিয়ে, মানুষে মানুষে সহযোগিতার পথকে সুগম করে তোলাই আলোকপ্রাপ্ত সব মানুষের অভিপ্রায় বলে তিনি মনে করেছেন। এখানে লক্ষ্যণীয় যে রামমোহন সমস্ত জাতির মধ্যে সম্প্রীতি ও মৈত্রীর আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য একটি 'জাতিসংঘ' গঠনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রস্তাব হল সমস্ত দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 'কংগ্রেস' গঠন করা হোক—যেখানে সংবিধানসম্মত সরকার—বিশিষ্ট সভ্য দেশগুলি তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক সব বিরোধ মীমাংসার জন্য পেশ করবে এবং শান্তিপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে সেইসব বিরোধের মীমাংসার ফলে জাতিতে জাতিতে যুগ যুগ ধরে শান্তি ও মৈত্রী বজায় থাকবে।(১৪)

১৮৩০ সালের ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব যখন ইওরোপের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল এবং ইওরোপের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠল রামমোহনও সেই আন্দোলনের স্রোতধারার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন। কথিত আছে যে ১৮২৩ সালে স্পেনে সংবিধানসম্মত এক সরকার প্রতিষ্ঠার সংবাদে উল্লসিত হয়ে তিনি টাউন হলে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। কেন তাঁর এই উল্লাস—এই প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন বলেছিলেন যে পৃথিবীর যেখানেই হোক, ধর্ম ও ভাষাগত যত পার্থক্যই থাকুক, আমার সমগোত্রীয়রা নিপীড়িত হলে আমি কি করে উদাসীন থাকব?(১৫) উদারনীতির সমর্থক স্পেনের দেশপ্রেমিকেরাও রামমোহনের এই সহানুভূতির স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮১২ সালে প্রবর্তিত নতুন সংবিধানের একটি কপি 'সবচেয়ে মুক্তমন, সদাশয়, বিজ্ঞ ও ধর্মপ্রাণ রামমোহন রায়কে' উপহার দেন।(১৬)

মিঃ উডফোর্ডের কাছে লিখিত এক চিঠিতে দেখা যায় যে পর্তুগালের বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রগতিতেও রামমোহন আনন্দপ্রকাশ করেছেন।(১৭) তুর্কীদের বিরুদ্ধে গ্রীসের জনগণের আন্দোলনেও তাঁর শুভেচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর প্রধান অনুগামী দ্বারকানাথ ঠাকুর গ্রীসের অস্থায়ী

সরকারের আহ্বানে গ্রীস সরকারের সাহায্য তহবিলে ১০০ টাকা দান করেন।(১৮)

বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা তাঁর যে কত আন্তরিক ছিল নেপলসের ঘটনাবলীতে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া থেকে তা একেবারে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। নেপলসের জনগণ যখন স্বৈরাচারী রাজার কাছ থেকে একটি সংবিধান আদায় করতে সমর্থ হয়েও রাশিয়া, প্রাশিয়া, অষ্ট্রিয়া সার্ডিনিয়া ও নেপলসের রাজশক্তির যৌথ উদ্যোগে, অষ্ট্রিয়ার সৈন্যবাহিনীর হাতে পরাজয় বরণ করল, তখন রামমোহন অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন। মিঃ বাকিংহামের কাছে লেখা চিঠিতে আক্ষেপ করে বলেছেন যে হয়ত তাঁর জীবনকালে তিনি ইওরোপের সমস্ত জাতিদের মধ্যে স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা আর এশীয় জাতিদের বিশেষ করে যারা ইওরোপের উপনিবেশ তাদের ক্ষেত্রে আরও সুযোগ ও সুবিধার প্রসার দেখতে পাবেন না।(১৯) তিনি বললেন নেপলসের জনগণের পরাজয় তাঁর নিজের পরাজয়। আবার সঙ্গে সঙ্গে এই বিশ্বাসও ঘোষণা করলেন যে জনগণের এই পরাজয় সাময়িক—'স্বাধীনতার যারা শত্রু, স্বেচ্ছাতন্ত্রের যারা মিত্র তারা কখনও জয়ী হয় নি—কখনও শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না।'(২০)

স্পেনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশগুলির বিদ্রোহের সাফল্য দেখেও রামমোহন বিশেষ আনন্দিত হয়েছেন। ১৮২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এডিনবরা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত রামমোহনের এক ইংরেজ বন্ধুর চিঠিতে লেখা হয়েছিল যে দক্ষিণ আমেরিকার মুক্তি আন্দোলনের অগ্রগতিতে রামমোহনের গভীর আগ্রহ তাঁর মনের মহত্ব ও উদারতারই পরিচায়ক। লেখকের মতে স্পেনের ঘৃণ্য বর্বরতার কথা শুনেই তাঁর মনে এই আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল।(২১)

ব্রিটিশ শাসনের সভ্যতা বিকীরণকারী ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট মোহ থাকলেও ইংলণ্ডের প্রোটেস্ট্যান্ট শাসকগোষ্ঠী আয়ার্ল্যাণ্ডে ধর্মের নামে ক্যাথলিক প্রজাদের উপর যে নিপীড়ন চালাচ্ছিল তা রামমোহনকে ক্ষুব্ধ করেছে। তিনি তাঁর পার্শিয়ান সাপ্তাহিক মিরাট-উল-আকবরে 'আয়ার্ল্যাণ্ড, তার দুর্দশা ও অসন্তোষের কারণ' শীর্ষক প্রবন্ধে অন্যায়ভাবে আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্যাথলিক জনগণকে শোষণ করা রাজস্ব দিয়ে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মযাজকদের স্বার্থ সাধন করার এবং এইভাবে আয়ার্ল্যাণ্ডের অর্থ দেশের বাইরে ব্যয় করার

সমালোচনা করেছেন।(২২) রবার্ট রিকার্ডস-এর কাছে লেখা এক চিঠিতে জানা যায় যে রামমোহন আয়ার্ল্যাণ্ডের অবস্থা সম্পর্কিত একখানি পুস্তক তার কাছ থেকে নিয়ে পাঠ করেন। আয়ার্ল্যাণ্ডের এই দুর্দশা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই ক্যাথলিকদের মুক্তির দাবীকে সমর্থন জানান ছাড়া আর কোন পথ নেই।(২৩)

এই সময় আয়ার্ল্যাণ্ডে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হলে বুভুক্ষু জনগণের সাহায্যের জন্য রামমোহন ইওরোপীয় ও ভারতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে চাঁদা সংগ্রহ করে তাঁর সক্রিয় সহানুভূতির পরিচয় দেন। তাঁর এই সহমর্মিতার কথা আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী দীর্ঘদিন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বার্থে যে O' Connell Testimonial Fund গঠন করা হয় তার ভারতীয় কমিটির রামমোহনই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় সদস্য।(২৪)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোরাও তাদের মুক্তির দাবীতে সোচ্চার হয়ে ওঠে। ১৮৩১ সালে আহূত তাদের এক সম্মেলনে এক বক্তা বক্তব্যের শেষে সমকালীন মানবসমাজে শ্বেতাঙ্গ না হয়েও সবচেয়ে জ্ঞানদীপ্ত ও সদাশয় ব্যক্তি হিসেবে রামমোহনের নাম উল্লেখ করেন।(২৫)

অবশ্য, রামমোহন সমাজের কোন বৈপ্লবিক আমূল পরিবর্তনের কথা বলেন নি অথবা এদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদও তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। তবে পৃথিবীর নানা প্রান্তে স্বৈরাচার অনাচারের বিরুদ্ধে, মানব মর্যাদা ও অধিকার রক্ষার সংগ্রামে তাঁর সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে। এইভাবে রামমোহন যে ঐতিহ্যের সূচনা করলেন, যে যুগচেতনা ও আন্তর্জাতিক চেতনার সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় ঘটালেন তাকেই আরও অগ্রসর করে নিয়ে গেলেন ডিরোজিওর শিষ্য ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়।

ডিরোজিও নিজে ছিলেন ইওরোপের বস্তুবাদী জীবন দর্শনে বিশ্বাসী। টম পেইন, হিউম, গিবনের চিন্তা ডিরোজিওকে সংশয়বাদী করে তুলেছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহ্যেও তাঁর ছিল সুগভীর আস্থা। ডিরোজিওর বস্তুবাদী ভাবধারা, প্রগতিশীল চিন্তা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। বেকন, টম পেইন, লক, হিউম, বেন্থামের চিন্তাধারায় ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় ছিল উদ্দীপ্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিপ্লবী ইওরোপে হিউম পুরোহিততন্ত্র, রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে আঘাত

করেছিলেন। হিউমের আদর্শে দীক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ও যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।

ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল টম পেইনের 'এজ অফ রীজন।' আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লবকে পেইনের চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রচলিত ধর্মব্যবস্থা যা ছিল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের সহায়ক তার বিরুদ্ধেও পেইনের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল।

পেইন ছিলেন মানব স্বাধীনতার প্রবক্তা। ঔপনিবেশিক শাসন যেভাবে মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছিল তা পেইনকে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ঘোরতর বিরোধী করে তুলেছিল। ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্লজ্জ শোষণকে তিনি বারে বারে ধিক্কার জানিয়েছেন।* তিনি উপনিবেশবাদকে সমগ্র বিশ্বের সামনে উপস্থিত এক গুরুতর সমস্যা বলে মনে করেছেন।(২৬)

পেইনের 'এজ অফ রীজন' হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কাছে অতি আদরের বস্তু হয়ে উঠেছিল। এই গ্রন্থের জন্য হিন্দু কলেজের কোন কোন ছাত্র ৮ টাকা পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন। সমাচার দর্পণে (জুলাই ১৮৩২) লেখা হয়েছে—'আমরা খবর পেলাম কিছুদিন আগে পেইনের অনেকগুলি বই, কমপক্ষে একশো খানি হবে আমেরিকা থেকে বিক্রীর জন্য কলকাতায় পাঠান হয়। জনৈক স্থানীয় পুস্তক ব্যবসায়ী ভাল বিক্রির আশা নেই ভেবে বইখানির মাত্র ১ টাকা মূল্য ধার্য করেন। কয়েকখানি বই এই দামে বিক্রি হয়। এই বইগুলি ইংরেজী শিক্ষিত যুবকদের হাতে পড়ে এবং ক্রমশঃ এই বই কেনার জন্য দারুণ আগ্রহ দেখা দেয়। পুস্তক ব্যবসায়ী অবিলম্বে বইখানির দাম ৫ টাকা করেন। আমরা অবগত হলাম এই চড়া মূল্যেও তাঁর মজুত সমস্ত বই কয়েকদিনের মধ্যে দেশীয়দের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। ক্রেতাদের মধ্যে একজন 'এজ অফ রীজনের' একটি অংশ বাংলায় অনুবাদ করতে ও 'ভাস্কর'-এ তা প্রকাশ করতে অগ্রসর হন।'(২৭)

* পেইন বলেছেন—'For the domestic happiness of Britain and the peace of the world, I wish she had not a foot of land but what is circumscribed within her own island. Extent of dominion has been her ruin and instead of civilizing others has brutalized herself.'

স্বাধীন মতামত বিনিময়ের জন্য ডিরোজিও যে 'একাডেমিক এসোসিয়েশন' স্থাপন করলেন সেই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন রসিককৃষ্ণ মল্লিক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ আর শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকতেন রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি। ঐ সভার প্রত্যক্ষদর্শী আলেকজাণ্ডার ডাফের বিবরণ থেকে সভার সভ্যদের উপর পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাব কতটা পড়েছিল তা খুব পরিষ্কারভাবে জানা যায়। তিনি লিখেছেন যে, সভায় যে মনোভাব ব্যক্ত করা হত তার সমর্থনে ইংরেজী লেখকদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হত। ইতিহাসের বিষয় হলে রবার্টসন ও গিবনকে স্মরণ করা হত, রাজনীতির বিষয়ে অ্যাডাম স্মিথ ও জেরেমী বেন্থাম, বিজ্ঞান বিষয়ে নিউটন ও ডেভী, ধর্ম বিষয়ে হিউম ও টমাস পেইন, অধিবিদ্যার বিষয়ে লক, রীড, স্টুয়ার্ট ও ব্রাউন। সমগ্র আলোচনার মাঝে মাঝেই জনপ্রিয় ইংরেজ কবি, বিশেষ করে বায়রণ ও ওয়াল্টার স্কটের কবিতার আবৃত্তি দিয়ে আলোচনাকে সঞ্জীবিত করা হত আর একাধিকবার আমার কানে রবার্ট বার্ণসের স্কচ কবিতার পংক্তি ধ্বনিত হত।(২৮)

রাজনীতির জ্ঞানেও হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ছিল অগ্রসর—বেন্থামের চিন্তার অনুগামী। অর্থনীতির ক্ষেত্রে অ্যাডাম স্মিথের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁরা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। মনোবিজ্ঞানও তাদের কাছে ছিল খুব প্রিয়। ডঃ রীড, দুগাল্ড স্টুয়ার্ট ও টমাস ব্রাউনের দর্শন—যা বেকনীয় দর্শনেরই অনুরূপ, তাদের কাছে খুবই মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছিল।(২৯)

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনার প্রতি আগ্রহের নিদর্শনস্বরূপ ১৮৩৩ সালে তাঁরা প্রকাশ করলেন 'বিজ্ঞান সার সংগ্রহ'—বিজ্ঞান বিষয়ে দ্বিভাষী এক মাসিক পত্রিকা। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশনার লক্ষ্য ঘোষণা করে বলা হল—ইওরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান থেকে সার সংকলন করে এদেশীয়দের কাছে উপস্থিত করা হবে যা তাদের নৈতিক চেতনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে এবং মানবসমাজের সুখ ও গৌরব বর্ধনের জন্য তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি করবে।(৩০)

হিউম, টম পেইনের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ, বায়রণ, বার্ণসের কবিতার মুগ্ধ পাঠক ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় যে স্বৈরাচার অনাচারের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবেন, যুগের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করবেন, তা খুবই স্বাভাবিক। ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের শিক্ষাগুরু ডিরোজিও

ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী। তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে গ্রীকদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে তিনি 'গ্রীকস অ্যাট ম্যারাথন' নামে এক কবিতা রচনা করেন।(৩১)

ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ সম্পর্কে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের ছিল গভীর সহানুভূতি। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন, ' ফরাসী বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গ সকল ভারতক্ষেত্রেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ১৮২৮ সালে যাঁহারা শিক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন ও যে যে কবি ও গ্রন্থকারের গ্রন্থাবলী অধীত হইত, সেই সকল শিক্ষকের মন ও উক্ত গ্রন্থাবলী ফরাসী বিপ্লবজনিত স্বাধীনতা প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গীয় যুবকগণ যখন ঐ সকল শিক্ষকের চরণে বসিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন এবং ঐ সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন তখন তাহাদের মনে এক নব আকাঙ্ক্ষা জাগিতে লাগিল। ··ফরাসী বিপ্লবের এই আবেগ বহুবৎসর ধরিয়া বঙ্গ সমাজে কার্য করিয়াছে।'(৩২)

দ্বিতীয় ফরাসী বিপ্লবের সাফল্যও তাদের বিশেষ উৎসাহিত করেছিল। ১৮৩০ সালের ১০ ডিসেম্বর বাঙলাদেশে ফরাসী জাহাজের এক কমাণ্ডার এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করেন। দুইশত ব্যক্তি ঐ ভোজসভায় যোগদান করেন। তাদের মধ্যে বাঙলাদেশের প্রগতিশীল কিছু যুবকও ছিলেন বলে জানা যায়। জনবুল পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে Asiatic Intelligence-এ লেখা হয়েছে যে ফরাসী ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা কলকাতার মানুষের কাছে এতই প্রিয় ছিল যে বড়দিনের দিন অক্টারলোনী মনুমেন্টের উপর ইংরেজ পতাকার সঙ্গে ফরাসী ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকাও উত্তোলন করা হয়।(৩৩)

ফরাসী বিপ্লবী জীবনদর্শনের প্রতি এই আগ্রহ পরবর্তীকালের ছাত্রদের মধ্যেও অম্লান ছিল। হিন্দু কলেজের কিছু ছাত্র ভারতবর্ষেও ফরাসী বিপ্লবের অনুরূপ এক বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে কিনা—এ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে Bengal Harkaru-তে 'Old Hindoo' ছদ্মনামে প্রকাশিত ভারতবর্ষের বিক্ষোভ সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলিতে এই চেতনার প্রকাশ মেলে। এই প্রবন্ধগুলি হিন্দু কলেজের কোন ছাত্রের লেখা বলে অনুমান করা ভুল হবে না। প্রবন্ধগুলিতে আশা প্রকাশ করা হয়েছিল যে এদেশীয়রাও ফরাসী বিপ্লবের আশীর্বাদ উপভোগ করতে পারলে এতদিনে তারা মানুষের মত ব্যবহার লাভ করত ও পৃথিবীর জাতিগুলির মধ্যে যথার্থ স্থানগ্রহণ করতে

পারত। Friend of India এই মনোভাবকে বাগাড়ম্বর বলে উপহাস করে।(৪)

এদেশের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে ১৮৪১ সালে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'দেশ হিতৈষিণী সভা'। এই উদ্দেশ্যে আহূত এক সভায় ডিরোজিওর ছাত্র সারদাপ্রসাদ ঘোষ যে বক্তব্য রাখেন তাতে এই যুগচেতনা ও আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের প্রভাব সুস্পষ্ট। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শ উদঘাটিত হয়েছিল—সারদাপ্রসাদের বক্তৃতার ছত্রে ছত্রে তার প্রেরণা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে।(৩৫)

সমসাময়িক গল্প-উপন্যাসের মধ্যেও রয়েছে এই যুগচেতনারই অনুপ্রেরণা। প্রসঙ্গতঃ হিন্দু কলেজের ছাত্র কৈলাসচন্দ্র দত্তের লেখা গল্প* 'এ জর্নাল অব ফর্টি এইট আওয়ারস অব দি ইয়ার ১৯৪৫' আর তারই জ্ঞাতি শশীচন্দ্র দত্তের লেখা গল্প 'দি রিপাবলিক অব ওড়িশা: অ্যানালস্ ফ্রম দি পেজেস অব টয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী'—এই গল্প দুটির উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না।(৩৬) দুটি গল্পেরই বিষয়বস্তু হল ব্রিটিশ স্বৈরাচারী শাসনের অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সশস্ত্র বিদ্রোহ। সশস্ত্র বিদ্রোহের এই কল্পনার রূপায়ণে ইয়ং বেঙ্গলের প্রিয় কবি টমাস ক্যাম্পবেল ও বায়রণের প্রভাব পড়েছে বলে মনে করা অসঙ্গত নয়।** তবে বোধ করি ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবই সর্বাগ্রগণ্য। ইয়ং বেঙ্গলের মানসলোকে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর ও সক্রিয়। প্রথম গল্পটির শেষ দৃশ্যে যেভাবে খড়্গাঘাতে বিদ্রোহীদের প্রাণনাশ করা হয়েছিল সেখানে 'এ টেল অব টু সিটীজ্' এর গিলোটিন দৃশ্যগুলির ছায়াপাত ঘটেছে বলে অনুমান করা যায়।

উপনিবেশ বিস্তার ও ঔপনিবেশিক নীতি বিভিন্ন দেশে যে দুর্দশার সৃষ্টি করে সেই সম্পর্কেও উন্নত চেতনা ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' প্রকাশিত এক প্রবন্ধে হিন্দু কলেজের এক ছাত্র

* প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৮৩৫ সালে—**The Calcutta Literary Gazette**-এ আর দ্বিতীয় গল্পটির প্রকাশ ১৮৪৫ সালে—**Saturday Evening Harkaru**-তে।

** টমাস ক্যাম্বেলের 'দি প্লেজার্স অব হোপ' (১৭৯৯) আর বায়রণের 'দি কার্স অব মিনার্ভা'—উভয় কাব্যেই ইংরেজ শাসনের নিপীড়ন থেকে ভারতবাসীর মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়া হয়েছে।

ঔপনিবেশিক নীতি ও তার ফলাফল সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা রাজনীতি সংক্রান্ত রচনায় এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেছে। ভারতে উপনিবেশ বিস্তার শীর্ষক ঐ প্রবন্ধে(৩৭) লেখক উপনিবেশের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে এশিয়া মাইনরে গ্রীকদের উপনিবেশ স্থাপন দিয়ে শুরু করেছেন এবং তারপর রোমের উপনিবেশসমূহের চরিত্র বর্ণনা করেছেন যেগুলি বিজিত জনগণকে রাজনৈতিক পরাধীনতায় আবদ্ধ রাখার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীনকালের উপনিবেশগুলিকে তিনি তিনভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) অত্যধিক জনবাহুল্যবশতঃ জনগণের একাংশকে দেশের বাইরে পাঠানর জন্য উপনিবেশ, (২) বিজিত জনগণকে দাসত্বে আবদ্ধ রাখার জন্য, আর (৩) বাণিজ্যিক উপনিবেশ। তৃতীয়শ্রেণীর মধ্যে তিনি ফেনেশীয় উপনিবেশকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

প্রাচীন যুগের উপনিবেশসমূহের শোষক চরিত্রটিকে তুলে ধরে তিনি আধুনিক কালের ঔপনিবেশিক নীতি বিশ্লেষণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে আয়ার্ল্যাণ্ডের ইংরেজ উপনিবেশের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীদের ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত করে অধিকৃত জমির ন্যায্য মূল্য থেকে তাদের কিভাবে বঞ্চিত করেছে। উত্তর আমেরিকা ও নিউ সাউথ ওয়েলসে উপনিবেশ স্থাপন সেখানকার দেশীয় জনগণের স্বার্থকে কিভাবে আঘাত করেছে তা দেখাতে গিয়ে লেখক ব্যঙ্গভরে মন্তব্য করেছেন যে ইওরোপের সদাশয় ব্যক্তিরা এইসব দেশের দুর্দশা লক্ষ্য করে তা মোচনের জন্য সেখানে রাম, জিন, ব্র্যাণ্ডি প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের প্রচলন করেছে আর ঐসব হতভাগ্য অসভ্য মানুষেরা কি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেই আশীর্বাদ গ্রহণ করেছে। লেখক হল্যাণ্ড ও স্পেনের ঔপনিবেশিক নীতিরও বিশ্লেষণ করেছেন এবং স্পেনের উপনিবেশ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে এইগুলি হল 'দমন পীড়ন ও নিষ্ঠুরতার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত।'

উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায়ের অন্যতম দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন যে 'বিদেশীরা অর্থ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই পরদেশ শাসন করে এবং কদাচই সেদেশের মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে।' তিনি ভারতের দারিদ্র্যকে এই বিদেশী শাসনের ফলশ্রুতি বলেই ব্যাখ্যা করেছেন।(৩৮)

এই একই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় দাসপ্রথা ও অন্যান্য

সামাজিক উৎপীড়নের বিরুদ্ধেও মত প্রকাশ করেছেন। আফ্রিকায় এই সময় যে দাস ব্যবসা চলত তাঁরা তার তীব্র নিন্দা করেন এবং মরিশাস দ্বীপে কুলি চালান দেওয়ার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ধ্বনিত করেন। সরকারী দপ্তরে কুলিদের বেগার খাটাবার যে প্রথা চালু ছিল, তাও ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত নিন্দনীয়।

ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন ইওরোপের উদারনৈতিক প্রগতিশীল বুর্জোয়া ভাবাদর্শকে। তাঁরা চেয়েছিলেন সেখানকার উন্নত বিজ্ঞান ও যুক্তিসম্মত জ্ঞানকে এদেশে বিস্তার করতে যার ফলে যুগ-সঞ্চিত অজ্ঞানতা, মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদতার অবসান ঘটিয়ে এদেশের পুনর্জাগরণ সম্ভব হবে। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে এই পুনর্জাগরণ ব্যতীত জাতির অগ্রগমন সম্ভব নয়। ইয়ং বেঙ্গল সম্পাদিত জ্ঞানান্বেষণের (১৮৩১-৪০) পাতায় পাতায় তাঁদের এই মানসিকতার সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। একাধিক প্রবন্ধের মধ্যে তাঁরা এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন যে ভারতীয় জনগণের উন্নয়নের একমাত্র পথ হল—মধ্যযুগীয় অজ্ঞানতা, অন্ধ কুসংস্কারের বদলে বিজ্ঞান ও যুক্তিধর্মী নতুন জ্ঞানের প্রসার। তাঁদের মতে ভারতের মত পশ্চাৎপদ দেশে জ্ঞানের বিস্তারই হল দেশপ্রেমের সবচেয়ে মহান নিদর্শন।(৩১)

ধনিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরা যখন শ্রমজীবী মানুষকে নিছক উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে মনে করেছে এবং তাদের সামান্যতম প্রতিবাদও তাদের কাছে মনে হয়েছে বেয়াদপি, তখন সুদূর ইংলণ্ডের শ্রমজীবী মানুষের বিক্ষোভ আন্দোলনকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করা এবং তাদের এই আন্দোলন যে ধনিক সভ্যতার অন্যায়েরই ফলশ্রুতি এই সত্যটিকে উপলব্ধি করা নিঃসন্দেহে প্রগতিশীলতার পরিচায়ক। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব একদিকে যেমন শিল্পপতিদের ঘরে এনেছিল প্রাচুর্য আর অন্যদিকে শ্রমিক মানুষের জীবনে বহন করে এনেছিল দুর্দশা আর লাঞ্ছনা। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই ইংলণ্ডের শ্রমিক করেছিল প্রতিবাদ, সংগঠিত করেছিল চার্টিস্ট আন্দোলন। ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এ চার্টিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে লণ্ডন থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে লেখা হ'ল—ইংলণ্ডের সমস্ত শিল্পাঞ্চলে এবং ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ডের কোন কোন অংশে ব্যাপক ও ভীতিপ্রদ হাঙ্গামার খবর এসেছে। এই হাঙ্গামার কারণ হল মালিকদের দ্বারা মজুরদের মজুরী হ্রাসের প্রচেষ্টা।

স্ট্যাফোর্ডশায়ারে খনির মজুরদের মধ্যে যে হাঙ্গামার সূত্রপাত হয় তা চেশায়ারে ছড়িয়ে পড়ে। পত্রিকা স্মরণ করিয়ে দেয় যে বেশ কয়েক মাস ধরেই শ্রমজীবী মানুষরা প্রচণ্ড দুর্দশা ভোগ করছে, হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন, জীবন ধারনের কোন উপায়ই তাদের নেই। এই অবস্থায় মজুরী হ্রাসের চেষ্টা অযৌক্তিক। মজুররা এই অবস্থা মেনে নেয় নি। মজুরদের এক বিরাট দল ম্যাঞ্চেস্টারের দিকে রওনা হয়। বুভুক্ষু কর্মহীন মানুষ কোন পরিণামের কথা চিন্তা না করেই এই বিক্ষোভে যোগ দেয়, ফলে বাড়াবাড়ি কিছু ঘটে, জীবন ও সম্পত্তির হানি হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই এই বিক্ষোভ আন্দোলন ল্যাঙ্কাশায়ার, ইয়র্কশায়ার ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এমন এক উত্তাল, ব্যাপক আন্দোলন দমন করা পুলিসের সাধ্য না হওয়ায় সেনাবাহিনীকে তলব করা হয়, এমন কি বেয়নেটও ব্যবহার করা হয়। মজুরীকে কেন্দ্র করে যে বিরোধের সূত্রপাত, ক্রমে ক্রমে তা আবার রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করে। একমাস পর, সেপ্টেম্বরের শুরুতে অবস্থা শান্ত হয় আর হতভাগ্য শ্রমিকরা (যারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয় নি!) আবার কাজে যোগ দেয়।(৪০)

চার্টিস্ট আন্দোলন সংক্রান্ত এই সংবাদ পরিবেশন থেকে সুদূর ইংলণ্ডের শ্রমজীবী মানুষের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন সম্পর্কে সহানুভূতি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শিল্প সভ্যতা শ্রমিকশ্রেণীর জীবনে যে চরম দুর্দশার সৃষ্টি করেছিল তার সম্যক উপলব্ধি এর মধ্যে রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দ্বারকানাথ ঠাকুর লণ্ডন থেকে লিখিত এক পত্রে চার্টিস্ট আন্দোলনের উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে 'বর্তমানে ইংলণ্ডে ৩০০০০০ লোক বেকার এবং সেনাবাহিনীর হাতে প্রচণ্ডভাবে নিগৃহীত হচ্ছে। ইংরেজরা ভারতের পাহাড়ী শ্রমিকদের অনাহারের কথা নিয়ে মাথা ঘামায়, আমি এখানে আরও দুর্দশা প্রত্যক্ষ করছি।'(৪১)

এই সময় চীন দেশে ইংরেজরা অন্যায়ভাবে যে অনুপ্রবেশের নীতি অনুসরণ করছিল যার ফলেই ঘটল অহিফেন যুদ্ধ। চীনের ভূখণ্ড যেভাবে বলপূর্বক অধিকার করা হচ্ছিল এবং অসহায় চীনের ওপর অস্বাভাবিক ক্ষতিপূরণের যে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছিল সেই সম্পর্কেও "বেঙ্গল স্পেকটেটর" ছিল সম্পূর্ণ সচেতন। "বেঙ্গল স্পেকটেটর"-এর পাতায় নিয়মিতভাবে চীনের ঘটনা-

প্রবাহের সংবাদ পরিবেশন করে পাঠকবর্গকে উপনিবেশবাদীদের এই নীতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।(৪২)

আফগানিস্থানে ইংরেজদের বর্বর নীতির বিরুদ্ধেও ঐ পত্রিকার পাতায় কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। "বেঙ্গল স্পেকটেটর"-এ লেখা হল যে আফগানিস্থানে ইংরেজরা প্রতিশোধ স্পৃহায় যে ধ্বংসযজ্ঞ অনুষ্ঠিত করছে—আফগান নীতির যারা সমর্থক, তাদের মধ্যে অনেকেই তাকে ধিক্কার জানাচ্ছে। আফগানিস্থানে চরম বর্বরতা ও লুণ্ঠনের বিবরণ দিয়ে পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে—অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, যে ইংরেজরা তাদের সভ্যতা ও জ্ঞানের অগ্রগতি নিয়ে এত বড়াই করে তারাই আফগানিস্থানে মধ্যযুগীয় গথ ও ভ্যাণ্ডালদের মত আচরণ করছে। প্রশ্ন করা হয়েছে—আফগানিস্থানের এই বর্বরতা কি ইংলণ্ডের মানুষের দৃষ্টিগোচর হবে না ?(৪৩)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মানসিকতাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিশিষ্ট প্রবন্ধের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'ইংলিশ স্ট্রাইক ও বেঙ্গলী ধর্মঘট' শীর্ষক প্রবন্ধে(১৪) লেখক ইংলণ্ডে শ্রমজীবী মানুষের শোষণ বঞ্চনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাদের ন্যায়সংগত আন্দোলনে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছেন। সেই সঙ্গে এই দেশে ভূমিহীন কৃষকদের দুর্দশা আর তার প্রতিরোধে যে ধর্মঘট আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাকে ইংলণ্ডের শ্রমিকদের স্ট্রাইকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। লেখকের মতে ইংলণ্ডের দ্রুত অবনতির কারণ হল সেখানকার শ্রমিকশ্রেণীর স্বাচ্ছন্দ্যহীন নিরানন্দ জীবন যা সমগ্র সমাজের পক্ষেই বিপজ্জনক। সমাজে সবচেয়ে বেশী পরিশ্রম করেও তারা সবচেয়ে কম মজুরী পায় আর জাতীয় সম্পদের ন্যায্য অংশ থেকে তারা সব সময়েই বঞ্চিত হয়। এই প্রাপ্য অংশ আদায়ের জন্যই তাদের স্ট্রাইক আন্দোলন এবং লেখক মনে করেন যে এজন্য তাদের দোষ দেওয়া যায় না। তিনি আরও বলেছেন যে শ্রমিকদের সম্পর্কে আমাদের যা শেখানো হয় তা সহজে মেনে নেওয়া কঠিন।

বাংলাদেশের কৃষিজীবী মানুষের ধর্মঘট আন্দোলনকে ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর স্ট্রাইকের সঙ্গে তুলনা করে লেখক মন্তব্য করেছেন যে উভয়ই হল একই সামাজিক ব্যাধির লক্ষণ—সমাজের উচ্চ ও নীচ শ্রেণীর মধ্যে সহানুভূতির অভাব। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখক মনে করেছেন এই

সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ও নিম্ন শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি।

আমেরিকার দাসত্ব প্রথার অ-মানবিক ঘৃণ্য চরিত্রকে উন্মোচন করে বীচার স্টো যে বিখ্যাত "টম কাকার কুটির" পুস্তক রচনা করেছিলেন সে সম্পর্কেও- "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকা ছিল সচেতন। ' পুস্তকটিকে প্রশংসনীয় আখ্যা দিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে—আমাদের দেশের অনেকেই উপরোক্ত পুস্তকে বর্ণিত সমাজ-চিত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, তাঁরা মনে করেন যে বাংলাদেশের কৃষক সম্প্রদায়ের নৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থা নানা দিক থেকে উত্তর আমেরিকার ক্রীতদাসদের অনুরূপ।(৪৫)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এই অগ্রসর মানসিকতার বলা যায়, সর্বোত্তম অভিব্যক্তি মেলে "সোমপ্রকাশ"-এর পাতায়। আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহ, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রগতিশীল আন্দোলনগুলি সম্পর্কে এই পত্রিকার সচেতন প্রতিক্রিয়া, পত্রিকার যুগধর্মী অগ্রসর ভাবনারই পরিচয় বহন করে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক দ্বিধা-চিত্ততা ও সংশয় সত্ত্বেও "সোমপ্রকাশ" এই প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির মর্মবস্তু অনুভব করে সেগুলিকে যথাযথ আলোকে বিচার করার চেষ্টা করেছে।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে নিষ্ঠুর ক্রীতদাস প্রথাই যে এই গৃহযুদ্ধের প্রকৃত কারণ সেইদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, মনুষ্যত্বের অবমাননাকর এই ঘৃণ্য ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। আবার, আমেরিকায় এই কলঙ্কজনক প্রথা অবসানের যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই "সোমপ্রকাশ" তাতে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেছে।

"সোমপ্রকাশে" লেখা হ'ল—'দাসপ্রথা যে অতি নিষ্ঠুর প্রথা সোদর-প্রতিম মানবমূর্তিকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া ইতর পশুর ন্যায় তাহাদিগকে সদৃচ্ছাক্রমে কশাঘাত ও পণ্যদ্রব্যবৎ ব্যবহার করা যে নিতান্ত দূষণীয় ইহা তৎকালীন জ্ঞানালোকসম্পন্ন ব্যক্তিরাও বুঝিতে পারেন নাই। কি আশ্চর্য যে ইউনাইটেড এষ্টেটবাসীরা ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পরাধীনতার নিগড় দূরে নিক্ষেপ করিয়া স্বাধীনতা দেবীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন তাঁহারাই আবার লক্ষ লক্ষ কাফ্রিকে মহাঘৃণ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। যে মহাত্মা ওয়াশিংটনের নাম স্মরণ করিলে অন্তরাত্মা পবিত্রতা লাভ করেন, যিনি

স্বাধীনতার জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াছিলেন তিনিও স্বীয় ক্রীতদাসদিগকে মুক্তিপ্রদানে যত্নবান হয়েন নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের ইচ্ছায় ক্রমে ক্রমে লোকের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইতেছে এবং অচিরকালের মধ্যে যে আমেরিকা মহাদেশের দাসত্ব প্রথা প্রচলনরূপ মহাকলঙ্ক অপনীত হইবে তাহারও সম্ভাবনা হইয়া আসিতেছে।'(৪৬)

অন্য এক প্রবন্ধে আমেরিকার গৃহযুদ্ধে লিঙ্কণের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে লেখা রয়েছে: 'আমেরিকার দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে যাঁহারা কাতর তাঁহারা লিঙ্কণের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতাকেই যুদ্ধ প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন লিঙ্কণ রাজ্যলোভে অন্ধ হইয়া এই অকার্য করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। দাসত্ব প্রথা রহিত করিবার চেষ্টাই উহার মূল।'(৪৭)

ইওরোপে কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রসার, ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠা, ১৮৭১ সালের পারী কমিউন প্রভৃতি সম্পর্কে এদেশে যখন সংবাদ নিতান্তই দুর্লভ, "সোমপ্রকাশ" কিন্তু সেই সত্তরের দশকেই ইওরোপের এই নতুন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তার সচেতন মনের পরিচয় দিয়েছে। স্বভাবতঃই 'ইন্টারন্যাশনাল' বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের যে আদর্শ স্থাপন করেছিল, মধ্যবিত্ত মানসিকতা থেকে "সোমপ্রকাশ" তাকে সমর্থন জানাতে পারে নি। তবে দেশে দেশে কমিউনিস্ট মতাদর্শের দ্রুত প্রসার ও বিপ্লবীদের ক্ষমতাবৃদ্ধির মূল কারণ যে জনসাধারণকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা—এই সত্যটির প্রতি "সোমপ্রকাশ" দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং এই মতের সমর্থনে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়ার ইতিহাসের নজির তুলে ধরেছে। বৈপ্লবিক সমাজ পরিবর্তনের কমিউনিস্ট মতাদর্শকে সমর্থন না জানালেও ঐ মতাদর্শের কয়েকটি উৎকর্ষের দিককে স্বীকৃতি দিতে সোমপ্রকাশ দ্বিধাবোধ করে নি। এর মধ্যে একটি হল তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ আর অপরটি হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবলুপ্তি।

আমেরিকার সভাপতি গ্রাণ্ট সকল জাতির একতা ও সৌহার্দের যে সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন সেই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনায় ১২৭৯ সালের (১৮৭২) ২৮ ফাল্গুন তারিখের "সোমপ্রকাশে" লেখা হল—

...'এই ইচ্ছা কেবল সেনাপতি গ্রান্টের নহে। আর যতই দোষ থাকুক না কেন ভূতপূর্ব ফরাসী কমিউনের এই মনোরথ ছিল। ইওরোপের ইন্টার-

ন্যাশনাল সভা নিরন্তর সবিশেষ আগ্রহ সহকারে এই চেষ্টা পাইতেছেন। যখন ফ্রান্স ও জার্মানীর ঘোরতর বিবাদ তৎকালেও উভয় দেশের ইন্টারন্যাশনাল সভার সভ্যদিগের বন্ধুত্বের ব্যাঘাত ছিল না। ক্রমশঃ এই সভার ক্ষমতা ও সকল দেশে শিষ্য বৃদ্ধি হইতেছে। রুশিয়ার সদৃশ যথেচ্ছাচারী শাসন প্রণালীর অধীনস্থ দেশেও ইন্টারন্যাশনালিস্টদিগের সংখ্যা এই হইয়াছে যে ইওরোপের চিন্তাশীল লোকেরা আশঙ্কা করিতেছেন যে যথা সময়ে সম্রাট আলেকজাণ্ডার সতর্ক না হইলে তদীয় রাজ্য মধ্যে বিষম বিপ্লব ঘটিয়া উঠিবে। মানব স্বভাব সর্বত্র সমান। কোন দেশের লোকই স্বাভাবিক স্বত্ব হইতে বঞ্চিত থাকিতে চাহেন না। এক্ষণে রাজনীতি সংক্রান্ত উচ্চতর স্বাধীনতা একপ্রকার সকল জাতির প্রার্থনীয় হইয়াছে। এ পর্যন্ত ইংলণ্ড ভিন্ন ইওরোপের অন্য অন্যদেশে এই স্বত্ব লোপের চেষ্টা নিবন্ধন সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে···

ইন্টারন্যাশনালিস্ট দল বর্তমান শাসন ও সামাজিক প্রণালীর যে প্রকার উচ্ছেদ করিতে চান তৎপ্রতি সকল দেশের চিন্তাশীল লোকেরই ঘোরতর আপত্তি আছে। কিন্তু তাহাদিগের একটি মত অতিশয় উৎকৃষ্ট—সকল গবর্ণমেন্টের তদনুসরণ করা কর্তব্য। সে মত এই সকল জাতির পরস্পরের প্রতি এরূপ ভাব রাখা কর্তব্য যে কেবল জগৎ হিতৈষীতা ও ধর্মজ্ঞানে না হউক পরস্পরের স্বার্থ বিবেচনাতেও যেন সৌহার্দ ও পরস্পরের কল্যাণ সাধনার ইচ্ছা থাকে।···

ইতিহাস প্রমাণ দিয়েছেন যে দেশে কঠিনতম শাসন প্রণালী সেই দেশের লোকেই রাজনীতি সংক্রান্ত বিপ্লবকারী মত অবলম্বন করে। সাইবেরিয়া রাশিয়ার কারাগার। জনরবে শুনিতে পাওয়া যায় তথায় ঐরূপ একটি প্রবল দল হইয়াছে। তাহাদিগের ইচ্ছা এই সম্রাট আলেকজাণ্ডারের শাসন প্রণালীর এককালে উচ্ছেদ করে।···

আমাদিগের বোধহয় যদি ইংলণ্ডের ন্যায় ফ্রান্সে ক্রমশঃ স্বাধীনতা দেওয়া হইত তাহা হইলে ইতিহাসকে রোবস্পীয়র প্রভৃতির অত্যাচার বর্ণনা ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত না।'(৪৮)

কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের এক প্রশংসনীয় দিকের সমর্থনে সোমপ্রকাশে লেখা হয়েছে—

'ইওরোপে কমিউনিস্ট নামক এক মতাবলম্বী কতকগুলি লোক আছেন তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বতন্ত্রভাবে অর্থ সঞ্চয় অন্যায় মনে করেন। যিনি

যাহা উপার্জন করিবেন সমুদায় সাধারণের ধনাগারে অর্পিত হইবে। এবং সংসার নির্বাহ করিতে যে ব্যক্তির যথা আবশ্যক হইবে তিনি তাহা সাধারণ ধনাগার হইতে পাইবেন। উদ্বৃত্ত অর্থ সাধারণের হিতের জন্য ব্যয়িত হইবে। এই মতটি অতিশয় উন্নত ও সভ্যতা সাপেক্ষ নিঃস্বার্থভাবে কেবল সাধারণের জন্য উপার্জন করা। এই অবস্থায় আসিতে জগতের এখনও অনেক দিন লাগিবে।'(৪৯)

কমিউনিস্ট মতাদর্শের এই নির্যাসটুকুকে সেই যুগে উপলব্ধি করে তাকে সমর্থন জানানো নিঃসন্দেহে "সোমপ্রকাশ" পত্রিকার অগ্রগামী চিন্তার পরিচায়ক।

পাশ্চাত্যের এই যুক্তিবাদী অগ্রসর চেতনার সঞ্জীবনী রসে অবগাহন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রও। তাঁর সম্পাদিত "বঙ্গদর্শনের" পাতায়ও রয়েছে এই ভাবের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। বঙ্কিমের চিন্তায় পাশ্চাত্যের দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতির প্রভাব খুবই লক্ষ্যণীয়। ইওরোপের বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ তাঁর মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। ইওরোপের প্রগতিশীল চিন্তার যাঁরা জনক—বেকন, বেন্থাম, মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, ডারউইন, অগাস্টে কোঁৎ, হিউম, কান্ট, লক্, রুশো, বাকল্—প্রমুখের চিন্তাধারা ও রচনার সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর পরিচিতি। কোঁৎ-এর Religion of Humanity বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বের ওপর প্রভাব ফেলেছে। তেমনি বেন্থাম ও মিলের হিতবাদ সম্পর্কে তার ছিল গভীর অনুরাগ। সমাজ, রাষ্ট্র ও সরকার সম্পর্কে তাঁর চিন্তায় স্পেন্সর ও মিলের প্রভাব অনস্বীকার্য।

বঙ্কিমচন্দ্র তার "সাম্য" প্রবন্ধে* সাম্যনীতি সম্পর্কে যে চিন্তার বিস্তার করেছেন তারও মূল তিনি আহরণ করেছেন পাশ্চাত্যের ভাবধারা আর ইতিহাস থেকে। পাশ্চাত্যের ইতিহাস মন্থন করে তিনি দেখিয়েছেন—'আমেরিকার চিরদাসত্বের উচ্ছেদের জন্য সেদিন ঘোরতর আভ্যন্তরিক সমর হইয়া গেল—অস্ত্রাঘাতে ক্ষত চিকিৎসার ন্যায় সামাজিক অনিষ্টের দ্বারা ইষ্ট সাধন করিতে হইল। এই চিকিৎসার বড় ডাক্তার দাঁতো এবং রোবস্পীর। বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্য সংস্থাপনই প্রথম ও দ্বিতীয় ফরাসিস বিপ্লবের উদ্দেশ্য।'(৫০) সাম্যবাদের প্রচারে রুশোর ভূমিকাকে তিনি বিশেষভাবে

* পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র "সাম্য" গ্রন্থটি পুনঃপ্রকাশ বন্ধ করেন, তবে তার অংশবিশেষ—"বঙ্গদেশের কৃষক"—পুনর্মুদ্রিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

স্মরণ করেছেন। তিনি বলেছেন…'যেদিন Le Contract Social প্রচারিত হইল সেই দিন ফরাসী রাজার হস্তের রাজদণ্ড ভগ্ন হইল…ফরাসী বিপ্লবে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহার মূল এই গ্রন্থে। সেই মন্ত্রে বেদমন্ত্র এই গ্রন্থোক্ত বাণী।'(৫১)

ফরাসী বিপ্লব ইওরোপে যে যুগান্তকারী পরিবর্তন বহন করে নিয়ে এল সেই সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—'ইউরোপে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হইল—মনুষ্যজাতির স্থায়ী মঙ্গল সিদ্ধ হইল।'(৫২)

এখানেই শেষ নয়। বঙ্কিম আরও বললেন যে 'ভূমি সাধারণের' এই কথা বলিয়া রুসো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্যনুতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। 'কম্যুনিজম' সেই বৃক্ষের ফল। 'ইন্টার ন্যাশনাল' সেই বৃক্ষের ফল।(৫৩) কমিউনিজমের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি ওয়েন, লুই ব্লাং, কাবে, সেন্ট সাইমন, ফুরিয়ার প্রমুখ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রচারকর্তাদের মতামত বিচার করেছেন। আবার নারী পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নে—যা তাঁর মতে সাম্যতত্ত্বেরই অংশ তিনি স্মরণ করেছেন মহাত্মা জন স্টুয়ার্ট মিলকে।

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপে শুধু উদারনীতির জয়যাত্রাকেই দেখেন নি সেই সংগে প্রত্যক্ষ করেছেন শিল্প সভ্যতার চেহারার কদর্য দিকটিকেও—পররাজ্য গ্রাসী, যুদ্ধ সংঘাতে মত্ত ইউরোপের নগ্ন রূপকে। তাঁর নিজের ভাষায়—'সেই রক্ত-মাংস-পূতিগন্ধশালিনী কামান গোলা বারুদ—ব্রীচ-লোডর-টর্পীডো প্রভৃতিতে শোভিতা রাক্ষসী'—।(৫৪)

তাই ইউরোপের সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর মনে জেগেছে সংশয়। তাঁর পূর্ব-সূরীদের মত পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎকর্ষকে তিনি নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারেন নি। ইউরোপে বিজ্ঞানের অগ্রগতি, যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা যেমন তাঁর চিত্তকে আকর্ষণ করেছে আবার এই লোভ-দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাঁকে পীড়া দিয়েছে। তিনি তাই সমাধান খুঁজেছেন সমন্বয়ে। চেয়েছেন পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সঙ্গে ভারতের অধ্যাত্মবাদকে মিলিয়ে দিতে। তাঁর মতে Mathematics, Aastronomy, Physics, Chemistry, Biology, Sociology-র জ্ঞান নিতে হবে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে আর ঈশ্বরকে জানতে হবে হিন্দুশাস্ত্রে। তিনি এই প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন 'যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের নিষ্কাম ধর্ম একত্রিত হইবে, সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে।'(৫৫)

কাজেই রামমোহন থেকে শুরু করে তাঁর উত্তরসূরী—উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের যারা নায়ক—তারা দেশবাসীকে যুগধর্মের সঙ্গে অর্থাৎ প্রগতিশীল বুর্জোয়া ভাবাদর্শের সঙ্গে পরিচিত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য তাই বলে তাঁদের এই আন্দোলনেব সীমাবদ্ধতাকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। ঐতিহাসিক কারণেই তাদের মধ্যে এক দ্বৈততা ও সংশয়ের প্রকাশ ঘটেছে। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই এসেছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট জমিদার পরিবারগুলি থেকে। জীবিকার দিক থেকে তাঁরা অনেকেই ছিলেন ইংরেজ শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত অধঃস্তন সরকারী কর্মচারী, কেউ বা ইংরেজ বিচার ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। তাই ইওরোপের জনজাগরণ এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলন তাঁদের প্রভাবিত করলেও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর জোরালো সংগ্রামের কোন চিন্তা তাঁদের মনে স্থান পায় নি। তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের চৌহদ্দির মধ্যেই ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের নানা অত্যাচার তাঁদের মনকে যেমন নাড়া দিয়েছে তেমনি আবার ইংলণ্ডের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য তাদের মনে ইংলণ্ড সম্পর্কে এক মোহ রচনা করেছে। ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক রূপটি তাদের কাছে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে নি। তাই সমসময়ে মহান কার্ল মার্কস ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্রকে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিত্রিত করেছেন—ব্রিটিশ শাসনকে 'শূকরের তানের রাজত্ব' বলে যেভাবে বর্ণনা করেছেন—ব্রিটিশ শাসনের সেই সর্বগ্রাসী শোষণকারী চরিত্রকে বাঙলার নবজাগরণের নেতারা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও কৃষকদের দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন হয়েও তাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহগুলিকে (যেমন সাঁওতাল বিদ্রোহ) যথাযোগ্য সমর্থন জানাতে পারেন নি এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালের জাতীয় বিদ্রোহ থেকেও নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছেন। কাজেই তাদের এই সীমাবদ্ধতাকে আড়াল করে তাদের আন্দোলনে প্রকৃত 'বিপ্লবী চরিত্র' আরোপ করাও ইতিহাসের বিচারে ঠিক নয়। আবার তদানীন্তন ঐতিহাসিক অবস্থা-স্মরণে রেখে তাঁরা সেই যুগে যে প্রগতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, যে যুগচেতনাকে তাঁরা এদেশে সঞ্চারিত করেছেন তাকে লঘু করে দেখাও হবে

খুবই ভুল কাজ। উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক মর্মবস্তুটি নিহিত ছিল তাকে অস্বীকার করা বা অগ্রাহ্য করা হবে ইতিহাসের প্রতি অবিচার।

টীকা ও উদ্ধৃতি

১। Rabindra Nath Tagore : Inaugurator of Modern Age in India ; The Father of Modern India. —Commemoration Volume —Rammohun Roy Centenary Celebrations, 1933 ed by S. C. Chakravarty

২। S. C. Sarkar : Rammohun on Indian Economy, p. XIII.

৩। Brojendra Nath Seal : Rammohun Roy, the Universal Man. Father of Modern India, p 98.

৪। Rabindra Nath Tagore : Inaugurator of Modern Age in India.

৫। English Works of Rammohun Roy. Edited by Kalidas Nag. Part IV, pp. 106-108.

৬। ঐ বই, Letter to Mrs. Woodford of Brighton, April 27th 1832. Part IV, p. 91.

৭। ঐ বই, Letter to William Rathbone Esq. July 31st, 1832, p. 31

৮। Bengal Spectator : Vol. II, No 23.

৯। J. K. Majumdar : Rammohun and the World p. 66.

১০। ঐ, পৃঃ ৭২

১১। ঐ, পৃঃ ৮১

১২। Ramananda Chatterjee : Rammohun Roy and Modern India : The Father of Modern India, p. 79.

১৩। Works, Letter to T. Hyde Villiers Esq. Secretary to the India Board, London, December 22, 1831, p. 125

১৪। ঐ বই, Letter to the Minister of Foreign Affairs of France, pp. 126-128.

১৫। Ramananda Chatterjee : Rammohun Roy and Modern India, p 80, footnote.

১৬। J. K. Majumdar, p. 94.

১৭। Works, Letter to Mr. Woodford, August 22, 1833, p. 93

১৮। J. K. Majumdar, p. 93 (Footnote).

১৯। Works, Letter to Mr. Buckingham, August 11, 1821, p. 89.

২০। Ramananda Chatterjee : Rammohun Roy and Modern India, p. 38.

২১। ঐ, পৃঃ ৭৯ (পাদটীকা)

২২। ঐ, পৃঃ ৭৯।

২৩। Works. A Letter Written on Nov. 23, 1827, p. 94.
Also Majumdar, p, 77.

২৪। Majumdar, p. 76.

২৫। Bela Dutta Gupta : Sociology in India, p. 59.

২৬। Ashoke Mustafi : Thomas Paine and India, p. 3.

২৭। সমাচার দর্পণ, জুলাই ১৮৩২।

২৮। অমর দত্ত : ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানস্ পৃঃ ১২-১৩

২৯। Asiatic Journal, Hindoo Liberals, Sept.-Dec. 1836.
Biman Behari Majumdar : History of Political Thought, pp. 79-80.

৩০। Bela Dutta Gupta, p. 33 (Book Review in Calcutta Magazine May 1833, p. 176),

৩১। B. B. Majumdar, p. 82.

৩২। শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃঃ ৯৫-৯৬

৩৩। B. B. Majumder, pp. 83-84

৩৪। ঐ বই, পৃঃ ৩৪

৩৫। Gautam Chattopadhyay : Bengal : Early Nineteenth Century, pp. 266-277.

৩৬। পল্লব সেনগুপ্ত : উনিশ শতকের ইংরেজী সাহিত্যে বিপ্লবী ভাবনের চিত্রকল্প, পৃঃ ১৩-১৭, ২৬-৩৭

৩৭। B. B Majumdar, pp 94-95.

৩৮। Ibid. p 120.

৩৯। Selections from Jnananeswan : Edited by Suresh Chandra Maitra, pp. 57-59.

৪০। Bengal Spectator · November 1, 1842

৪১। ঐ

৪২। ঐ, September 15, October 15, November 15, December 1, 1842.

৪৩। ঐ, November 15, December 1, 1842.

৪৪। Hindoo Patriot, July 13, 1854

৪৫। ঐ April 12, 1855.

৪৬। সোমপ্রকাশ, ১০ আষাঢ়, ১২৬৯

৪৭। ঐ, ৫ ফাল্গুন, ১২৬৯

৪৮। ঐ, ২৮ ফাল্গুন, ১২৭৯

৪৯। ঐ, ১ পৌষ, ১২৮০

৫০। বঙ্কিমচন্দ্র : 'সাম্য'—বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮২

৫১। ঐ, পৃঃ ৩৮৭

৫২। ঐ, পৃঃ ৩৮৭

৫৩। ঐ, পৃ., ৩৮৭

৫৪। বঙ্কিমচন্দ্র : 'ধর্মতত্ত্ব', বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬০২

৫৫। ঐ, পৃঃ ৬৩৩

বাঙলার জাগরণ : মার্কসীয় বিচার

নরহরি কবিরাজ

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণ বাঙলার রেনেসাঁস নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে অবশ্য রেনেসাঁস কথাটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রেনেসাঁস থেকে সুরু করে ক্রমে ক্রমে রিফর্মেশন, এনলাইটেন্‌মেণ্ট প্রভৃতি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইওরোপে নবযুগের সূচনা হয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন বাঙলার রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে বাঙলা তথা ভারতেও নবযুগের আবির্ভাব ঘটেছে। কাজেই তাঁদের মতে বাঙলার ইতিহাসে ত বটেই সমগ্র ভারতের ইতিহাসে, বাঙলার জাগরণ একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

কেউ কেউ আবার মনে করেন, বাঙলার জাগরণের সঙ্গে ইওরোপের রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, এনলাইটেনমেণ্ট আন্দোলনের কোনো মিল নেই। ঔপনিবেশিক রাজের সঙ্গে সহমর্মিতা ছিল এই জাগরণের বৈশিষ্ট্য। এঁদের মতে ইংরেজ শাসন যদি প্রতিক্রিয়াশীল হয় তাহলে বাঙলার জাগরণ, যা ছিল ইংরেজের জয়গান, তাও প্রতিক্রিয়াশীল।

কাজেই দেখা যাচ্ছে বাঙলার জাগরণের প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রশ্নটি আজও বিতর্কের বিষয় হয়ে রয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে ইওরোপের রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, এনলাইটেনমেণ্ট আন্দোলনের সঙ্গে এর কোনোই মিল আছে কি না? প্রশ্ন উঠেছে—যদি মিল থাকে তাহলে এ আন্দোলনের সঙ্গে মিল কতটা, পার্থক্য কোনখানে? এক কথায় বাঙলার জাগরণের নিজস্ব প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি কি?

রেনেসাঁসের সংজ্ঞা

এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে ইওরোপের রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও এনলাইটেনমেণ্ট আন্দোলনের প্রকৃতি কি ছিল তা প্রথমে বোঝা প্রয়োজন।

বুরখার্ডের মতে, মধ্যযুগীয় জীবনধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আধুনিক জীবন-ধারার উদ্বোধন রেনেসাঁসের মূল কথা। এই আন্দোলন ইতালীতে প্রথম আর্বিভূত হয়েছিল। এই আন্দোলন দেখা দিয়েছিল ঠিক সেইসময়ে যখন ইতালীতে জমি-ভিত্তিক, গ্রামভিত্তিক সমাজের বদলে বাণিজ্য-ভিত্তিক, সহর-ভিত্তিক সমাজের বনিয়াদ গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছিল। মধ্যযুগীয় জীবন-ধারার রক্ষক রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের গতিমুখ বিশেষভাবে পরিচালিত হয়েছিল। মধ্যযুগকে 'অন্ধকারের যুগ' বলে চিহ্নিত করে এই আন্দোলন প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে নতুনের সন্ধান করেছিল। ধর্ম-নিরপেক্ষ, মানব-নির্ভর, আধুনিক জীবনধারার অভিব্যক্তি ছিল এই আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এর প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি ছিল: সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের বদলে ব্যক্তিগত অধিকারের ওপর জোর, বংশ কৌলীন্যের বদলে গুণ-কৌলীন্যের ওপর জোর, মানুষে মানুষে সমানাধিকার, নারী পুরুষের সমানাধিকার, গরীব মানুষও মানুষ—এই চেতনার অভিব্যক্তি, ঐহিক জীবন ও সুখ ভোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ, ধর্ম-নিরপেক্ষতার মনোভাব, মানুষের ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পর্কে প্রত্যয়, সম্পূর্ণ মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা, জাতীয় চেতনার উদ্বোধন ও দেশ-সম্পর্কে গর্ববোধ, আন্তর্জাতীয় ধ্যান-ধারণার উন্মেষ, ইত্যাদি। সামন্ততান্ত্রিক বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বদলে গুণকৌলীন্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক ধরণের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা গঠনের প্রচেষ্টাও ছিল রেনেসাঁস আন্দোলনের অঙ্গ। এক কথায়, মানুষ সম্পর্কে, পৃথিবী সম্পর্কে, দেশ সম্পর্কে নতুন চিন্তার উন্মেষের মধ্যে অনুরণিত হয়েছিল রেনেসাঁসের মূল সুর।

বুরখার্ড বলেছেন—এই আন্দোলনের মূল শক্তি ছিল সহরের বুদ্ধিজীবীরা, কবি, শিল্পী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি। তাঁদের জ্ঞানলব্ধ চিন্তা, ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, মানবতাবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ নতুন সাহিত্য ও শিল্প—এই আন্দোলনের প্রধান সম্পদ। এরই মধ্যে নিহিত ছিল আধুধিকতার ও মানব-নিভর নতুন সভ্যতার সুনিশ্চিত ইঙ্গিত।

এক শ্রেণীর রাজপুরুষের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত এই আন্দোলনে স্ববিরোধিতাও ছিল যথেষ্ট। বুরখার্ডের মতে বুদ্ধিজীবীদের চিন্তার সবলতা যেমন এতে প্রতিফলিত, তেমনি প্রতিফলিত বুদ্ধিজীবী চরিত্রের দুর্বলতার দিকটিও। এই আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী জনোচিত ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবোধ অনেক

সময়েই বেশী মাত্রায় প্রকাশ পেত। বুদ্ধিজীবীর অহংবোধ, আত্মপূজার মনোভাব, নীতি নিরপেক্ষ জীবন-যাপনের প্রবণতা, সংশয়বাদী চিন্তা ইত্যাদি —এই আন্দোলনে যথেষ্ট প্রকট ছিল।

বুরখার্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এইখানে যে এইসব স্ববিরোধিতা সত্ত্বেও এই আন্দোলন মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনে আঘাত হেনেছিল এবং আধুনিক যুগের মুক্তচিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।(১)

মার্কসবাদীরা রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও এনলাইটেনমেণ্ট আন্দোলনকে যথাযোগ্য মূল্য দিয়ে বিচার করে থাকেন। তাঁদের মতে সমাজবিকাশের তদানীন্তন স্তরে এই আন্দোলনগুলির অবশ্যই একটি বৈপ্লবিক ভূমিকা ছিল। বস্তুত, এই আন্দোলনগুলি মানবজাতির ইতিহাসে এক নতুন যুগের উদ্বোধন করেছিল। এই নতুন যুগের মূল বৈশিষ্ট্য ছিলঃ সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ। এঙ্গেলসের চোখে এই নতুন যুগের লক্ষণগুলি ছিলঃ অর্থনীতির দিক থেকে, এক নতুনতর উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন, হস্তশিল্প থেকে শ্রমশিল্পে উত্তরণ, যা থেকে পরবর্তীকালে আধুনিক বৃহৎ শিল্পের সূচনা, চিন্তাক্ষেত্রে অভূতপূর্ব এক আলোড়ন যার সূচনা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, ভৌগোলিক আবিষ্কারে, যা মানুষের সৃজনীশক্তিকে অবারিত করে দিয়েছিল। এক বিজ্ঞান-মানসিকতা ও যুক্তি নির্ভরতা মানুষকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে শেখাল। মানুষের মনের ওপর খ্রীষ্টীয় যাজকদের একাধিপত্য ভেঙ্গে গেল। সাহিত্য ও শিল্প ক্ষেত্রে এক নতুন মানবনির্ভর চিন্তাধারা প্রাধান্য লাভ করতে থাকল। উদ্ভব হল প্রথম আধুনিক সাহিত্যের। রাজনীতিক্ষেত্রে, বংশকৌলীন্যের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রের বদলে গুণ-কৌলীন্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এক নতুন ধরণের রাষ্ট্র জন্মলাভ করল। রাজন্যবর্গ শহরের নাগরিকদের সাহায্য নিয়ে সামন্ত অভিজাত বর্গের শক্তিকে চূর্ণ করে মূলত জাতি-সত্তার ভিত্তিতে প্রবল রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করল, তার মধ্য দিয়ে আধুনিক ইওরোপীয় জাতিসমূহ এবং আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ বিকাশলাভ করল। সামাজিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে, জার্মানিতে কৃষক সংগ্রাম ভবিষ্যদ্বক্তার মত ভবিষ্যৎ শ্রেণীসংগ্রামের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখাল—রঙ্গমঞ্চে শুধু বিদ্রোহী কৃষকেরাই এসে হাজির হয় নি, —সেটা তখন আর নতুন কিছু ছিল না, তাদের পশ্চাতে হাতে লাল ঝাণ্ডা ও

যুগে সকল দ্রব্যের ওপর সাধারণ মালিকানার দাবি নিয়ে আবির্ভূত হতে চলেছে আধুনিক সর্বহারা শ্রেণী।

এই নতুন যুগের উদ্বোধন হয়েছিল ইতালীতে, তার কারণ এখানেই ভূমি-দাস প্রথা প্রথম ভেঙ্গে পড়েছিল এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভবের ভিত্তিভূমি এখানেই রচিত হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল ফ্রান্সে, জার্মানীতে, ইংলণ্ডে—সেইসব দেশে যেখানেই সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরনের প্রক্রিয়াটি দানা বাঁধতে থাকল—যেখানেই উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটল।

এই নতুন যুগের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এঙ্গেলস লিখেছেন—"এ যুগকে আমরা জার্মানরা বলি রিফর্মেশন, ফরাসীরা যাকে বলে রেনেসাঁস এবং ইতালীয়নরা বলে সিনকেসেন্টো—যদিও এইসব কোনো নামই তাকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করতে পারে নি। এই যে যুগ, তার আবিভাব ঘটেছে পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে।...আজ পর্যন্ত মানুষ যা দেখেছে, তার মধ্যে এইটি হল সবচেয়ে প্রগতিশীল বিপ্লব, এ যুগের প্রয়োজন ছিল অ সাধারণ মানুষের এবং তার সৃষ্টিও হয়েছিল—যাঁরা ছিলেন চিন্তাশক্তি, নিষ্ঠা, চরিত্র, সার্বজনীনতা এবং বিদ্যায় অ-সাধারণ। যাঁরা আধুনিক বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থাব প্রবর্তন ববেন, তাঁদেরও বুর্জোয়াসুলভ দোষ-ত্রুটি ছিল।"(২)

ফ্রান্সের এনলাইটেনমেণ্ট আন্দোলনকে উপরোক্ত রেনেসাঁস ও রিফর্মেশন আন্দোলনের উত্তরসূরী হিসাবে চিহ্নিত করে মার্কসবাদীরা এই আন্দোলনকেও যথোচিত মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

এনলাইটেনমেণ্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্পর্কে এঙ্গেলস মন্তব্য করেছেন—"যে মহান ব্যক্তিরা আসন্ন বিপ্লবের জন্য ফ্রান্সে মানুষের মনকে প্রস্তুত করেছিলেন, তাঁরা নিজেরা ছিলেন চরম বিপ্লববাদী। তাঁরা কোনো প্রকারের বাহ্যিক কর্তৃত্বকেই স্বীকার করেন নি। ধর্ম, প্রকৃতি বিজ্ঞান, সমাজ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সব কিছুকেই ক্ষমাহীন সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল; সব কিছুকেই হয় যুক্তির কাঠগড়ায় নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে হবে আর নয়তো অস্তিত্বকেই বিসর্জন দিতে হবে। যুক্তিই সব কিছুর একমাত্র মানদণ্ড হয়ে উঠেছিল।;.....

সেই সময়ে বিদ্যমান প্রতিটি সমাজ ও সরকারকে, প্রতিটি পুরাতন ঐতিহ্যগত ধারনাকে অযৌক্তিক বলে আবর্জনা-স্তূপে নিক্ষেপ করা

হয়েছিল ; এতদিন পর্যন্ত বিশ্ব নিজেকে একমাত্র কুসংস্কারের দ্বারা চালিত হতে দিয়েছিল ; অতীতের এই সবকিছুই ছিল করুণা ও ঘৃণা পাবার যোগ্য। এখন এই প্রথম দিনের আলো (যুক্তির রাজত্ব) প্রকাশিত হল ; এখন থেকে চিরন্তন সত্য, চিরন্তন ন্যায়, প্রকৃতিদত্ত সাম্য ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য অধিকার—যা কিছু কুসংস্কাব, অন্যায়, বিশেষ সুবিধা ও অত্যাচাবের স্থান দখল করেছিল।'

এই আন্দোলনের শ্রেণীচরিত্রটি চিহ্নিত করে এঙ্গেলস মন্তব্য করেছেন—'আজকের দিনে আমরা জানি যে এই যুক্তির রাজত্ব বুর্জোয়াদের আদর্শায়িত রাজত্বের বেশি আর কিছুই নয়, এই চিরন্তন ন্যায় বুর্জোয়া ন্যায়বিচারের মধ্যেই বাস্তব রূপ পেয়েছিল ; এই সাম্য আইনের চোখে বুর্জোয়া সাম্যে পরিণতি লাভ করেছিল, বুর্জোয়া সম্পত্তির অধিকারকে মানুষের এক অপরিহার্য অধিকার বলে ঘোষণা করা হয়েছিল ; এবং এই যে যুক্তি-নিভর সরকার, রুশোর 'কনট্রাক্ট সোস্যাল', কেবলমাত্র একটি গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের আকারেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল এবং এটিই করা সম্ভব ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই মহান চিন্তাবিদরা, তাঁদের পূর্বসূরীদের মতই, তাঁদের যুগের আরোপিত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারেন নি।'(৩)

এই বুর্জোয়া বিপ্লববাদের সীমাবদ্ধতার দিকটি পরবর্তীকালে আবও পরিস্ফুট হয়ে উঠল। দেখা গেল, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরোধ অপসৃত হওয়া দূরের কথা, এটি ক্রমেই ঘনীভূত হতে থাকল। শ্রমজীবী জনসাধারণ ও কৃষক একদিকে এবং বৃহৎ শিল্পপতি ও জমিদার আর এক পক্ষে, এইভাবে শ্রেণীবৈষম্য নতুন আকার ধারণ করল। এই শ্রেণীবৈষম্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হতে শ্রেণীসংগ্রাম বিকাশ লাভ করল। ফ্লোরেন্সে যে শ্রমিক বিদ্রোহ (Ciompi revolt, ১৩৭৮ খ্রীঃ), জার্মানীতে যে কৃষক বিদ্রোহ (১৫২৫ খ্রীঃ) দেখা দেয়, তাব মধ্যেই আধুনিক ধরনের শ্রেণীসংগ্রামের প্রথম শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে গিরোণ্ডিস্ট ও জেকোবিনদের মধ্যে বিরোধে এই শ্রেণীসংগ্রামেরই আবও স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা গিয়েছিল।(৪)

কিন্তু এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়। কেননা পরবর্তীকালের সমাজতান্ত্রিক জাগরণ হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েনি ; বুর্জোয়া জাগরণের সড়ক

পার হয়েই তা মানবজাতির দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছে। এঙ্গেলস মন্তব্য করেছেন—তত্ত্বের আকারে আধুনিক সমাজতন্ত্র—অষ্টাদশ শতাব্দীর মহান ফরাসী দার্শনিকদের ঘোষিত নীতিগুলিরই "আরও যুক্তিসম্মত সম্প্রসারণ" হিসাবেই জন্মলাভ করেছে।(৫)

এশিয়ার জাগরণ

ইওরোপের রেনেসাঁস, রিফর্মেশন ও এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন যে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার বুদ্ধিজীবীদের একাংশকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বিশ্বে তখন ব'য়ে চলেছে বুর্জোয়া জাগরণের হাওয়া: এটিই ছিল তখন যুগধর্ম।

মনে রাখা প্রয়োজন, এক একটি যুগের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে এক একটি শ্রেণী। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই কালপর্বে যুগের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করেছিল বুর্জোয়া শ্রেণী। এটি ছিল বুর্জোয়া জাগরণের যুগ।(৬)

সমাজবিকাশের এমন কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আছে যাকে কোন দেশের মানুষের পক্ষেই ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তদানীন্তন কালে সামন্ত তন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উত্তরণ—মানবজাতির বিকাশে এটি ছিল একটি উন্নতি-সূচক স্তর; বিশ্বের প্রত্যেকটি দেশকেই, তা সে ইওরোপে হোক অথবা এশিয়ায় হোক, মূলত একই ধরনের সামাজিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। এই প্রক্রিয়া অর্থাৎ বুর্জোয়া জাগরণের উদ্বোধন ও বিকাশ প্রথম ঘটেছিল ইওরোপে, কিন্তু যেহেতু এই জাগরণের মধ্যে (তদানীন্তন কালের বিচারে) সমাজবিকাশের অগ্রগতির চাবিকাঠি নিহিত ছিল তাই এর আকর্ষণ ছিল বিশ্বব্যাপী।(৭) গণতন্ত্রের (বুর্জোয়া গণতন্ত্র) ধ্বনিটি তখন বিশ্বের প্রতিটি দেশের প্রগতিকামী মানুষের কাছে দুর্বার আকর্ষণের বস্তু হয়ে উঠল। কাজেই রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলন ইওরোপে জন্মলাভ করলেও এর মর্মবস্তুটি শুধু ইওরোপের সম্পদ হয়ে রইল না, এটি হয়ে উঠল সারা বিশ্বের সম্পদ, সমগ্র বিশ্ববাসীর আকর্ষণের বস্তু।

ভারত, চীন ও এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিতে এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাগরণের আবির্ভাব ঘটে এক জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। ধনতান্ত্রিক

বিকাশে অগ্রসর পশ্চিমের কয়েকটি দেশ, যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি, এই দেশগুলিকে জয় করে নেয় এবং নিজেদের প্রয়োজনে কাঁচামাল রপ্তানীকারী দেশ হিসাবে এদের ব্যবহার করতে থাকে। এর ফলে, ধনতন্ত্রের অসম বিকাশের নিয়মের কল্যাণে, এই নির্যাতিত দেশগুলি শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা হারাল তাই নয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও, এক অনগ্রসর-অভিশপ্ত জীবন তাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে রইল।

এই অবস্থায়, ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ও তার অনুষঙ্গ দেশীয় সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এশিয়ার জাগরণের একমাত্র উপায় বলে বিবেচিত হল। কিন্তু প্রশ্ন উঠল এই কাজে নেতৃত্ব দেবে কে? প্রশ্ন উঠল—যাঁরা নেতৃত্ব দেবেন, তাঁরা দেশকে, জাতিকে কি ধরনের চেতনায় সঞ্জীবিত করে তুলবেন? প্রশ্ন উঠল—আধুনিক যন্ত্র-সভ্যতার উপকরণগুলি আয়ত্ত করতে না পারলে, নতুন বৈজ্ঞানিক চিন্তার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় স্থাপন করতে না পারলে কি দেশকে, জাতিকে নতুন চেতনায় সঞ্জীবিত করে তোলা যাবে? এক কথায়, আধুনিকতার মহামন্ত্রে দেশকে দীক্ষিত করার প্রশ্নটি জাতীয় জাগরণের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচিত হল।

এশিয়ার দেশগুলিতে এই জাতীয় জাগরণের উদ্বোধনের কাজে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এদের পরিচালনায়, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে, এই সব দেশে জাতীয় জাগরণ বুর্জোয়া জাগরণের চরিত্র নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে থাকল।(৮)

এশিয়ার দেশগুলিতে, সর্বপ্রথম ভারতেই (তারপরে চীনে) বুর্জোয়া জাগরণের সূচনা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকে (১৮১৭) এই দিক থেকে এশিয়ার ইতিহাসে একটি দিকচিহ্ন বলা চলে। 'বঙ্গদূত' 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সোমপ্রকাশ', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতির স্তম্ভে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্দীপ্ত বুদ্ধিজীবীর কণ্ঠস্বর প্রথম ধ্বনিত হতে থাকে। এই আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। পরবর্তীকালে এই জাগরণ স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এক সার্থক পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণকে বুর্জোয়া জাগরণের প্রারম্ভিক পর্ব বলা চলে। গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যাবে যে ঔপনিবেশিক শাসন ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ভারতবাসীর বিষয়গত বিরোধ—এইটিই ছিল

বাঙলার জাগরণের মূল কথা। বিদেশী শাসন দেশের উন্নয়নের পক্ষে যে বড় বাধা এবং দেশের সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনটি যে দেশের অবনতির মূলে— এই মোটা কথাটা (পুরোপুরি না হলেও) ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন। তবে তাঁরা এটাও বুঝতে পারলেন যে দেশের উন্নতির পথে বিঘ্নস্বরূপ এই দুটি মূল সমস্যার সমাধান মোটেই সহজ কাজ নয়। এই কারণে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বুর্জোয়া জাগরণের যেগুলি ছিল মূলসূত্র, যেমন, ইওরোপীয় বিজ্ঞান, ইওরোপীয় দর্শন, ইওরোপীয় সমাজ-চিন্তা প্রভৃতি— এইগুলি তাঁরা আয়ত্ত করার জন্যে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন আধুনিকীকরণের এই প্রক্রিয়াটি অবারিত করে দিতে না পারলে বিদেশী ইংরেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার কোন সম্ভাবনা নেই। রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, এনলাইটেনমেন্ট, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, রাশিয়ায় জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন, আয়ার্ল্যাণ্ডের মুক্তি আন্দোলন প্রভৃতি থেকে ভাবধারা সংগ্রহ করে তাঁরা দেশবাসীকে বুর্জোয়া জাগরণের আলোয় উদ্দীপ্ত করে তোলার চেষ্টা করলেন। ইওরোপে বুর্জোয়া জাগরণের মধ্য দিয়ে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল তা বাঙলার জাগরণের প্রথম যুগের নেতাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।

এই দিক থেকে বাঙলার জাগরণ ছিল ইওরোপের বুর্জোয়া জাগরণের সঙ্গে সমগোত্রীয়, বিশ্বব্যাপী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাগরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে তখনকার ঐতিহাসিক অবস্থায় বাঙলার জাগরণে সীমাবদ্ধতা ছিল অনিবার্য। এই জাগরণের ধারক ও বাহক ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁরা বুর্জোয়া জাগরণের এই রথ টেনে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। একদিকে ছিল বিষয়গত বাধা। ইওরোপে বুর্জোয়া জাগরণের পক্ষে যে বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টি হয়েছিল (ধনতন্ত্রের বিকাশ—বাণিজ্য পুঁজি থেকে শিল্প পুঁজিতে উত্তরণ, বুর্জোয়া শক্তির আবির্ভাব প্রভৃতি) সেগুলি এদেশে বিদ্যমান ছিল না। বরং ঔপনিবেশিক শাসন দেশীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অনুরূপ বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলি গড়ার পথে প্রতিনিয়ত বাধার সৃষ্টি করত। ভারত তথা এশিয়ার দেশগুলিতে বুর্জোয়া জাগরণ বলিষ্ঠ আকার ধারণ করার পথে এই বিষয়গত দিকটি ছিল সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

তাছাড়া, এই জাগরণ বলিষ্ঠ আকার ধারণ করার পথে বিষয়ীগত অন্তরায়ও বর্তমান ছিল। যে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এই আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটি গড়ে তুলতে অগ্রসর হলেন তাঁরা পেশা ও কাজের দিক থেকে ছিলেন সরকারী চাকুরে (শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, প্রভৃতি)। এঁদের রুজি-রোজগার নানা দিক থেকে বিদেশী শাসন ও দেশীয় সামন্ততন্ত্রের উপর নির্ভরশীল ছিল। কাজেই এই শ্রেণীর ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী চেতনায় একটি দ্বিধাচিত্ততা সব সময়েই দেখা দিত। ভারত তথা এশিয়ার বুর্জোয়া জাগরণে একটি ইতিবাচক দিক অবশ্যই ছিল, কিন্তু দ্বিধাচিত্ততা ছিল এর নিত্যসঙ্গী—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণেরও এটি ছিল প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য।(৯)

ভারতের পুনরুজ্জীবন: মার্কসের চোখে

বলা বাহুল্য, ভারত সমাজ বিকাশের সাধারণ নিয়মের নাগালের বাইরে নয়। নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে মধ্যযুগে ভারতেও এক সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। মুঘল যুগের শেষে এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাটি ক্ষয়িষ্ণুতার চরম সীমায় গিয়ে পৌঁছেছিল। সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থা, বিশেষ করে জায়গীরদার ও জমিদারদের সীমাহীন শোষণ কৃষকদের দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছে দিল—তার ফলে সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা রুদ্ধ হয়ে এল। সামাজিক রীতি-নীতি, যেমন, সতীদাহ, কৌলীন্যপ্রথা, শিশুহত্যা, দেবদাসী-প্রথা প্রভৃতি মানুষের সৃজনীশক্তিকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিল। রাজনীতির ক্ষেত্রে, দেশের রাষ্ট্রযন্ত্রটি ছিল স্বৈরাচারের প্রতীক। রাজসভা ছিল বিলাসে ও আত্মকলহে লিপ্ত, সাহস ও দেশপ্রেমবর্জিত, ষড়যন্ত্র-প্রিয় এক শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়ের আখড়া মাত্র। সবে মিলে ইংরেজ ভারতে আসার পূর্বমুহূর্তে ভারতে গড়ে উঠেছিল এমনি এক সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তন—যা জীবনের মুক্ত স্রোত অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, ঝাড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্রের অর্থহীন বাঁধনে গড়ে উঠেছিল এক অনড়, অচল, রুদ্ধস্রোত জীবনযাত্রা।(১০)

ভারতে এই সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তন এমন এক চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল বলেই তাকে আঘাত হেনে, চূরমার করে দিয়ে ব্রিটেনের পক্ষে গোটা ভারতকে জয় করে নেওয়া এতটা সহজ হয়েছিল। তাছাড়া, বিজেতা হিসাবে ব্রিটেন ছিল উন্নততর বুর্জোয়া সভ্যতার উপাদানে সুসজ্জিত।(১১)

প্রকৃতপক্ষে ভারতের মাটিতে দুটি পৃথক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল—একটি ক্ষয়িষ্ণু ভারতীয় সামন্ততন্ত্র, অপরটি উদীয়মান বুর্জোয়াতন্ত্র। এই পরীক্ষায় বুর্জোয়াতন্ত্রের জয় হল।

ভারতে আরম্ভ হল ব্রিটিশ শাসন এবং তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হল এক নতুন ধরনের শোষণ-ব্যবস্থা। ভারত শোষণের তাগিদে ইংরেজ তাদের উন্নততর জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে ব্যবহার করল। তারা প্রবর্তন করল স্টীম এঞ্জিন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ, প্রতিষ্ঠা করল মুদ্রা-যন্ত্র, বের করল সংবাদপত্র, আধুনিক অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত এক সেনাবাহিনী গড়ে তুলল, তারা প্রতিষ্ঠা করল ভারতব্যাপী এক শক্তিশালী রাষ্ট্র-কাঠামো। এর প্রত্যেকটিই ছিল ইংরেজ শাসকদের হাতে ভারত-শোষণের বিভিন্ন যন্ত্রবিশেষ।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করে কার্ল মার্কস লিখেছেন—এর আগেও বারবার ভারত বিদেশী বিজেতাদের (আরব, তুর্কী, তাতার, মোগল প্রভৃতি) হাতে পরাস্ত হয়েছে, কিন্তু বিজেতারা শেষ পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে মিশে গেছে। ইংরেজরাই প্রথম বিজেতা যারা নিজ শ্রেষ্ঠত্বের গুণে স্বাতন্ত্র বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তারা পুরানো ভারতীয় সভ্যতাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে। তাদের ভারত শাসনের ঐতিহাসিক পাতাগুলি থেকে এই ধ্বংসের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যায় না বললেই হয়। মার্কস মন্তব্য করেছেন—'এতে কোন সন্দেহই নেই যে ব্রিটিশেরা হিন্দুস্থানের উপর যে দুর্দশা চাপিয়ে দিয়েছে তা হিন্দুস্থানের আগের সমস্ত দুর্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র।' ব্রিটেনের এই তুলনাহীন ভারত শোষণের কথা স্মরণ রেখেই মার্কস ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে শূকরোচিত বলে চিহ্নিত করেন।(১২)

তবে মার্কস মন্তব্য করেছেন 'শূকরোচিত শাসন হওয়া সত্ত্বেও, বিষয়গতভাবে বিচার করলে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একটি পুনরুজ্জীবনকারী ভূমিকা আছে। মার্কস বলেছেন স্তূপাকৃতি ধ্বংসের মধ্যে থেকে উজ্জীবনের প্রক্রিয়া লক্ষ্যেই পড়ে না। তা সত্ত্বেও সে ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। ইংরেজ আমলে উজ্জীবনের বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলির (স্টীম এঞ্জিন, রেলপথ, স্বাধীন সংবাদপত্র, ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত প্রভৃতি) ভিত্তি রচিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, ইংরেজ শাসন এক উন্নততর সভ্যতার নতুন উপকরণের সঙ্গে ভারতবাসীকে পরিচিত করেছে। অনগ্রসর ভারতকে ইতিহাসের দ্বারপ্রান্তে

সে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে হাজির করেছে। তিনি মন্তব্য করেছেন—এই অর্থে ভারতে ব্রিটিশ শাসন হয়ে উঠেছে 'ইতিহাসের অচেতন যন্ত্র।'

ভারতের সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনটি ইংরেজ শাসনের আঘাতে যে ভেঙ্গে পড়ল তাতে মার্কসের মনে এতটুকু আক্ষেপ ছিল না, বরং তিনি মনে করেছেন এই অনড়, নিশ্চেষ্ট, রুদ্ধস্রোত জীবনযাত্রাকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়ে ইংরেজ 'যে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করেছে সেটা এশিয়ায় যা শোনা গেছে তার মধ্যে সর্ববৃহৎ, সত্যি কথা বললে, একমাত্র বিপ্লব।'

মার্কসের আক্ষেপ এইখানে যে ব্রিটিশ শাসন ভারতের সমাজ-কাঠামোটি ভেঙ্গে তছনছ করে দিল, কিন্তু পুনর্গঠনের কোন লক্ষণ সেখানে দেখা গেল না। তিনি মন্তব্য করলেন—'ইংরেজ বুর্জোয়া হয়তো বা বাধ্য হয়ে যা কিছুই করুক তাতে ব্যাপক জনগণের মুক্তি অথবা সামাজিক অবস্থার বাস্তব সংশোধন ঘটবে না।'

তাহলে ভারতের 'ব্যাপক জনগণের' মুক্তির পথ কি? মার্কস উত্তরে বলছেন—'এটা নির্ভর করবে শুধু উৎপাদনী শক্তির বিকাশের উপরেই নয়, জনগণ কর্তৃক তাদের (এই বৈষয়িক পূর্বশর্তগুলির) স্বত্ব গ্রহণের উপর"।

মার্কসের মতে ব্রিটিশের ছড়িয়ে দেওয়া উন্নততর সভ্যতার উপকরণগুলি যতদিন না ব্যাপক জনগণের আয়ত্তে আসছে ততদিন ভারতের উজ্জীবন সম্ভব নয়। 'খাস গ্রেট ব্রিটেনেই যতদিন না শিল্প কারখানার প্রলেতারিয়েত কর্তৃক তার বর্তমান শাসকশ্রেণী স্থানচ্যুত হচ্ছে অথবা হিন্দুরা নিজেরাই ইংরেজের জোয়াল একেবারে ঝেড়ে ফেলার মত যথেষ্ট শক্তিশালী যতদিন না হচ্ছে, ততদিন ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ বুর্জোয়া কর্তৃক ছড়িয়ে দেওয়া এইসব নতুন সমাজ-উপাদানের ফল ভারতীয়রা পাবে না'।(১৩)

মার্কসের এই উক্তিতে শুধু ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে মূল বিরোধটিই চিহ্নিত নয়, এই বিরোধের সঠিক ও বৈজ্ঞানিক সমাধান কোন্ পথে হতে পারে তারও স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। মার্কসের মনে এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন ছিল না যে ভারতবাসীকে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারা বর্জন করে যুগধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন জীবনধারা গ্রহণ করতে হবে। আধুনিকী-করণের এই প্রক্রিয়াটি আয়ত্ত করে ভারতবাসী যেদিন ইংরেজের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে এবং ইংরেজ শাসনের জোয়াল থেকে নিজেকে

মুক্ত করতে পারবে, সেইদিন ঘটবে ইওরোপের প্রগতিশীল আদর্শে উদ্দীপ্ত, ভারতের ব্যাপক জনগণের স্বার্থে অনুপ্রাণিত, ভারতের পুনরুজ্জীবন।

এইভাবে মার্কস তুলে ধরলেন ভারতের জনগণের পুনরুজ্জীবনের এক সম্ভাব্য রূপ। মার্কস আশা প্রকাশ করলেন—"ন্যূনাধিক সুদূর ভবিষ্যতে আশা করতে পারি, দেখব এই মহান ও চিত্তাকর্ষক দেশটির পুনরুজ্জীবন।"(১৪)

বাঙলার জাগরণ ও বিজ্ঞান-সচেতনতা

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙলায় ইংরেজী শিক্ষিত একটি ছোট গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। ইংরেজ শাসন আধুনিকতার যে উপকরণগুলি (স্টীম এঞ্জিন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ, সংবাদপত্র প্রভৃতি) ছড়িয়ে দিল, তারা তার সুফলগুলি আয়ত্ত করার জন্যে বিশেষ আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

এই গোষ্ঠীর নেতারা ভৌগোলিক আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পবিপ্লব প্রভৃতি সুফলগুলিকে আকণ্ঠ পান করতে চাইলেন। পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ-বিদ্যা, শরীর-বিদ্যা, উদ্ভিদ-বিদ্যা-প্রসূত জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বিশেষভাবে অনুভব করলেন। স্টীম এঞ্জিন, রেলগাড়ী, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত কৃৎকৌশলগত জ্ঞান আহরণে তাঁরা আগ্রহী হলেন। বিজ্ঞানকে সামাজিক প্রয়োজনে ব্যবহার করার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁরা অবহিত হলেন। প্রকৃতপক্ষে, এই বিজ্ঞান সচেতনতা বাঙলার জাগরণের সবচেয়ে বড় ইতিবাচক দিক।(১৫)

রামমোহন লর্ড আমহার্স্টকে যে চিঠি লেখেন (১৮২৩) তাতে এই বিজ্ঞান-সচেতনতা খুবই স্পষ্ট। রামমোহন লিখলেন—'এদেশীয়দিগকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রাখা যদি গবর্ণমেন্টের আকাঙ্ক্ষা ও নীতি হয়, তাহা হইলে প্রাচীন সংস্কৃত ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকৃষ্টতর উপায় আর নাই। তৎপরিবর্তে এদেশীয়দিগের উন্নতি-বিধান যখন গবর্ণমেন্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা-বিষয়ে উন্নত ও উদার নীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যদ্দারা অপরাপর বিষয়ের সহিত গণিত, জড় ও জীব বিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, শারীরস্থান বিদ্যা ও অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।'(১৬)

এই বিজ্ঞান সচেতনতা ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনেরও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভারতে স্টীম এঞ্জিনের প্রবর্তনকে তাঁরা বিশেষভাবে স্বাগত জানান। বর্ধমান, রাজমহল ও পালামৌ অঞ্চলে কয়লা খনি আবিষ্কারকে (১৮৩৮) তাঁরা অভিনন্দন জানান। তাঁরা মন্তব্য করলেন—এই আবিষ্কারের ফলে দেশবাসীর সামনে শুধু একটি উদ্যমশীল কর্মকাণ্ডের উদ্বোধন ঘটবে তাই নয়, তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্পৃহা জাগিয়ে তুলবে এবং এটি সব দিক থেকে দেশের পক্ষে বিশেষ হিতকর হয়ে উঠবে। তাঁরা এই শিল্পে দেশীয় পুঁজির বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথাও উত্থাপন করেন।(১৭)

'মেডিক্যাল কলেজ' (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৩৫) শরীর-বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞান বিস্তারে যে বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে আরম্ভ করেছিল তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে তাঁরা মন্তব্য করলেন—এই প্রতিষ্ঠানটি দেশবাসীর মধ্যে শরীর-বিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রসারে সাহায্য করছে—এটি চিহ্নিত করছে মান্ধাতার আমলের কুসংস্কারের জায়গায় যুক্তি ও জ্ঞানের জয়যাত্রা।(৮১)

বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের কৌতূহল এত প্রবল ছিল যে ইওরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক-আলোচনা সংগঠিত করার জন্যে তাঁরা 'বিজ্ঞান-সার-সংগ্রহ' নামে এক দ্বি-ভাষী মাসিক পত্র প্রকাশ করেন।

১৮৩৯ সালে তাঁদের উদ্যোগে 'মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউট' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এদেশীয়দিগকে শ্রমজাত শিল্প শিক্ষা দেওয়া ঐ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল।

অক্ষয় কুমার দত্তের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বিজ্ঞান-সচেতনতা প্রচারে এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঐ পত্রিকার পাতায় লেখা হল: ছাত্রদের সুশিক্ষিত করে তোলার জন্যে সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির পাশাপাশি গণিত, পদার্থবিদ্যা শারীরবিধান ও নীতিবিদ্যা ও 'সসম্ভ্রমে ধনোপার্জনে সমর্থ করিবার নিমিত্ত লোক-যাত্রা-বিধান, রাজনিয়ম ও নানা-প্রকার শিল্প-বিদ্যা' শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য।(১৯)

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যন্ত্র-সভ্যতার বিভিন্ন উপকরণ—যেমন রেলপথ, টেলিগ্রাফ, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির প্রবর্তনকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখা হল—'যে বাষ্পীয়রথের লৌহবর্ত্ম এতদ্দেশীয় পূর্ব্বকালীন লোকে মনেতেও কল্পনা করে নাই, এক্ষণে বঙ্গদেশবাসী আপামর সাধারণ লোকে সেই রথে আরোহণ করিয়া সর্বদা গতায়াত করিতেছে এবং যে অদ্ভুত তাড়িত বার্ত্তাবহ পূর্ব্বকালীন

লোকে সন্দর্শন করিলে বোধ হয় দেবকীর্ত্তি বলিয়া মনে করিত, এক্ষণে বঙ্গ-ভূমির নানাস্থানে সেই তাড়িত তার সঞ্চালিত হইয়া রহিয়াছে। যে বাষ্পীয় যন্ত্র সাংসারিক দুঃখ হরণের এক প্রধান উপায়, যে যন্ত্রের সাহায্যে বহুসংখ্যক মনুষ্য অনেক প্রকার দৈহিক শ্রম হইতে মুক্ত হইয়া অক্লেশে সংসারের কার্য্যোপযোগী বহুবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছে এবং যে মুদ্রাযন্ত্র সাধারণরূপে বিদ্যাপ্রচারের একমাত্র উপায়, যাহার সহায়তাক্রমে একদিবসের মধ্যে সহস্র সংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইয়া সহস্র স্থানে প্রচারিত হইতে পারে, এক্ষণে বঙ্গদেশে উক্ত বাষ্পীয় যন্ত্র ও মুদ্রাযন্ত্রেরও বিলক্ষণ প্রচার হইয়াছে।'(২০)

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় বিজ্ঞান-বিষয়ক অসংখ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে কয়েকটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন, বিসুবিয়াস নামক আগ্নেয়গিরি, পুরুভুজ, জলপ্রপাত, বীবর, উষ্ণপ্রস্রবণ, বৃক্ষলতাদির উৎপত্তির নিয়ম, ক্রুবুল পুষ্প, দীপমক্ষিকা, বেলুন, জলস্তম্ভ, জোয়ারভাঁটা, হিমশিলা, বল্মীক, নৈসর্গিক সেতু, প্রবালকীট, উল্কাপিণ্ড, পৃথিবী ও মনুষ্য প্রভৃতি।

অক্ষয়কুমারের অক্লান্ত বিজ্ঞান-সাধনা শেষ পর্যন্ত তাঁকে সংশয়বাদী করে তোলে। 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক প্রস্তাবে তিনি এটাই প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেন যে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে কাজ করাই ধর্ম, না করাই অধর্ম।(২১)

বিজ্ঞান-সচেতনতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের একটি বড় দিক। তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির জন্যে যে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেন তাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, জীবনী, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, শরীরবিদ্যা প্রভৃতি। ১৮৫২ সালের স্কলারশিপ পরীক্ষায় বিদ্যাসাগর রচিত প্রশ্নপত্রে রচনা লিখতে বলা হয়—'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনুশীলন থেকে যে উপকারগুলি পাওয়া যায় তার পরিচয় দাও।'(২২) বিদ্যাসাগর 'জীবনচরিত' নামে যে বইখানি লেখেন তাতে কোপার্নিকস, গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতির চরিতকথা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। শুধু তাই নয়। আধুনিক বিজ্ঞান-চেতনার মানদণ্ড দিয়ে তিনি প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের মূল্যবিচার করেন। তিনি বলেন—'হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের বেশীর ভাগই বর্তমান কালের অগ্রসর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।'(২৩) এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি মন্তব্য করেন—'বেদান্ত ও সাংখ্য যে

ভ্রান্তদর্শন-এ বিষয়টি নিয়ে এখন তার তর্কের অবকাশ নেই।'(২৪) প্রাচীন পণ্ডিতদের-'বেদে আছে' মনোবৃত্তির তিনি নিন্দা করতেন।(২৫)

'হিন্দু মেলা' বা 'জাতীয় মেলার' উদ্যোক্তারা সামাজিক কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগের দিকটির প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন। হিন্দু মেলার অধিবেশনে ইঞ্জিনিয়ারিং ও সার্ভে'য়িং শিক্ষার গুরুত্ব, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের (এয়ার পাম্প, এঞ্জিন, মুদ্রাযন্ত্র তৈরী প্রভৃতি) ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি নিয়ে আলোচনার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হত। স্বদেশীয়দের দ্বারা স্বদেশজাত দ্রব্যাদির প্রদর্শনী এই মেলাতেই সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হতে আরম্ভ করে।(২৬)

'মুখার্জিস ম্যাগাজিন'ও বিজ্ঞানের শিক্ষাকে জাতীয় কল্যাণের কাজে নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। ভবিষ্যতের আত্মনির্ভর ভারতের একটি ছবি এঁকে বলা হল : 'বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর ভারত-বাসী তখন মাত্র কৃষিজীবী থাকিবে না, কৃষি ও শিল্প উভয় কর্ম্মেই তাহারা লিপ্ত হইবে, ভূগর্ভস্থ খনিজ দ্রব্যাদি উদ্ধার করিবে, কল স্থাপন করিবে, সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইয়া ইংলণ্ড আমেরিকাবাসীদের ব্যবহারের নিমিত্ত তাহাদেরই গৃহকোণে আমাদের শিল্পজাত দ্রব্যাদি পৌঁছাইয়া দিবে।(২৭)

১৮৭৬ সালে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল শিক্ষিত বাঙালীর বিজ্ঞান-সাধনার এক সার্থক প্রকাশ।

বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞান-বিষয়ক বহু প্রবন্ধ রচনা করেন। এগুলি 'বিজ্ঞান-রহস্য' নামে তাঁর গ্রন্থাবলীতে সংগৃহীত।

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সম্পর্কে তাঁর সুতীব্র কৌতূহল বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেন নিজস্ব অনবদ্য ভঙ্গীতে। তিনি লিখলেন 'আমাদের দেশের মঙ্গল হইতেছে। কি মঙ্গল, দেখিতে পাইতেছ না ? ঐ দেখ, লৌহ-বর্ত্মে লৌহতুরঙ্গ, কোটি উচ্চৈঃশ্রবাকে বলে অতিক্রম করিয়া, এক মাসের পথ এক দিনে যাইতেছে। ঐ দেখ, ভাগীরথীর যে উত্তাল-তরঙ্গ মালায় দিগ্‌গজ ভাসিয়া গিয়াছিল, অগ্নিময়ীতরণী ক্রিয়াশীল হংসের ন্যায় তাহাকে বিদীর্ণ করিয়া বাণিজ্যদ্রব্য বহিয়া ছুটিতেছে। কাশীধামে তোমার পিতার অদ্য প্রাতে সাংঘাতিক রোগ হইয়াছে—বিদ্যুৎ আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়া তোমাকে সংবাদ দিল, তুমি রাত্রিমধ্যে তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার

শুশ্রূষা করিতে লাগিলে, যে রোগ পূর্ব্বে আরাম হইত না, এখন নবীন চিকিৎসা-শাস্ত্রের গুণে ডাক্তারে তাহা আরাম করিল। যে ভূমিখণ্ড নক্ষত্রময় আকাশের ন্যায় অট্টালিকাময় হইয়া এখন হাসিতেছে, আগে উহা ব্যাঘ্র-ভল্লুকের আবাস ছিল। ঐ যে দেখিতেছ রাজপথ, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্থানে সন্ধ্যার পর হয় কাদার পিছলে পা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া থাকিতে, না হয় দস্যুহস্তে প্রাণত্যাগ করিতে, এখন সেখানে গ্যাসের প্রভাবে কোটিচন্দ্র জ্বলিতেছে। তোমার রক্ষার জন্য পাহারা দাঁড়াইয়াছে, তোমাকে বহণের জন্য গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। যেখানে বসিয়া আছ, তাহা দেখ। যেখানে আগে কাঁথা, ছেঁড়া সপ ছিল, এখন সেখানে কার্পেট, কৌচ, ঝাড়, ক্যাণ্ডেলাব্রা, মারবেল, আমবেষ্টার—কত বলিব? যে বা যাহারা—দূরবীণ করিয়া বৃহস্পতি গ্রহের উপগ্রহগণের গ্রহণ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জন্মিলে উনি এতদিন চাল কলা-ধূপ-দীপ দিয়া বৃহস্পতির পূজা করিতেন। আর আমি হতভাগা চেয়ারে বসিয়া ফুলিস্কেপ-কাগজে 'বঙ্গ দর্শনের' জন্য সমাজতত্ত্ব লিখিতে বসিলাম, এক শত বৎসর পূর্ব্বে হইলে আমি এতক্ষণ ধরাসনে পশুবিশেষের মত বসিয়া ছেঁড়া তুলট নাকের কাছে ধরিয়া নবমীতে লাউ খাইতে আছে কিনা, সেই কচকচিতে মাথা ধরাইতাম। তবে কি দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে না? দেশের বড় মঙ্গল, তোমরা একবার মঙ্গলের জন্য জয়ধ্বনি কর।'(২৮)

এই বিজ্ঞান সচেতনতা রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করেছে। তিনি লিখেছেন—'বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে। আজ সেই পরমযুগের আহ্বান এসেছে। আজ মানুষকে বলতে হবে, 'তোমার এ শক্তি অক্ষয় হোক: কর্মের ক্ষেত্রে জয়ী হোক।'(২৯)

বাঙলার জাগরণের সারবস্তু: আধুনিকতা

এই বিজ্ঞান-সচেতনতা বাঙলার জাগরণের নেতাদের নতুন ধরনের এক সমাজ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করল। তাঁরা বুঝতে শিখলেন—প্রকৃতির 'লীলা-খেলাকে' যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনি মানব-সমাজের উত্থান, বিকাশ ও অগ্রগতির এক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব। তদানীন্তন কালের সর্বাধুনিক বুর্জোয়া জীবনদর্শনের মধ্যে তাঁরা যুগধর্মের ইঙ্গিত লক্ষ্য

করলেন। যুগধর্মকে গ্রহণ করার মধ্যেই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতির চাবিকাঠি রয়েছে—বাঙলার জাগরণের নেতাদের মনে এই গভীর প্রত্যয় জন্মেছিল।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ—বাঙলার জাগরণের নেতারা এই আধুনিকতার কালস্রোতে অবগাহন করতে চাইলেন।

যুগধর্মের প্রতি আকর্ষণ রামমোহন চরিত্রের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ইওরোপে সামন্ততন্ত্রের পতন, ধনতন্ত্রের উদ্ভব, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা—এই বিষয়গুলি রামমোহনের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, জার্মানি, প্রভৃতি দেশে যে গণতান্ত্রিক জাগরণ দেখা দিয়েছিল তার প্রতি রামমোহন গভীর সহানুভূতি পোষণ করতেন। 'স্বাধীনতার যারা শত্রু, স্বেচ্ছাতন্ত্রের যারা মিত্র, তারা কখনও জয়ী হয় নি, কখনও শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না'—রামমোহনের এই উক্তি তাঁর মনের আধুনিকতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর।

এই যুগধর্মকে ইয়ং বেঙ্গলও আকণ্ঠ পান করতে উদগ্রীব হয়ে উঠলেন। ফরাসী বিপ্লবের চিন্তা এঁদের কিভাবে মাতিয়ে তুলেছিল সে সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন—'ফরাসি বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গসকল ভারতক্ষেত্রেও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।···ফরাসি বিপ্লবের এই আবেগ বহু বৎসর ধরিয়া বঙ্গসমাজে কার্য্য করিয়াছে।'(৩০) ইওরোপীয় দর্শন, ইওরোপীয় রাজনীতি চিন্তা, ইওরোপীয় অর্থনীতি-চিন্তা, ইওরোপীয় সাহিত্য চিন্তা ইয়ং বেঙ্গলের মনোজগতকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। পেইনের 'এজ অব রীজন' তাঁদের মধ্যে কিরূপ আদরনীয় ছিল শাস্ত্রী মহাশয় তারও উল্লেখ করেছেন। অ্যাডাম স্মিথের অবাধ বাণিজ্য নীতিকে অনুসরণ করে তাঁরা মার্কেন্টাইল মতবাদের সমালোচনা করলেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের তীব্র নিন্দা করলেন। ডিকেন্সের 'এ টেল অব টু সিটিজ' ইয়ং বেঙ্গলের সাহিত্য সাধনাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কৈলাসচন্দ্র দত্ত, শশীচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির রচনার কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।(৩১)

ইয়ং বেঙ্গল দল এই মত পোষণ করতেন যে জ্ঞানেই শক্তি এবং যেখানেই তার বিস্তার ঘটেছে সেখানেই জনগণের অবস্থার পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমাদের মত দেশে, যা অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে এবং যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সভ্যতার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে,

রয়েছে, তার পক্ষে এই কল্যাণকর বস্তুটিকে আয়ত্ত করতে পারাই 'শ্রেষ্ঠ দেশ-প্রেমের নিদর্শন।'(৩২) আধুনিকতা ছাড়া দেশের মুক্তি নেই, আধুনিকতায় দীক্ষা গ্রহণই শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেম—এই চিন্তা বাঙলার জাগরণের মহামন্ত্র।

আধুনিকতা বিদ্যাসাগর চরিত্রের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। আগেই বলেছি, বিদ্যাসাগর মনে করতেন—ইওরোপের আধুনিক ভাবধারার সঙ্গে গভীর পরিচয়—ভারতের পুনরুজ্জীবনের জন্যে একান্ত আবশ্যক। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তিনি সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কার জনিত জড়তা যা ভারতবাসীর জীবনের গতি রুদ্ধ করে রেখেছিল তাকে উপড়ে ফেলে দিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন। তিনি বলতেন—ইংরেজ জাতির কাছ থেকে ভারতবাসীর শিক্ষার অনেক কিছু আছে—যেমন, নিয়মানুবর্তিতা, সত্যনিষ্ঠা, কর্মোদ্যম প্রভৃতি। তাই বালক-বালিকাদের সামনে তিনি যে সমস্ত জীবন-চরিতের আদর্শ তুলে ধরেন তার কোনটি তিনি গ্রহণ করেন ইংলণ্ড থেকে, কোনটি ইতালি, কোনটি বা আমেরিকা থেকে। এঁদের কেউ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, কেউ শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, কেউ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, কেউ শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ। বিদ্যাসাগর চরিত্রের এই আধুনিকতার দিকটি তুলে ধরে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—'বিদ্যাসাগর আচারের দুর্গকে আক্রমণ করেছিলেন, এই তাঁর আধুনিকতার একমাত্র পরিচয় নয়। তিনি নিজে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন অথচ তিনিই বর্তমান ইওরোপীয় বিদ্যার অভিমুখে ছাত্রদের অগ্রসর করবার প্রধান উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং নিজের উৎসাহ ও চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই আধুনিকতার গৌরবকে স্বীকার করতে হবে। তিনি নবীন ছিলেন এবং চিরনবীনের অভিষেক লাভ করে বলশালী হয়েছিলেন। তাঁর এই নবীনতাই আমার কাছে সব চেয়ে পূজনীয়।'(৩৩)

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'-ও এই আধুনিকতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে-ছিল। আধুনিক ভাবধারার দ্বারা পরিচালিত হয়ে এই পত্রিকা সামন্ততান্ত্রিক কূপমণ্ডূকতার বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম চালিয়েছিল। ঐ পত্রিকার পাতায় ইংলণ্ড থেকে প্রেরিত কলিকাতা নিবাসী এক ব্রাহ্মের একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। তাতে লেখা রয়েছে—'রাজ্যের স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, প্রতি জনের স্বাধীনতা সকলই এদেশে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। দাস এ দেশে যে দণ্ডে পদার্পণ করে, সেই দণ্ডে তাহার সকল শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়া পড়ে।

ভারতবর্ষ কবে এই প্রকার স্বাধীনতা ও এই প্রকার ঐক্যতার আলয় হইবে।'(৩৪) এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায় ইওরোপের শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানীদের চিন্তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বেন্থাম, মিল, ম্যালথাস তত্ত্ববোধিনীর লেখকদের মনোজগতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ম্যালথাসের লোকগণনা-তত্ত্বের উল্লেখ করে ঐ পত্রিকার পাতায় জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষে মত জ্ঞাপন করা হয়েছে। লেখা হয়েছে—'অবস্থানুসারে মনুষ্যের অপত্যোৎপাদিকা শক্তির সংযম করা কর্ত্তব্য।'(৩৫)

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট', বুর্জোয়া লিবারেল চিন্তার সূত্র ধরে, সমাজের 'নিম্নতর শ্রেণীগুলির' মানবিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নটি উত্থাপন করে। ঐ পত্রিকার লেখা হয়—প্রত্যেক জাতির মধ্যেই দুটো জাতি আছে—এ হল অগ্রসর ইওরোপের বিধান। সেখানে সমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত—একদিকে রয়েছে অত্যাচারিত এবং অপরদিকে অত্যাচারী। প্রত্যেকটি সভ্য দেশেই এই অবস্থা।(৩৬) তবে এই সব দেশে যাঁরা জ্ঞানী-গুণী তাঁরা—একদল অন্য দলের উপর সীমাহীন অত্যাচার চালিয়ে যাবে—এ জিনিষ সহ্য করেন না। তাঁরা আমেরিকার দাস প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে এসেছেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' বিশ্ব বিখ্যাত পুস্তক 'আঙ্কল টমস্ কেবিনে'র মর্মবাণীটি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে নীলকরদের অত্যাচার বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং তার প্রতিকার দাবি করেছে।(৩৭) এই পত্রিকার পাতায় প্রকাশিত 'ইংলিশ ষ্ট্রাইক ও বেঙ্গলী ধর্মঘট' অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।(৩৮) লেখক ইংলণ্ডে শ্রমজীবী মানুষের শোষণের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এবং তাদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছেন। তিনি আমাদের দেশে কৃষকদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন এবং ইংলণ্ডের শ্রমিকদের ষ্ট্রাইকের সঙ্গে এদেশের কৃষকদের 'ধর্মঘট' আন্দোলনের তুলনা করেছেন।

'সোমপ্রকাশে'র পাতায় ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ অনুসরণ করে পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলি ও আমেরিকা যে বিপুল বৈষয়িক উন্নতি সাধন করেছে তার প্রতি বারবার দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। লেখা হল: ইওরোপীয় কায়দায় যন্ত্রচালিত শিল্প প্রবর্তন, মূলধন নিয়োগ ও তৎসম্পর্কিত কৃৎকৌশল অর্জন—এগুলি থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন। দেশীয় ধনিকদের প্রতি আবেদন জানানো হল—আপনারা নিজেদের গচ্ছিত মূলধন

আধুনিক শিল্পে (কাপড়ের কল, কয়লা খনি, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি) বিনিয়োগ করুন এবং এইভাবে দেশের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা সৃষ্টির কাজে অগ্রসর হোন।(৩৯) ঐ পত্রিকার পাতায় পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলিতে (ফ্রান্স, প্রাশিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি) জমিতে কৃষকের স্বত্ব প্রতিষ্ঠার নীতির (peasant proprietorship) ভিত্তিতে যে ভাবে কৃষক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে তার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে এইটিই আমাদের দেশেও কৃষক সমস্যার সমাধানের প্রকৃষ্ট পথ। লক্ষ্যণীয় যে জমিতে রায়তের স্বত্ব প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে জোরের সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে।(৪০)

ইওরোপীয় বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজনীতি, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে গভীর অনুশীলনে লিপ্ত ছিলেন তার ভূরি ভূরি প্রমাণ তাঁর রচনাতেই পাওয়া যায়। বেন্থাম ও মিলের 'ইউটিলিটেরিয়ান' মতবাদ, কোঁতের 'পজিটিভিজম্', হার্বার্ট স্পেন্সারের সমাজ বিবর্তন সম্পর্কিত চিন্তাধারা, ডারউইনের প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল এবং সব ক্ষেত্রে এঁদের মত গ্রহণ না করলেও সাধারণভাবে এই সব মতবাদের প্রভাব তাঁর মানস চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে।(৪১) আরও লক্ষ্য করার বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র, রুসো, প্রুঁধো, রবার্ট ওয়েন, লুই ব্লাং, কাবে প্রভৃতির চিন্তার সঙ্গেও পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি সেন্ট সাইমনিজম, ফুরীরিজম, কমিউনিজম প্রভৃতি মতবাদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং 'আন্তর্জাতিকের'ও নামোল্লেখ করেছেন।(৪২) অবশ্য, তিনি সমাজতান্ত্রিক মতবাদের যেটি প্রধান দিক—ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্তির প্রশ্নটি—সেটির প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেন নি, বরং এর মধ্যে সমানাধিকারের (equal opportunities for all) যে দিকটি ছিল তাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেছেন।(৪৩)

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে সোস্যালিজম, কমিউনিজম প্রভৃতি সম্পর্কে বঙ্কিমের এই উল্লেখ একটি আকস্মিক ব্যাপার নয়।(৪৪) ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে—ইওরোপে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পরের বছরগুলিতে এই সব মতবাদের প্রচার আরম্ভ হয়। আমাদের দেশে সমসাময়িক কালের সংবাদপত্রগুলিতে ইংলণ্ডের চার্টিষ্ট আন্দোলন, ফ্রান্সে সদ্য গজিয়ে ওঠা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ, রাশিয়ার নিহিলিষ্ট আন্দোলন, আয়ার্ল্যাণ্ডের ফেনিয়ান আন্দোলন, এমন কি 'ইন্টারন্যাশনাল' সম্পর্কে মাঝে মাঝে সংবাদ

প্রকাশিত হত। কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের পাতায় এই সমস্ত মতবাদ সম্পর্কে মন্তব্যও প্রকাশিত হত।(৪৫) কেউ কেউ এই সব মতবাদের প্রচারে আতঙ্ক বোধ করতেন, আবার কেউ কেউ এই সব মতবাদের মধ্যে যে একটি ভালো দিক (সমানাধিকারের দিক) আছে সেটি স্বীকার করতেন। যেমন 'সোমপ্রকাশ' প্যারি কমিউন, 'আন্তর্জাতিক', প্রভৃতি সম্পর্কে শুধু সংবাদ পরিবেশন করেছে তাই নয়, কমিউনিস্ট মতবাদের আদর্শগত দিকটির উচ্চ প্রশংসা করার পরে মন্তব্য করেছে—এই মত বর্তমানে কার্যকর করা সম্ভব নয়। 'এ অবস্থায় আসিতে জগতেব এখনও অনেক সময় লাগিবে।'(৪৬)

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় এই জাগরণের বাহন ছিলেন ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

এই শ্রেণীটির উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে মার্কস লিখেছেন—'কলকাতায় ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে অনিচ্ছা সহকারে ও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের মধ্যে থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইওরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত।' তিনি আরও লিখেছেন—'ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিজেরাই স্বীকার করছে, একেবারে নতুন ধরনের শ্রম ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং যন্ত্র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করার মতো বিশেষ যোগ্যতা হিন্দুদের আছে।' ক্যাম্পবেলের উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি আরও বলেছেন 'ভারতের বিপুল জনগণের মধ্যে প্রভূত শিল্প-ক্ষমতা বর্তমান, পুঁজি সঞ্চয়ের মত যোগ্যতা তাঁদের বেশ আছে, গাণিতিকভাবে তাঁদের মাথা পরিচ্ছন্ন এবং গণনা ও গাণিতিক বিজ্ঞানাদিতে তাঁদের প্রতিভা অতি উল্লেখযোগ্য, এঁদের মেধা চমৎকার।'

এই সঙ্গে মার্কস নিজে মন্তব্য করলেন—'কলকাতা টাঁকশালে যে দেশীয় ইঞ্জিনিয়াররা অনেক বছর ধরে বাষ্পীয় যন্ত্রে কাজ করছেন তাঁদের সামর্থ্য ও নৈপুণ্য, হরিদ্বার কয়লা খনি অঞ্চলে কতকগুলি বাষ্পীয় যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশীয়গণ এবং অন্যান্য দৃষ্টান্ত থেকে এ ঘটনার প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায়।'(৪৭)

লক্ষ্য করার বিষয়, দেশের অভিজাত শ্রেণী থেকে পৃথক, আধুনিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ, এই নতুন শ্রেণীটির আবির্ভাবের ঘটনাটি এবং তার গুরুত্বের দিকটি মার্কস বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন।(৪৮)

উনবিংশ শতাব্দীতে আস্তে আস্তে এই ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী একটি সামাজিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে থাকে। 'বঙ্গদূত', 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' 'সোমপ্রকাশ', 'সুলভ সমাচার', 'সাধারণী', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতির পাতায় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেশোন্নয়নের প্রশ্নটি নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে আলোচিত হয়েছে। এঁদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল—ইওরোপের মত এদেশেও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই জাতীয় মুক্তির ধারক ও বাহক হয়ে উঠতে হবে।

এই মতের প্রতিনিধিত্ব করে 'সোমপ্রকাশ' লিখল—'যাহারা মনে করেন, জমিদারদিগকে সশিক্ষিত করিয়া তাহাদিগের দ্বারাই অনায়াসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবেন, তাহাদিগের সে দুরাশা মাত্র। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী হইতেই কার্য আরম্ভ করিতে হইবে।'(৪৮)

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকাটি বিশেষভাবে চিহ্নিত করে 'সোমপ্রকাশ' লিখেছে—'শিক্ষিতদিগের নিকট আমাদের প্রত্যাশা অধিক। তাঁহারা শিক্ষিত জ্ঞানের রক্ষণ এবং উন্নতিসাধন করিয়া স্বদেশের শূণ্য জ্ঞান ভাণ্ডার পূর্ণ করিবেন, তাঁহারা এক ২ জন সাধুচরিত্রের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া জাতীয় অপকলঙ্ক দূরীভূত করিবেন, তাহাদিগের পরিশ্রম, উদ্যম, সাহস ও একতা দেখিয়া অশিক্ষিত, অলস, ভীরু ও কলহপ্রিয় লোক অনুসরণ করিতে শিখিবে এবং তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ক উন্নতির পতাকা ধারণ করিয়া ইতরেতরদিগককে আপনা-দের অনুযাত্রী করিয়া রাখিবেন, তাঁহাদিগের নিকট আমাদের এই প্রকার আশা। ইহা হইলেই সর্ব্বপ্রকার হীনতা অপসারিত হইয়া জাতীয় গৌরব ক্রমশ বর্দ্ধিত হয় এবং হিন্দু জাতি জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।... তাঁহাদের সকলের প্রতি আমাদের বক্তব্য, যেন তাঁহারা স্বার্থের সহিত স্বদেশার্থ কর্ত্তব্য স্মরণ রাখেন, কেবল স্মরণ নয়, পূর্ব্ব হইতে তজ্জন্য যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করেন।'(৫০)

লক্ষ্যণীয় যে যন্ত্র-সভ্যতার উপকরণগুলি আয়ত্ত করে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করল। যুগের সঙ্গে পা রেখে চলার এই সঙ্কল্পটি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ অনবদ্যভঙ্গীতে প্রকাশ করে লিখেছেন—'যন্ত্রে যারা পিছিয়ে আছে যন্ত্রে অগ্রবর্তীদের সঙ্গে তারা কোন-মতেই পেরে উঠবে না। এ যুগের শক্তিকে যদি গ্রহণ করতে পারি তাহলেই জিতব, তাহলেই বাঁচব।'(৫১) ঠিক এটিই ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনের

কথা। তাদের এই সকল বিষয়গতভাবে তাদের ইংরেজের প্রতিযোগী করে তুলল। কি শিক্ষকতা, কি সাংবাদিকতা, কি ডাক্তারি, কি ওকালতি, কি ব্যবসা-বাণিজ্য সব বিষয়েই ভারতীয়রা ইংরেজের সমকক্ষ হয়ে উঠতে চেষ্টা করল।

ক্রমে ক্রমে এই ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী যতই যোগ্যতা অর্জন করতে থাকল ততই ইংরেজ শাসক দলের লোকেরা তাদের ঈর্ষ্যার চোখে দেখতে আরম্ভ করল—এদের মধ্যে তারা ভবিষ্যৎ বিরোধিতার বীজের সন্ধান পেল। তাই আরম্ভ হল 'বাঙালী বাবুদের' বিরুদ্ধে অভিযান।(৫২)

কেন এই অভিযান? এর উত্তর দিতে গিয়ে 'ন্যাশনাল পেপার' লিখল—সাহেবরা শিক্ষিত বাঙালীদের তীব্র নিন্দা করতে আরম্ভ করেছে। তার কারণ—শিক্ষিত বাঙালীরা দিনে দিনে বড় মাইনের সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদের প্রতিযোগী হয়ে উঠছে। সামরিক বিভাগ ছাড়া আর কোন বিভাগ নেই যেখানে বাঙালীরা প্রবেশ করে নি। উকীল বারে ইংরেজ ব্যারিস্টার-দের চেয়ে বাঙালী উকীলদের সংখ্যা বেশি। তারা এমন কি সেই বিভাগেও দুজন প্রতিনিধি পাঠাতে সক্ষম হয়েছে যেখানে একজন ব্রিটিশ উকীলকে বাঙালীদের 'প্রভু' (My Lord) বলে সম্বোধন করতে হবে। এ একেবারে অসহ্য। তারপরে ইংরেজ সম্পাদিত একটি পত্রিকা থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরে বলা হয়েছে 'অবিলম্বে এই 'বাবুডমের' (babudom) পাল্টা শক্তি হিসাবে একটি দেশীয় অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে তোলা হোক, নতুবা এই বাঙালী এম-এ, বি-এ-রা—যাদের পদবীর মূল্য চীনাবাজারের জিনিষপত্রের বেশি নয়—তারাই সমস্ত বড় পদ বাঙলায় ত বটেই, এমন কি উত্তর ভারতেও দখল করে বসবে।(৫৩)

লালবিহারী দে সম্পাদিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' 'বাবু' প্রশ্নটির শুধু উদ্ভবের কারণটি নির্দেশ করে ক্ষান্ত থাকে নি, এই প্রশ্নটির এক সঠিক মূল্যায়ন উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছে।

ঐ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধে লেখা হয়েছে—সবচেয়ে নিন্দিত বস্তুর একটি হল 'বাবু', কি চার্চের পাদরীরা, কি সরকারী বড় অফিসাররা, বাবুকে নিন্দা করতে তারা এত পঞ্চমুখ যে ভদ্রতার সীমারেখাও ছাড়িয়ে যায়। তাদের অভিযোগ বাবুর শিক্ষা গভীর নয়, সে সৃজনশক্তিবর্জিত, সে স্বজাতি ও

স্ব-ধর্ম-চ্যুত। তার আরও দোষ—সে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সব সময়ে ঘোঁট পাকাবার চেষ্টা করছে।

লেখক জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন—উচ্চ শিক্ষা বাবুর মনে এনেছে বিচার-বুদ্ধি। সে দেশের ভাল-মন্দ সঠিকভাবে বিচার করতে শিখেছে. দেশ-প্রেমিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সরকারী কাজের প্রতিবাদ করতে শিখেছে. সে শাসক জাতি ও শাসিত জাতির মধ্যে বেড়া ভাঙ্গতে চাইছে। সাদা চামড়ার শ্রেষ্ঠত্ব সে মানতে চায় না। লেখকের মতে এটি জাতিবিদ্বেষ বলে চিত্রিত করা ভুল। তার প্রতি শাসকশ্রেণী প্রতিনিয়ত যে অন্যায় করছে, প্রতি-নিয়ত তার যে ক্ষতি করছে, এ হল তার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ। লেখক আরও বলেছেন—তবে বাবু মোটেই বিপ্লবী চরিত্র নয়। বেন্থামের ইউটিলিটেরিয়ান মতবাদ তার জীবনদর্শনকে নিয়ন্ত্রিত করে। জন স্টুয়ার্ট মিল তাদের দেবতা এবং তাঁর উপদেশ স্মরণ করে তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছে। তারা ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ চায় না. তারা ইংরেজ শাসনের আওতায় স্ব-শাসন চায়।

লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—যতই রাগ করুক শাসক শ্রেণীর লোকেরা বাবু যুগের প্রতিনিধি-স্বরূপ।(৫৪)

'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সবলতা ও দুর্বলতার দিকটি সঠিকভাবে তুলে ধরেছে।

এ কথা সত্য, প্রথম থেকেই এক ধরনের দ্বৈততা এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা যায়। এই দ্বৈততার মূলে ছিল তাদের সামাজিক অবস্থান।

এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্মের ইতিহাসটি আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। ইংরেজরা শাসন চালাবার প্রয়োজনে 'নিজস্ব তত্ত্বাবধানে', 'অনিচ্ছাকৃতভাবে', 'স্বল্প শিক্ষিত' একদল কেরানী তৈরী করতে চেয়েছিল।(৫৫) মেকলের ভাষায়—এরা হবে এমন একটি শ্রেণী যারা আমাদের (ব্রিটিশ) এবং অসংখ্য জনগণের (ভারতীয়) মধ্যে দোভাষীর কাজ চালাবে।(৫৬)

বস্তুত, ইংরেজরা সংকীর্ণ স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিশেষ এক ধরনের উচ্চ শিক্ষা-প্রবর্তন করতে চাইল।(৫৭)

উড সাহেবের মতটি উদ্ধৃত করলেই ইংরেজদের মাথায় কি ধরনের চিন্তা

ক্রিয়া করছিল তা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। তিনি লর্ড ডালহৌসিকে লিখিত এক পত্রে জানালেন—আমি মনে করি উচ্চ শিক্ষিত নেটিভরা বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীতে পরিণত হবার সম্ভাবনা, যদি না তাদের চাকরী দেওয়া যায় এবং তাদের সকলকে চাকুরী দিতে আমরা পারব না। ভবিষ্যতে যারা হবে নিন্দুক, সমালোচক ও বিক্ষোভকারী এমনি একটি গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠিত হতে দিতে আমি চাই না।(৫৮)

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই ইংরেজরা একদল স্বল্প শিক্ষিত কেরানী তৈরী করতে চেয়েছিল যারা সব সময়ে তাদের তাঁবে থাকবে। তারা হবে প্রভু, আর এরা হবে তাদের ভৃত্য।

উড সাহেব যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই ঘটল। ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা 'অর্ধ শিক্ষিত' ভৃত্য হয়ে থাকতে রাজি হল না। যুগচেতনাকে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করল। সরকারী অসহযোগিতাকে উপেক্ষা ক'রে নিজেদের উদ্যোগে তারা বিজ্ঞান-সম্মত উচ্চ শিক্ষার সঞ্জীবনী রসে জাতিকে পুনর্জীবিত করার চেষ্টা করল।(৫৯) কি প্রকৃতি বিজ্ঞান, কি সমাজ-বিজ্ঞান, কি অর্থনীতি বিজ্ঞান, কি রাজনীতি-বিজ্ঞান সব কিছুতেই পারদর্শিতা অর্জন করে তারা শাসকদের সমকক্ষ হয়ে উঠতে চেষ্টা করল। ইংরেজ শাসন বিদেশী শাসন হওয়ায় এবং জাতির উন্নতির দরজা বন্ধ হওয়ায় তারা ক্রমে বিক্ষুব্ধ হতে থাকল এবং ইংরেজ শাসনের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতে আরম্ভ করল।

পরাধীন দেশে শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে বিরোধ অনিবার্য এ হল তারই প্রকাশ। এই বিরোধের প্রকাশে ক্রমশ ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠল।

অবশ্য মনে রাখতে হবে, ইংরেজ শাসনের বিরোধী শক্তি হিসাবে এই শ্রেণীটির ভূমিকায় যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল। সংখ্যার দিক থেকে এরা ছিল বিপুল জনসংখ্যার এক নগণ্য অংশ।(৬০) রুজি-রোজগারের দিক থেকে, সরকারী চাকুরে হিসাবে, অথবা শিক্ষক, সাংবাদিক, উকীল বা অন্য কোন পেশাজীবী হিসাবে তারা ইংরেজ শাসনযন্ত্রের উপর নানাভাবে নির্ভরশীল ছিল। এই কারণে তাদের আচরণে এক ধরনের দ্বৈততা লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে বিরোধ থাকলেও তারা প্রায়শই আপোষের মধ্য দিয়ে এই বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করত। নিয়মতন্ত্রের পথ গ্রহণ করে তারা

নিজেদের অভিযোগ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করত। তারা চাইত—ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই অভিযোগগুলি নিয়ে আলোচনা উঠুক এবং অন্যায় ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ উপশম হোক।(৬১)

ইংরেজ শাসন বিদেশী শাসন এবং এই শাসনে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মত-প্রকাশের স্বাধীনতা যে খুবই সীমাবদ্ধ এবং সাধারণভাবে জাতির উন্নতির দরজা যে বন্ধ এ বিষয়ে এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা ভালোভাবেই জানত, তবে তারা মনের জ্বালা প্রকাশ করত নিয়মতান্ত্রিক ভাষায় ও ভঙ্গীতে।(৬২) তাদের এই মনোভঙ্গী প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে তারা বেন্থাম ও মিলের ইউটেলিটেরিয়ান মতবাদটিকে বিশেষ উপযোগী ব'লে মনে করতে থাকল। কেননা, এই মতবাদ ঔপনিবেশিক শাসনের আওতায় এক ধরনের উদারতা, এক ধরনের স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।(৬৩) ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ইউটেলিটেরিয়ান মতবাদে বিশ্বাসী ইওরোপীয়দেরও তাদের মিত্র ও সহযোগী বলে মনে করল। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি', 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে একটি নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে উঠল।

এক কথায় বাঙলার জাগরণের নেতারা ছিলেন শহরের বুদ্ধিদীপ্ত একটি ছোট গোষ্ঠী। এরা দেশের জাগরণ চাইলেন, তবে তার জন্যে তাঁরা বেছে নিলেন সংস্কারবাদের পথ।

দেশের ব্যাপক জনসাধারণ ও এঁদের চিন্তায়-ভাবনায় বেশ ব্যবধান ছিল: কৃষি-প্রধান দেশটির বিপুল জনসংখ্যা—যাদের অধিকাংশই বাস করত গ্রামে—তাদের মনোজগৎ সামন্ততান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। এমন কি জনসাধারণের চরিত্রের বলিষ্ঠ দিকগুলি—যা কখনও কখনও জাত-পাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অথবা স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহের আকারে দেখা দিত. সেগুলিও মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার চোরাবালিতে পড়ে অপমৃত্যুর সম্মুখীন হত।(৬৪) ১৮৫৭ সালের মহা-বিদ্রোহের মত বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনাটিও একই কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।(৬৫)

দেশের মধ্যে যদি যুগধর্মের আলোকে উদ্ভাসিত, বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের আদর্শে সঞ্জীবিত, একটি কৃষক-বিপ্লবের ধারার অস্তিত্ব থাকত, তাহলে তার পাশাপাশি সংস্কারবাদী বুর্জোয়া আন্দোলনকে রুগ্ন এক ধারা বলে উপহাস করা এবং নিন্দা করা যুক্তিযুক্ত হত।(৬৬) কিন্তু তদানীন্তন ঐতিহাসিক

অবস্থায় এই রকমের একটি অধিকতর বিপ্লবী ধারার অস্তিত্ব ছিল না এবং থাকা সম্ভবও ছিল না। তাই যত দুর্বলতাই থাকুক, বাঙলার জাগরণ তদানীন্তনকালে যুগধর্ম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই আন্দোলন প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করেছিল—দেশকে যুগধর্মের সঙ্গে পরিচিত করানোই দেশের সামনে সবচেয়ে বড় কাজ—এর মধ্যেই রয়েছে দেশের পুনরুজ্জীবনের মূলমন্ত্র।(৬৭)

বাঙলার জাগরণ ঃ ক্রম-বিকাশ

ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যায়, বাঙলার জাগরণের যেমন উত্থান আছে (ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা) তেমনি তার বিকাশ আছে (স্বদেশী আন্দোলন) এবং পরিণতি আছে (ভারতব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন)। গাছকে যেমন শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, জাতীয় আন্দোলনকেও তেমনি বাঙলার জাগরণ থেকে আলাদা ক'রে দেখা সম্ভব নয়। একটি পর্ব অপরটির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণকে পরবর্তীকালের ভারতব্যাপী জাতীয় জাগরণের প্রস্তুতিপর্ব বলা যেতে পারে। এই প্রস্তুতি-পর্বটিকে আবার মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি ১৮১৭ থেকে ১৮৫৭ : হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে মহাবিদ্রোহের সময় (১৮৫৭) পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি মহাবিদ্রোহ থেকে স্বদেশী আন্দোলন : এই আন্দোলনের (১৯০৫-১১) মধ্যে আমরা দেখতে পাই বাঙলার জাগরণের পূর্ণ বিকশিত রূপ।

প্রথম পর্ব (১৮১৭-১৮৫৭)

১৮১৭ থেকে ১৮৫৭—এই কালপর্বে বাঙলার জাগরণে প্রধান পুরুষ ছিলেন রামমোহন ও ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতৃবৃন্দ। এই যুগের প্রধান মুখপত্র 'বঙ্গদূত' 'জ্ঞানান্বেষণ,' 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'হিন্দু পেট্রিয়ট,' 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', প্রভৃতি।

এই পর্বে বাঙলার জাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য : যুগধর্মকে আকণ্ঠ পান করার প্রবণতা, আধুনিকতার কালস্রোতে অবগাহন করার এক দুর্দমনীয় আগ্রহ। যুক্তির পরীক্ষায়, বিজ্ঞানের পরীক্ষায় যা সিদ্ধ শুধু তাকেই গ্রহণ করার

আকাঙ্ক্ষা। এই যুগধর্মের কষ্টিপাথরে তাঁরা প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতিটি অনুশাসনকে যাচাই করে নিতে চাইলেন। দেশের সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তন,—যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল জাতিভেদ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, ভ্রূণ-হত্যা, কন্যা বিক্রয়, ধর্মের নামে নরহত্যা প্রভৃতি—তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠল। আধুনিকতার চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সতীদাহ প্রথা ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে রামমোহন যে সংগ্রাম পরিচালনা করেন, তদানীন্তনকালের বিচারে তা ছিল অতি সাহসী, সমাজের দিক থেকে অতি কল্যাণকর কাজ। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উপবীত ত্যাগ, আদালতে দাঁড়িয়ে ধর্মের নামে শপথ গ্রহণে আপত্তি প্রভৃতি—শুধু তাদের সমাজ-সংস্কার প্রবণতার সাক্ষ্য দেয় না, সামন্ততান্ত্রিক জীবনবোধের বিরুদ্ধে তাদের দৃঢ়পণ সংগ্রামের পরিচয় বহন করে। অক্ষয়কুমার লিখলেন 'অনেকে শৃগাল-প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূজা করিবেন, তথাচ সিংহ-প্রতিমূর্তি-দর্শনে অনুরাগী ও উদযোগী হইবেন না। এ দেশে মানব-প্রকৃতির কি বিকৃতি ও বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে।(৬৮) তদানীন্তনকালে পৈশাচিক সামন্ততান্ত্রিক অনুশাসনগুলি জাতির জীবনীশক্তির বিকাশকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল, জাতির বুকের উপর এই যে জগদ্দল পাথর চেপে বসেছিল তাকে অপসারিত করার জন্যে এই মরণ-পণ সংগ্রাম এর মূল্যকে কোনক্রমেই ছোট করে দেখা উচিত নয়।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' পড়লে বোঝা যায় এই সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনটি কিভাবে জাতিকে রুদ্ধস্রোত এক জীবনযাত্রার দিকে ঠেলে দিয়েছিল।(৬৯) রামমোহন বা ইয়ং বেঙ্গল কেউই এই অচলায়তনের মূলোচ্ছেদ করার কথা ভাবতে পারেন নি। কি ঔপনিবেশিক শাসনের চরিত্র, কি দেশীয় সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে এর যোগাযোগ, তাঁদের কাছে এর কোনটিই স্পষ্ট ছিল না। তাঁরা যা করতে চেয়েছিলেন তাকে অবশ্যই 'সামাজিক বিপ্লব' বলা যায় না।(৭০) আসলে এটি ছিল সমাজ সংস্কার আন্দোলন। তবে তদানীন্তনকালের পটভূমিতে এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলন—যা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিয়েছিল—তার মূল্য কম ছিল না।

এই পর্বে বাঙলার জাগরণের ভূমিকাটি নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টায় আজকাল কোন কোন গবেষক বলে থাকেন—এই যুগের নেতারা ইংরেজের দালাল ছিলেন। একথাটিও ঠিক নয়। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সমগ্র জাতির

মূল বিরোধ সম্পর্কে এই যুগের নেতারা যথেষ্ট সজাগ ছিলেন ; তবে তাঁরা তাঁদের মনের কথা সংস্কারবাদের ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন।

যেমন, ব্রিটিশ শাসন যে বিদেশীর শাসন, ইংরেজ বিজয়ী এবং ভারত বিজিত—এক কথায়, ভারত যে একটি পরাধীন দেশ এ সম্পর্কে রামমোহন বিশেষ সচেতন ছিলেন। তিনি লিখেছেন—ব্রিটিশ শাসনে ভারতের অধিবাসীরা 'তাদের রাজনৈতিক পদমর্যাদা ও ক্ষমতা হারিয়েছে।'(৭১) তাঁর এক বন্ধুর কাছে লেখা এক চিঠিতে তিনি মন্তব্য করেন 'একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির পক্ষে রাজনৈতিক দাসত্ব ও বিদেশী শক্তির অধীনতার কুফল সম্পর্কে অবহিত না থাকা অসম্ভব।'(৭২)

রামমোহনের মনে এ বিষয়েও প্রশ্ন ছিল না যে ইংরেজ যে উপায়ে ভারত জয় করেছে তাকে সমর্থন করা যায় না। ইংরেজ শাসন ভারতের ধন-সম্পদ যে শোষণ করছে এ বিষয়েও তাঁর মনে কোন প্রশ্ন ছিল না। প্রতি বছর তারা ভারত থেকে কি পরিমাণে অর্থ নিজের দেশে নিয়ে যায় তার হিসাব তিনি পরিবেশন করেছেন।(৭৩)

তবে রামমোহন মনে করতেন ইংরেজরা বিদেশী হলেও তাদের কাছে ভারতীয়দের বেশ কিছু শেখার আছে। আরও, ইংরেজ শাসন বিদেশীর শাসন হলেও এটি আপাতত ভারতীয়দের কাজে লাগবে। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন—'বর্তমান প্রজন্মের যুবারা, যারা কলকাতা শহরে বাস করে, যারা ইংরেজের সাহচর্যে ও যোগাযোগে গড়ে উঠছে, যারা ক্রমেই ইংরেজদের আচার-আচরণ, তাদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সুপরিচিত হচ্ছে, কালক্রমে তারা খুব সম্ভব তাদের কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হবে।'(৭৪)

রামমোহনের দাবি ছিল—ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ নয়, তবে ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায় ভারতীয়দের যথাযোগ্য স্থান পাবার অধিকার আছে। তিনি বলতেন—বেশ কিছুদিন ইংরেজ শাসনের অধীনে থাকতে হতে পারে, বেশি ক্ষতি স্বীকার না করে, ভারত আবার রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে পাবে।(৭৫) আর্নষ্টকে লেখা এক চিঠিতে তিনি এই আশা পোষণ করেন যে চল্লিশ বছরের মধ্যে ভারতে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা সম্ভব হবে এবং ভারত বিশ্ব-সমাজে অন্যান্য স্বাধীন দেশের পাশে যথাযোগ্য স্থান অধিকার করবে।(৭৬)

বলাবাহুল্য, এই কথাগুলির মধ্যে দিয়ে দালালের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় না, দেশপ্রেমিক কিন্তু সংস্কারবাদী—এমনি এক নেতার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে।

বিজয়ী ইংরেজ বনাম বিজিত ভারতবর্ষ, এই বিরোধ সম্পর্কে রামমোহনের মত ইয়ং বেঙ্গলও যে বিশেষ সজাগ ছিলেন—তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

'এশিয়াটিক জার্নালের' পাতায় একজন ইংরেজ একটি প্রবন্ধ লেখেন। ঐ প্রবন্ধে 'হিন্দু পাইওনিয়র' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের উল্লেখ রয়েছে, প্রবন্ধ দুটির শিরোনাম—'India Under Foreigners', এবং 'Freedom'. এই প্রবন্ধ দুটিতে ইংরেজ শাসনের সমালোচনা স্থান পেয়েছে; ইংরেজ শাসনে দেশের সন্তানদের শাসন-ক্ষমতা থেকে যেভাবে দূরে রাখা হয়েছে, এই প্রবন্ধ দুটিতে তার সমালোচনা করা হয়েছে। ইংরেজ সমালোচক মন্তব্য করেছেন—এই সব প্রবন্ধ থেকে দেশীয়দের মনের ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। তারা তাদের প্রকৃতি-প্রদত্ত অধিকার সম্পর্কে বেশ সজাগ। তারা তাকিয়ে আছে এমনি একটি দিনের জন্যে, যখন তারা নিজ অধিকার অর্জন করবে এবং নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।(৭৭)

'রিফর্মার' কাগজে প্রকাশিত জনৈক পত্রপ্রেরকের বক্তব্যে এই স্বাধীনতা-কামনা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ঐ পত্রপ্রেরক লিখলেন—যুগ যুগ ধরে ভারত কি বিদেশী শাসনের অধীনে গুমরে মরবে? ইংলণ্ডের উপর ভারতের নির্ভরতা দূর হলে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থান অনেক বেশী সম্মানজনক হয়ে উঠবে এবং ভারতের জনসাধারণ হয়ে উঠবে অধিকতর ধনী ও ঐশ্বর্যশালী। আমেরিকার দৃষ্টান্ত মনে রাখুন, সে যা-ছিল ইংরেজের অধীনতায়, আর যা-হয়েছে স্বাধীনতার পরে, তা স্বাভাবিকভাবে আমাদের উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে।(৭৮)

'দেশহিতৈষী সভার' (১৮৪১) এক অধিবেশনে জনৈক বক্তার বক্তব্যে দেশের পরাধীনতা সম্পর্কে চেতনা তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বললেন—এই দেশে প্রভুত্ব বিস্তারের দিন থেকে, বর্তমান শাসকদের নীতি হল—আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করে রাখা। তাঁরা একটার পর একটা আইন পাশ করে চলেছেন—তার লক্ষ্য আমাদের রাজনৈতিক অধঃপতন চিরস্থায়ী করা। তিনি অভিযোগ করলেন—ইংরেজ শাসনে এ-দেশের ভাগ্যে জুটেছে হৃদয়হীন শোষণ, সীমাহীন দারিদ্র।(৭৯)

সত্য বটে, উপরোক্ত প্রবন্ধগুলিতে ইংরেজ শাসনের যে সমালোচনা

প্রকাশ পেয়েছে তা কখনও নিয়মতন্ত্রের গণ্ডীকে অতিক্রম করে নি। তবুও ইয়ং বেঙ্গলের এই সকল উক্তি ইংরেজ শাসকদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্য করার বিষয়, এই বক্তব্যগুলিতে ইংরেজ শাসন ও ভারতীয়দের মধ্যে মূল বিরোধের দিকটি বেশ ফুটে উঠেছিল—যেটি লুকিয়ে রাখতে ইংরেজ শাসকেরা ছিল একান্ত তৎপর।

জাতি-ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের অঙ্গ হিসাবে দেশপ্রেমের চিন্তা—এই কাল-পর্বেই সর্বপ্রথম জন্ম লাভ করে। এই নতুন ধরনের দেশপ্রেমের প্রথম প্রবক্তা রামমোহন। তিনি লিখেছেন—এই নতুন ধরনের দেশপ্রেম (the notion of patriotism)—যার সঙ্গে ভারতবাসী পরিচিত ছিল না—তা জাগিয়ে তোলার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।(৮০)

ইউরোপীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও দেশের মাটির প্রতি ডিরোজিওর ছিল গভীর ভালবাসা। তাঁর কবিতার মধ্যে দিয়ে এই দেশপ্রেমের চিন্তা মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

স্বদেশ আমার! কিবা জ্যোতির মণ্ডলী ভূষিত ললাট তব, অস্তে গেছে চলে সেদিন তোমার, · (৮১) এই ধারা অনুসরণ করে ডিরোজিও-শিষ্য কাশীপ্রসাদ ঘোষ লিখলেন—Farewell my lovely native land।(৮২)

প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, বিশেষ করে নিয়মতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নটিও রামমোহন সর্বপ্রথম দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেন।(৮৩) পরবর্তীকালে ডিরোজিও-শিষ্যেরা এই নীতির গুরুত্বের কথা পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করেন। ট্যাক্স দেবে যে প্রতিনিধি পাঠাবে সে—এই নীতির ওপর ভর করেই ইয়ং বেঙ্গল ১৮৩৩ সালের চার্টার এ্যাক্টের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করেন এবং সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগের দাবিটি তাঁরা বার বার উত্থাপন করেন।

'জ্ঞানান্বেষণের' পাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর খ্রীস্টান চার্চের প্রতি পক্ষপাতিত্বের নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ধর্ম-নিরপেক্ষতাই সু-শাসনের প্রকৃষ্ট পথ। মানবিক অধিকারের প্রশ্নটিও এই যুগের নেতারা জোরের সঙ্গে তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাঁদের কণ্ঠস্বর উচ্চারিত হয়েছিল এই মানবিক অধিকার রক্ষার আগ্রহ থেকে। 'জ্ঞানান্বেষণ' লিখল—আর যাই হোক, ধর্মের নামে 'মেয়েদের হত্যা করার পবিত্র অধিকার' আর মেনে নেওয়া যায় না।(৮৪)

খাসিয়া প্রভৃতি পার্বত্য জাতিগুলিকে ইংরেজরা যেভাবে শাসন করছে তার প্রতিবাদ করে তাঁরা লিখলেন—খাসিয়াদের সভ্যতার সংস্পর্শে আনার চেষ্টা করে ইংরেজরা ভালই করছে, তবে তাদের জমি জবর দখল করা অন্যায়, কেননা তা হল তাদের মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নামান্তর মাত্র।(৮৫)

তবে এই যুগের নেতাদের আধুনিক চিন্তার এই বিবর্তন সরল রেখায় হয়েছিল—একথা মনে করলে ভুল হবে। এঁদের চিন্তায় উল্লিখিত ইতিবাচক দিকগুলি থাকলেও, কি রামমোহন, কি ইয়ং বেঙ্গল, কারুর পক্ষেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। এঁরা ইংরেজ শাসন ও ভারতের মধ্যে মূল বিরোধের প্রশ্নটি সম্পর্কে সাধারণভাবে সচেতন থাকলেও—ইংরেজ শাসনের ঔপনিবেশিক চরিত্র সম্পর্কে, বিশেষ করে, এই শাসনের অর্থনৈতিক শোষণের গভীরতার দিকটি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। বস্তুত. ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তাঁদের যথেষ্ট মোহ ছিল। তাঁরা মনে করতেন ইংরেজ শাসন দেশকে আধুনিক রূপান্তরের পথে বেশ কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যাবে। ইংরেজ শাসন যে ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উজ্জীবনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা—এই ধারনা তাঁদের ছিল না।(৮৬)

দ্বিতীয় পর্ব (১৮৫৭-১৯০৫)

১৮৫৭ থেকে ১৯০৫—এই কালপর্বে বাঙলার জাগরণে কিছু কিছু নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

ক্রমে ক্রমে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা ও প্রভাব—দুইই বৃদ্ধি পেতে থাকে। উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্যে কলকাতা ও মফঃস্বল সহরগুলিতে ভারতীয়দের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি কলেজ স্থাপিত হয়। গ্রাজুয়েটের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।(৮৭) কি সরকারী চাকরী, কি শিক্ষকতা, কি সাংবাদিকতা, কি আইন-বিদ্যা, কি কারিগরী বিদ্যা, কি বিজ্ঞান-গবেষণা—সর্বক্ষেত্রেই ভারতীয়রা যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু দেশ বিদেশী শাসনের করায়ত্ত থাকায় এই শিক্ষিত, যোগ্যতা-সম্পন্ন যুবকরা উপযুক্ত কাজ থেকে বঞ্চিত রইলেন; অনেকে বেকারের খাতায় নাম লেখাতে বাধ্য হলেন। ফলে, দেশে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে।

লক্ষ্য করার বিষয়, বাঙলার জাগরণের সমাজ-ভিত্তিও ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। ১৮১২-১৮৫৭—এই কালপর্বে বাঙলার জাগরণের প্রধান বাহন ছিলেন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা এবং কলকাতার কয়েকখানি সংবাদপত্র। কিন্তু ১৮৫৭ ১৯০৫—এই পর্বে কলকাতার সহরের মধ্যবিত্তের ব্যাপক অংশ ত বটেই, এমন কি কতকগুলি মফঃস্বল সহর—যেমন, ঢাকা, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান প্রভৃতিতে মধ্যবিত্ত, মধ্যস্বত্বভোগী এবং বায়ত চাষীর একাংশের মধ্যে বাঙলার জাগরণের আলো ছড়িয়ে পড়ে।(৮৮)

এই সব কারণে এই কালপর্বে বাঙলার জাগরণের ভাব ভাবনায় কিছুটা পরিবর্তন লক্ষিত হতে থাকে।

তাছাড়া, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ঘটনাটি বিবেকবান ভারতীয় নাগরিক মাত্রকেই ভাবিয়ে তুলল। এই ঘটনা উদ্ঘাটিত করে দিল ঔপনিবেশিক শাসনের নগ্ন চেহারাটি। ভারতবাসী মাত্রেই দেখল ইংরেজ শাসকদের আসল চেহারা, কি হৃদয়হীন তাদের ব্যবহার, স্বাধীনতার অধিকার চাইলে কি নিষ্ঠুর তার শাস্তি। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, কি রক্ষণশীল, কি লিবারেল, শাসকশ্রেণীর উভয় অংশই কিভাবে এক মূর্তি ধারণ করে স্বাধীনতা-কামী ভারতবাসীর ওপর হিংস্র নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।(৮৯) ইংরেজী শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীরা —যাঁরা আগে ইংরেজ শাসনের কল্যাণ-দায়িনী ভূমিকা সম্পর্কে অত্যধিক মোহ পোষণ করতেন—তাঁরাও আস্তে আস্তে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে আরম্ভ করলেন।

তাছাড়া, সমগ্র 'ইওরোপীয় সভ্যতা' সম্পর্কেই তাঁদের মোহ ক্রমশ হ্রাস পেতে লাগল। ইওরোপীয় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপ তাদের যুদ্ধবাদী নীতি (অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া এবং ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ), বিশেষ করে, তাদের ঔপনিবেশিক নিপীড়নের নীতি, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। এই অবস্থায়, তাঁরা ইওরোপীয় সভ্যতাকে নতুন করে যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

এই ঘটনাগুলি একটি নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি করল। একদিকে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে যতই মোহমুক্তি ঘটতে লাগল ততই ইওরোপীয় সভ্যতার আকর্ষণও হ্রাস পেতে থাকল; অন্যদিকে, ইওরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে মোহ যত হ্রাস পেতে থাকল ততই ইংরেজ শাসনকেও চিনে নেওয়া সহজ হল। এই

অবস্থায়, ইংরেজ শাসন ও পরাধীন ভারতের মধ্যে মূল বিরোধ সম্পর্কে চেতনা আগের তুলনায় অনেক বেশী স্পষ্ট আকারে দেখা দিল।

এই মূল বিরোধ সম্পর্কে চেতনা-বৃদ্ধির লক্ষণগুলি সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার পাতায় ছড়ানো রয়েছে। 'সোমপ্রকাশ', 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন' 'ন্যাশনাল পেপার', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতির পাতা ওলটালেই তা চোখে পড়বে। এখানে উদাহরণ হিসাবে তার সামান্য একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

'সোমপ্রকাশের' পাতায় ইংরেজ কর্তৃক ভারতের অর্থনৈতিক শোষণের চিত্রটি বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। 'সোমপ্রকাশ' লিখেছে—'সর্বদাই আমাদিগের গবর্নমেন্ট ও অন্য অনেক ইওরোপীয় 'ভারতবর্ষের অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন' এই কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই কথার যথার্থ অর্থ কি? ভারতবর্ষে প্রচুর তুলা উৎপন্ন ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীর সমুদায় খণ্ডে প্রেরণ করা কি ইহার মুখ্য অর্থ নয় কি? গবর্ণমেন্ট ভ্রমেও কি কখন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে ম্যাঞ্চেষ্টারের ন্যায় এখানে বাষ্পীয় তাঁত ও অন্যবিধ কল হয়? আমরা ইংলণ্ডের উপর বস্ত্রের জন্য নির্ভর না করিয়া ইংলণ্ড আমাদিগের উপর নির্ভর করিবেন—গবর্নমেন্ট কি কখনও এরূপ কথা মুখে আনিয়াছেন? যদি তাহা না হইল, তবে আমাদিগের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি কোথায়? যতদিন এদেশীয়েরা শিল্পকার্যে নিপুণ হইয়া এদেশের নানাবিধ দ্রব্যাদি উৎপন্ন ও প্রস্তুত করিতে না পারিবেন, তাবৎ অর্থাগমের দ্বার উদ্ভাবিত হইয়াছে, এ কথাটি বলা বার্তাশাস্ত্রানুসারে সম্মত হইতে পারে না।'(১০)

শুধু তাই নয়, 'সোমপ্রকাশ' এই মত জ্ঞাপন করেছে যে শিল্পায়নকে ত্বরান্বিত করার জন্যে দেশবাসীর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা উচিত—স্বদেশী জিনিষ উৎপাদন করব, স্বদেশী দ্রব্য পরিধান করব, স্বদেশী মনোভাব পোষণ করব। "সর্বসাধারণের সমবেত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত আমরা সাধ্যানুসারে স্বদেশোৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্য ভিন্ন দেশান্তরের দ্রব্য ব্যবহার করিব না"(১১)

'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে'ও—এই সুর ধ্বনিত হয়েছে। লেখা হল: দেশ বিলাতী দ্রব্যে ছেয়ে গেছে। এর প্রতিকারের একটি উপায় আছে। দেশবাসীকে একযোগে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে—"আমরা বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করব না, বিলাতী দ্রব্য বর্জন করব।"(১২)

'সোমপ্রকাশ' বা 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে'র চিন্তাকে একটি ব্যতিক্রম বলে মনে করলে ভুল হবে। এতটা স্বচ্ছদৃষ্টি না থাকলেও 'ন্যাশনাল পেপার', 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার পাতায় বহু প্রবন্ধে অনুরূপ মত প্রকাশ পেয়েছে।

এ-প্রসঙ্গে স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার, স্বদেশী জিনিষের প্রদর্শনী গঠন প্রভৃতি বিষয়ে 'হিন্দু মেলার' উদ্যোগ বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে।

শুধু অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার প্রশ্নটি নয়, দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রশ্নটিও এই সময়ে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠতে থাকে। স্বাধীনতার প্রশ্নটি সরাসরি উত্থাপন করে 'অমৃত বাজার পত্রিকা' লিখল—'ভারতবর্ষ ও ও ইংলণ্ডে সম্পূর্ণরূপে মিশিবার কোন সম্ভাবনা নাই। যখন সকলে একবাক্য হইয়া স্বাধীনতা প্রার্থনা করিবে, তখন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ইংলণ্ডকে এদেশ ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ একদিন কাল স্বাধীন হইবে তাহাতে চিন্তাশীল ইংরাজেরা কিঞ্চিৎ সন্দেহ করেন না, তবে আজ কি কালি, এ শতাব্দী কি অন্য শতাব্দীতে।'(২৩)

লক্ষ্যণীয় বিষয়টি এই যে নিয়মতন্ত্রের পথে স্থির থেকেও এই পত্র-পত্রিকাগুলি ইংরেজ শাসন ও ভারতবাসীর মধ্যেকার মূল বিরোধটি বেশ জোরের সঙ্গেই তুলে ধরতে আরম্ভ করেছিল। এই কাজটি সরকারের কাছে মোটেই প্রীতিপ্রদ ছিল না। তাই 'সোমপ্রকাশ' ও 'অমৃত বাজার পত্রিকার' মাথায় রাজরোষের খড়্গটি বিশেষভাবে উদ্যত ছিল। আরও লক্ষ্য করার বিষয়, এই কালপর্বে বাঙলার জাগরণের নেতাদের সঙ্গে জনগণের নেতাদের যোগাযোগও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই সময়ে বাঙলার বুকের ওপর দিয়ে কৃষক বিক্ষোভের ঝড় বয়ে যেতে থাকে। এই বিক্ষোভ দুটি বড় রকমের বিদ্রোহের আকারে দেখা দেয়। একটি নীল বিদ্রোহ (১৮৬০) এবং অপরটি পাবনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭)। এই বিদ্রোহ দুটি কৃষক সমস্যার তীব্রতা কতখানি তা দেশবাসীকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিবেকবান অংশ কৃষক সমস্যার গুরুত্বটি অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের চৌহদ্দীর মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁরা কৃষকদের সমর্থন করতে আগ্রহী

হলেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নীল চাষীদের সমর্থনে যে অভিযান পরিচালনা করেন তার মধ্যেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সমর্থনের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পাবনার কৃষক বিদ্রোহের পশ্চাতে যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে—'সাধারণী' একাধিক প্রবন্ধে তা বোঝাবার চেষ্টা করেছে। পাবনার কৃষক বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রবন্ধ লিখলেন। তাছাড়া, কৃষক সমস্যা নিয়ে বেশ কয়েকটি চিন্তাশীল প্রবন্ধ ও পুস্তক-পুস্তিকাও এই সময়ে প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গদেশের কৃষক' ও 'সাম্য', সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গল রাইয়টস্', রমেশচন্দ্র দত্তের 'দি পেজ্যান্ট্রি অব বেঙ্গল', অভয় চরণ দাসের 'দি ইণ্ডিয়ান রাইয়ট' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।(১৪)

এইসব পত্র-পত্রিকায় বা উপরোক্ত পুস্তক-পুস্তিকায় কোন সুরেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের দাবি উচ্চারিত হয়নি। তবে জোরের সঙ্গে বারে বারে ঘোষণা করা হয়েছে যে কৃষককে স্বত্বদানের (peasant proprietor-ship) নীতিই কৃষক সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায়। আশু দাবি হিসাবে তাঁরা চাইলেন এমন কিছু কৃষি-সংস্কার—যাতে জমিতে কৃষকের স্বত্ব আরও দৃঢ় হতে পারে এবং জমিদার কর্তৃক খাজনা বৃদ্ধির মাত্রাটি নির্দিষ্ট হতে পারে। তখনকার দিনে দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তরা—যারা নিজেদের স্বত্ব সুরক্ষিত করার জন্যে প্রতিনিয়ত সংগ্রামে রত ছিল—তাদের কাছে এই সব প্রস্তাব ছিল খুবই সহায়ক ও বন্ধুজনোচিত।(১৫)

এই কালপর্বে ইংরেজ শাসন ও ভারতীয়দের মধ্যে মূল বিরোধ সম্পর্কে চেতনা যতই গভীর হতে থাকে ততই জাগরণের নেতারা হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও বেশী বেশী সচেতন হয়ে উঠতে থাকেন। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বিধানের একটি নতুন সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা চলে। দুই সম্প্রদায়ের শিক্ষিত অংশ ভাবতে থাকেন—হিন্দু ও মুসলমান, ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে আলাদা, তাই এই দুই সম্প্রদায় পৃথক পৃথক ভাবেই গড়ে উঠবে। তবে দেশের উন্নতির স্বার্থে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব।

রাজনারায়ণ বসু লিখলেন—"আমাদিগের মুসলমান ভ্রাতাদিগের সহিত উক্ত ঐক্য সাধন হইতে পারে না, যেহেতু তাঁহাদিগের ধর্ম, আচার ব্যবহার, পুরাকালীয় প্রবাদ, আমাদিগের ধর্ম, আচার ব্যবহার, পুরাকালীয় প্রবাদ

হইতে বিভিন্ন। কিন্তু যখন আমরা একদেশবাসী ও এক রাজার অধীন তখন তাঁহাদিগের সহিত অন্য ঐক্য না হউক, রাজনৈতিক ঐক্য অবশ্য গঠিত হইতে পারে।"(৯৬)

'সোমপ্রকাশ' তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি, বিশেষ করে, ইংরেজের ভেদ-নীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিল। সারা ভারতব্যাপী রাজনৈতিক ও জাতীয় ঐক্য গঠনের এক পরিকল্পনা এই পত্রিকা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছিল এবং আলিগড়ের স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতে এক ব্যাপক রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ে তোলার গুরুত্বের প্রতি দেশ-বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।(৯৭)

'অমৃতবাজার পত্রিকা'ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ রচনা করে। নীল বিদ্রোহ ও পাবনার কৃষক বিদ্রোহের উল্লেখ করে এবং কলকাতায় গাড়োয়ানদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঐ পত্রিকা মন্তব্য করে—"যদি হিন্দুদের বুদ্ধি ও কৌশলের সঙ্গে মুসলমানদের এই সব গুণ একত্রিত করা যায়, তাহলে ভারতীয়রা সহজেই নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারবেন। মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে সদ্ভাব ও একতা সমগ্র দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হবে। বাঙলাদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কাজেই কি তাঁদের কি দেশের উন্নতির জন্যে মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে ঐক্য একান্ত বাঞ্ছনীয়।"(৯৮)

এই কালপর্বে বাঙলার জাগরণে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হতে থাকে। জাতীয় ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করার আগ্রহ বিশেষভাবে দেখা যায়। এই পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের সার্থকতা ছিল এইখানে যে ইংরেজ শাসন ও ভারতবাসীর মধ্যে মূল বিরোধের প্রকাশে তখনকার দিনে এটি একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

এই লক্ষ্য নিয়ে এই পর্বে ধারাবাহিকভাবে ইতিহাসের একটি জাতীয়তা-বাদী ব্যাখ্যা তুলে ধরার চেষ্টা চলে। যেমন, জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমার, ঝাঁসীর রাণী প্রভৃতির ভূমিকা চিত্রায়ণের চেষ্টা চলতে থাকে। (৯৯) রাজপুত কাহিনী, মারাঠা জাতির ইতিবৃত্ত, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ প্রভৃতি নিয়ে নতুন আখ্যান রচিত হয়।(১০০) ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিচার করলে এই ব্যাখ্যা সব সময়ে বৈজ্ঞানিক ও তথ্যানুযায়ী না হতে পারে, তবে তখনকার মত নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে

জাতীয়তাবাদী চিন্তা পৌঁছে দিতে এই ব্যাখ্যা অবশ্যই কাজে লেগেছিল। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দিক, বেদান্ত, উপনিষৎ প্রভৃতি নিয়েও এই সময়ে বেশ অনুশীলন আরম্ভ হয়। এই আলোচনাও দেশ ও জাতি সম্পর্কে গর্ববোধ জাগ্রত করে।

এই সময়ে বাঙলার জাগরণ সহরের হিন্দু মধ্যবিত্ত, গ্রামের হিন্দু মধ্যস্বত্ব-ভোগী ও রায়ত চাষীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তাই হিন্দু মধ্যবিত্তের মানসিকতা এই আন্দোলনে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। হিন্দু মধ্যবিত্তের কাছে সুপরিচিত উপনিষদের বাণী, গীতার কর্মযোগ, অধ্যাত্মবাদ মিশ্রিত ত্যাগের আদর্শ প্রভৃতিকে অবলম্বন করে এই সময়ে এক স্বদেশী মনোভাব দানা বাঁধতে থাকে। পুনরুজ্জীবনবাদের ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গীতে প্রকাশিত এই আন্দোলনে স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয় ঐতিহ্যের নামে হিন্দু ঐতিহ্যই প্রাধান্য লাভ করে। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয়: এই আন্দোলন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা দোষে কখনও দুষ্ট হয় নি।

রাজনারায়ণ বসুর প্রেরণায়, নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে এবং গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে যে হিন্দু মেলা ও জাতীয় মেলা গড়ে ওঠে তা তখনকার দিনে স্বদেশী মনোভাব সৃষ্টিতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। জাতিগঠনের অঙ্গ হিসাবে শরীর চর্চা, স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার, দেশাত্মবোধক সাহিত্য রচনা প্রভৃতি এই মেলার লক্ষ্য ছিল। এই মেলার মঞ্চে স্বদেশী ভাবোদ্দীপক নাটক অভিনীত হত, জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হত। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মিলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান'—এই মেলাকে উপলক্ষ্য করে রচিত হল। এই হিন্দু মেলার অধিবেশনেই রবীন্দ্রনাথ গাইলেন—'ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক আমরা গাব না, আমরা গাব না হরষ গান, এসো গো আমরা যে ক-জন আছি আমরা ধরিব আর এক তান।'(১০১)

উপরোক্ত লাইনগুলি থেকে পরিষ্কার যে হিন্দু মেলা হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও কখনও সংকীর্ণ হিন্দু জাতীয়তাবাদের রূপ গ্রহণ করে নি।

প্রকৃতপক্ষে, এই যুগের পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের ইতিবাচক দিকটি এইটিই যে এই আন্দোলন হিন্দু মধ্যবিত্তের বিভিন্ন স্তরে সাধারণভাবে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী, জাতীয়তাবাদী মনোভাব বিস্তারে সাহায্য করেছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী এই আন্দোলনের সারবস্তুটি তুলে ধরতে গিয়ে

লিখেছেন—হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলন 'দেশের লোকের মনে স্বদেশীভাবকে জাগ্রত করিয়াছে।'(১০২)

বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের রচনা ও বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পুনরুজ্জীবনবাদী প্রবণতাটি, এই স্বদেশী মনোভাব রচনার সড়ক ধরে, আরও অগ্রসর হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' গান এবং বিবেকানন্দের জাতির প্রতি আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার উদাত্ত আহ্বান, জাতীয় চেতনা উন্মেষে এক অমোঘ অস্ত্র হিসাবে কাজ করেছিল।(১০৩)

তবে এই পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের দুর্বলতার দিকটি সম্পর্কে উদাসীন থাকা উচিত নয়। ঐতিহাসিক কারণে এই আন্দোলন শিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং তাদের মধ্যে স্বদেশী মনোভাব জাগ্রত করতে বেশ কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন—এই যুগের পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের হিন্দু মানসিকতা হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার পক্ষে মোটেই উপযোগী ছিল না।

কোন কোন ক্ষেত্রে, এই হিন্দু মানসিকতা তদানীন্তন কালেই মুসলমান সমাজের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দুএকটি উক্তির প্রসঙ্গ অবশ্যই উঠতে পারে।(১০৪)

এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে এই হিন্দু অধ্যাত্মবাদী মানসিকতা—যা ছিল অশিক্ষিত কৃষক সমাজের নাগালের বাইরে—সমাজের 'নিম্নতর' শ্রেণীগুলির কাছে তার অবেদন অতি অল্পই ছিল।

তাছাড়া, এই পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতার দিক ছিল এইখানে যে 'ইওরোপীয় সভ্যতার' বিরুদ্ধে অভিযানের নামে এই আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রে আধুনিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করতে থাকে। ইওরোপীয় সভ্যতার সবকিছু খারাপ এবং ভারতীয় সভ্যতার সবকিছু ভাল, এমনকি জাতিভেদ প্রথাকে আদর্শায়িত করে দেখানোর চেষ্টা, বিধবা-বিবাহ আন্দোলন সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাব গ্রহণ, তথাকথিত স্বদেশীয়ানার নামে ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিক মানসিকতাকে হেয় জ্ঞান করা—এই ধরনের প্রবণতাগুলি নিঃসন্দেহে পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের নেতিবাচক দিক।(১০৫)

এই আন্দোলনের নেতারা বুঝতে পারেন নি যে তদানীন্তনকালে ইওরোপীয় সভ্যতার সঙ্কটের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল ক্ষীয়মান ধনতান্ত্রিক

সভ্যতার সঙ্কট। তাঁরা ধনতন্ত্রের সঙ্কটকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সঙ্কট বলে মনে করলেন। ইওরোপীয় আধুনিক সভ্যতার অভ্যন্তরে যে নতুন উপাদানগুলি সঞ্চারিত হতে আরম্ভ করেছিল, যেমন ধনতন্ত্র-বিরোধী জাগরণ, শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতান্ত্রিক ভাবনা প্রভৃতি, এগুলি সম্পর্কে তাঁদের ভাসা-ভাসা জ্ঞান ছিল, সাধারণভাবে এই আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁদের সম্যক উপলব্ধি ছিল না।

ইওরোপীয় সভ্যতা ও ধনতান্ত্রিক সভ্যতাকে সম-অর্থবাচক ধ'রে নিয়ে তাঁরা বিশ্ব বিকাশের মূল স্রোত থেকে নিজেদের বেশ কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। ইওরোপীয় সভ্যতা ও ভোগসর্বস্বতার আদর্শের তুলনায় ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ ও ত্যাগের আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার চেষ্টা চলল। ইওরোপীয় সভ্যতার তুলনায় ভারতীয় সভ্যতা যে নিকৃষ্ট নয়, অনেক ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ এই বক্তব্যকে অবলম্বন করে ভারতের এক নিজস্ব জগৎ, এক নিজস্ব বাণী, এক নিজস্ব সত্তা আবিষ্কারের চেষ্টা চলল।(১০৬)

বাঙলার জাগরণের ঐতিহাসিক মূল্য

প্রথম যুগে (১৮১৭—৫৭) পাশ্চাত্য সভ্যতার সুফলগুলিকে গ্রহণ করার দিকে অত্যধিক ঝোঁক (বিশেষ করে, ইয়ং বেঙ্গলের ক্ষেত্রে) এবং দ্বিতীয় যুগে ঐতিহ্য সন্ধানের দিকে ঝোঁক (বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে)—বাঙলার জাগরণে যথাক্রমে দুটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে এই দুই প্রবণতাকে পরস্পর-বিরোধী ভাবার কোনো কারণ নেই, কেননা দেশের উন্নতি-বিধানের আকাঙ্ক্ষা উভয়ের মধ্যেই ফল্গুধারার মত সব সময়েই প্রবহমান ছিল।

কিন্তু গবেষকদের মধ্যে কেউ কেউ এই দুটি ধারাকে—একটিকে অপরটির বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে থাকেন। কোন কোন গবেষকের মতে—ইয়ং বেঙ্গল 'হীরো', আর বঙ্কিম-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত পুনরুজ্জীবন আন্দোলন তুলনায় অপেক্ষাকৃত পশ্চাৎগামী আন্দোলন। আবার কোন কোন গবেষকের চোখে বঙ্কিম-বিবেকানন্দই আসল দেশপ্রেমিক, আর ইয়ং বেঙ্গল ইংরেজ পদলেহী নকল নবীশের দল।(১০৭)

এর কোনোটিই ঠিক নয়। এই দুই ধারার মিলের দিকটি উপেক্ষা করে এর পার্থক্যের দিকটির ওপর বেশি জোর দেওয়া সমীচীন নয়।

ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর চিন্তায় একটি ইতিবাচক দিক অবশ্যই আছে। সেটি এই যে তাঁরা মধ্যযুগীয় তমিস্রা থেকে দেশবাসীকে যুগধর্মের আবর্তে টেনে আনার আকাঙ্ক্ষা আন্তরিকভাবে পোষণ করতেন। পাশাপাশি তাঁদের দুর্বলতার দিক এইখানে যে তাঁদের বাস্তব অবস্থাকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। ইংরেজ শাসন ও দেশবাসীর স্বার্থের মধ্যে যে মূল বিরোধ ছিল সে সম্পর্কে তাঁদের চেতনা ছিল খুবই অপরিণত। অপরদিকে, পুনরুজ্জীবন-বাদী আন্দোলনের ইতিবাচক দিক এইখানে যে তাঁরা এই মূল বিরোধ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন। তাঁরা জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে গর্ববোধ জাগরিত করে দেশের মধ্যে স্বদেশী মনোভাবকে পুষ্ট করে তুলতে সাহায্য করেন। এই আন্দোলনের দুর্বলতার দিক এইখানে যে এক ধরনের জাতি-গর্বী মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, দেশের প্রচলিত সামাজিক অনুশাসনগুলিকেও তাঁরা অনেক সময় আদর্শান্বিত করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাছাড়া, বিশ্বব্যাপী আধুনিকতার মূল স্রোত থেকে দেশকে কতকটা বিচ্ছিন্ন করে দেখার প্রবণতাকেও তাঁরা প্রশ্রয় দিয়েছেন।

আসল কথা এই দুটি ধারাই দেশের একটি নিজস্ব সত্তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে।(১০৮) তবে সমাজ-বিকাশের দিক থেকে অপরিণত এই দুই ধারার কোনটির পক্ষেই একটি অসম্পূর্ণ মডেলের বেশি কিছু উপস্থিত করা সম্ভবপর হয়নি।(১০৯)

প্রকাশভঙ্গীতে পার্থক্য থাকলেও এই দুই ধারার মধ্যে একটি অন্তর্নিহিত মিলের দিক রয়েছে। সেটি বিস্মৃত হলে চলবে না। শ্রেণীমূলের দিক থেকে বিচার করলে, এই দুটি ধারার মধ্যেই রয়েছে বুর্জোয়া লিবারেল দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব, যা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তার আকারে আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে আবির্ভূত হয়েছিল।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তার কয়েকটি দিক পরাধীন দেশের লোকের কাছে বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়ে ওঠে। যেমন, ইওরোপে জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র (nation state) গঠনের প্রক্রিয়াটি এবং তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দেশপ্রেমের আদর্শটি তাঁদের মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। প্রথম যুগের নেতাদের বিশেষ আকৃষ্ট করে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী, দ্বিতীয় যুগের নেতারা ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি প্রভৃতির আদর্শের দ্বারা বিশেষ উদ্বুদ্ধ হন।(১১০)

ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের আদর্শও উভয় যুগের নেতারাই ইওরোপ থেকে গ্রহণ করেছেন। প্রথম পর্বের নেতারা ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় ইওরোপীয় ধনবাদী ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব দেখে বিশেষ মুগ্ধ হন। দ্বিতীয় পর্বের বিখ্যাত মুখপত্রগুলিতে যেমন 'সোমপ্রকাশ', 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতির পাতায় ভারতীয় সামন্তবাদী উৎপাদন-ব্যবস্থার তুলনায় ইওরোপীয় যন্ত্র শিল্প ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃ-পুনঃ স্বীকৃত এবং ভারতবাসীকে এই দ্বিতীয় ধারা অনুসরণ করতে এই পত্রিকাগুলি বার বার আহ্বান জানায়। দেশের কৃষি সঙ্কটের সমাধানের উপায় হিসাবেও তারা ইওরোপীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কৃষকের স্বত্বদানের ((peasant proprietorship) আদর্শটিই তুলে ধরেছে।

রাজনৈতিক আচরণের আদর্শও তাঁরা সংগ্রহ করেছেন ইওরোপ থেকে। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের ধারণাটি—ট্যাক্স দেবে যে, রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে তাকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে—এই নীতিটিও তাঁদের বিশেষ আকর্ষণের বস্তু হয়ে ওঠে। পরাধীন দেশের কাঠামোতে ইউটেলিটেরিয়ান মতবাদ (প্রথম পর্বে বেন্থাম ও পরে মিল) ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার চিন্তা বিশেষ উপযোগী বলে মনে হল। এই মতবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে 'সোমপ্রকাশ', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি স্ব-শাসনের দাবি, এমন কি কেউ কেউ 'হোম রুলের' দাবি উত্থাপন করেছে।(১১১)

তাছাড়া, ইওরোপীয় রাজনীতি চিন্তার অন্যান্য দিক যেমন ধর্ম-নিরপেক্ষতার দিক, মানবিক অধিকারের দিক, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শের দিক—বাঙলার জাগরণের উভয় যুগের নেতাদের মনকে বিশেষ স্পর্শ করেছে।

এক কথায় বুর্জোয়া প্রগতিবাদী চিন্তা উভয় যুগের নেতাদের একসূত্রে গ্রথিত করেছিল।

আর এক দিক থেকেও উভয় ধারাই সম-চরিত্র-বিশিষ্ট। দুটি ধারাই সংস্কারবাদী আন্দোলনের চৌহদ্দী কখনও অতিক্রম করে নি। উভয় ধারার নেতারাই মনে করতেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদের দাবি উত্থাপন করা সময়োচিত নয়। উভয়েই কখনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরও উচ্ছেদ দাবি করে নি।

এই সব দুর্বলতা সত্ত্বেও যে আন্দোলন সাধারণভাবে বিশ্ব বিকাশের গতিধারার সঙ্গে দেশবাসীকে পরিচিত করতে সাহায্য করে, যে আন্দোলন

দেশবাসীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত করতে সাহায্য করে, যে আন্দোলন দেশবাসীর মধ্যে মানবিকতার বোধ সঞ্চার করতে সাহায্য করে, তার মূল্য কম নয়। বস্তুত, প্রকাশভঙ্গীতে পৃথক হলেও এই দুই ধারা একই গতিমুখের দিকে ধাবিত হয়েছিল—এই দুই ধারাই আমাদের দেশে ভবিষ্যতে গড়ে ওঠা জাতীয় আন্দোলনের জমিটি প্রস্তুত করেছিল।

শুধু তাই নয়। এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চেতনা ক্রমশ জনসাধারণের বিভিন্ন স্তরে প্রবেশ করতে থাকে। একথা সত্য, ১৮১৭-১৮৫৭ : কালপর্বে বাঙলার জাগরণের নেতাদের সঙ্গে গ্রামের লোকদের যোগাযোগ ছিল খুবই ক্ষীণ, তবে এই যুগের নেতাদের কাছে জনসাধারণ একেবারে অনুপস্থিত ছিল—একথা ভাবলে ভুল হবে। কৃষকের সমস্যা সম্পর্কে রামমোহন বিশেষ অবহিত ছিলেন। ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্রগুলি, যেমন, 'জ্ঞানান্বেষণ' 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রভৃতিও কৃষক সমস্যার গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করে। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে এই যুগের নেতারা তদানীন্তন কালের কৃষক বিদ্রোহগুলিতে (যেমন, তিতুমীরের বিদ্রোহ, পাগলাপন্থিদের বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রভৃতি) যে তীব্র কৃষি সঙ্কট প্রতিফলিত হয়েছিল তাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে পারেন নি। (১১২)

১৮৫৭-১৯১১ : এই কালপর্বে বাঙলার জাগরণের নেতাদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগসূত্র উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ক্রমে ক্রমে শহর ও গ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের ব্যাপক অংশ এবং তাদের মাধ্যমে কৃষক সমাজের উপরতলার অংশের উপর এই জাগরণের প্রভাব পড়তে থাকে। নীল বিদ্রোহ ও পাবনার কৃষক বিদ্রোহের তরঙ্গশীর্ষে কিভাবে বাঙলার জাগরণের নেতারা কৃষক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে আরম্ভ করেন এবং জমিতে কৃষকের স্বত্বের প্রশ্নটি জোরদার করার দাবিতে এক সংস্কারবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন তার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮৭১-৮৫—এই বছরগুলিতে যখন 'রেণ্ট বিল' নিয়ে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' যেমন জমিদারদের পক্ষ অবলম্বন করে আন্দোলন আরম্ভ করলেন, তেমনি 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' রায়তদের পক্ষ সমর্থন করে আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। স্থানে স্থানে 'রায়ত সভা' গঠিত হয়। রায়তদের স্বার্থে ভূমি সংস্কারের দাবিতে বাঙলার গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় কৃষক সমাবেশ সংগঠিত হয়।

শুধু রায়ত চাষী নয়, চা বাগানের কুলিদের সমর্থনেও 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' আন্দোলন সংগঠিত করতে অগ্রসর হয়। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা চা-বাগিচাগুলিতে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। বেঙ্গলীতে "Slave Trade in Assam" নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে'র এইসব কাজ-কর্ম বাঙলার জাগরণের চিন্তাকে রায়ত চাষীদের মধ্যে পৌঁছে দিতে কিছুটা সাহায্য করেছিল।

বলা বাহুল্য, ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে বাঙলায় যে স্বদেশী আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তাকে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণ থেকে পৃথক করে দেখা যায় না। হিন্দু মেলা, ভারত সভা, ন্যাশনাল কনফারেন্স ও সর্বশেষে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস—এই সংগঠনগুলি একটির সঙ্গে অপরটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। হিন্দুমেলার পক্ষ থেকে স্বদেশী শিল্পে উৎসাহদান, স্বদেশী নাটক অভিনয়, জাতীয় সঙ্গীত রচনা প্রভৃতি দেশে যে স্বাদেশিকতাব মনোভাব সৃষ্টি করেছিল এবং স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমি প্রস্তুত করতে সাহায্য করেছিল তা কে অস্বীকার করবে।

স্বদেশী আন্দোলনই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তায় উদ্দীপ্ত ভারতের প্রথম গণ-আন্দোলন। এই আন্দোলনে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এই আন্দোলনের মঞ্চে সমবেত হয়েছিল একদিকে জমিদার ও বণিকদের দেশপ্রেমিক অংশ, অন্যদিকে সহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত, গ্রামের মধ্যস্বত্বভোগী, রায়ত চাষী, সহরের শ্রমিক প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের গ্রামগুলি, বিশেষ করে কৃষক সমাজের উপরতলার অংশ এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিল। স্বদেশী যুগের নেতারা ছোট-বড় নানা ধরনের স্ট্রাইক সংগঠিত করে শ্রমিকদের মধ্যে জাতীয় চেতনা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করেছিল।

সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরে বাঙলার বুকে বিন্দু বিন্দু করে যে জাতীয় ও গণতান্ত্রিক চেতনার উন্মেষ ঘটে স্বদেশী আন্দোলন তারই ফসল। বস্তুত স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে বাঙলার জাগরণ সার্থক পরিণতি লাভ করে। (১২৩)

আর একটি কথাও বলা প্রয়োজন—এইভাবে বাঙলায় যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্বোধন হয় তা সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী যে অহিংস গণ-আন্দোলন গড়ে

উঠেছিল—তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চেতনার আরও বলিষ্ঠ প্রকাশ।(১১৪)

বস্তুত, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মূলনীতিগুলি—যা পরবর্তীকালে আরও বিকশিত হয়ে উঠেছে—যেমন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের আদর্শ, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের আদর্শ, মানবিক মূল্যবোধ, ধর্ম-নিরপেক্ষতার চিন্তা, আন্তর্জাতিক চেতনা প্রভৃতি বাঙলার জাগরণের মধ্যেই প্রথম অঙ্কুরিত হয়। জাতীয় জাগরণের আদর্শগত দিকগুলি যেহেতু বাঙলার মাটিতে প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছে, যেহেতু দীর্ঘ একশত বৎসর ধরে এই নীতিগুলি নিয়ে বাঙলার পত্র-পত্রিকায় বাক্ বিতণ্ডা চলেছে, তাই বাঙলার জমিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পলিমাটি পড়েছে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি আজ তুলনামূলকভাবে জাত-পাতের লড়াই, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার বিষ থেকে মুক্ত—তার মূলে রয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ। এরই মধ্যে নিহিত রয়েছে বাঙলার জাগরণের ঐতিহাসিক সার্থকতা।(১১৫)

থাকেন যে রেনেসাঁসের সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকটির ওপর গুরুত্ব না দিয়ে তিনি ভুল করেছেন।

২ ইতালীতে ধনতন্ত্রের উন্মেষ সম্পর্কে মার্কসের মন্তব্য দ্রষ্টব্য—Marx, *Capital* (Moscow) Vol I, p. 716, footnote. রেনেসাঁস সম্পর্কে এঙ্গেলস—Marx-Engels, *On Literature and Art* (Moscow), pp. 246-47, 251-53

৩ এনলাইটেনমেন্ট সম্পর্কে এঙ্গেলস—Marx-Engels, *On Literature and Art*, pp 270-71, 284-86, এ সম্পর্কে লেনিনের মন্তব্য—Lenin : The Heritage we Renounce, Collected Works, Vol. II, pp. 493-506

৪ বুর্জোয়া যুগের উদ্বোধনকালে রেনেসাঁস, রিফর্মেশন, এনলাইটেনমেন্ট প্রভৃতি আন্দোলনগুলি যে মানবজাতির ইতিহাসে সমগ্রভাবে এক অগ্রগামী স্তরের সূচনা করেছে—এ বিষয়ে মার্কসবাদীরা দৃঢ় মত পোষণ করেন। তবে তাঁরা এই বুর্জোয়া জাগরণের ভিতরে যে গণ-আন্দোলনের ধারাটি (যেমন—সিওম্পি বিদ্রোহ, জার্মানীর কৃষক বিদ্রোহ, ফরাসী বিপ্লবে জেকোবিনদের ভূমিকা প্রভৃতি) বিদ্যমান ছিল তার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। তাদের মতে এই গণ-আন্দোলনগুলি পরবর্তীকালের সর্বহারা শ্রেণীর আন্দোলনগুলির পূর্বসূরী। অপর পক্ষে, সম্প্রতিকালে পাশ্চাত্যদেশীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ বুর্জোয়া জাগরণের এই গণ-ভিত্তির দিকটিকে যথাসম্ভব খাটো করে দেখার পক্ষপাতী। তাঁরা এনলাইটেনমেন্ট আন্দোলনের 'র‍্যাডিকাল' দিকটির ওপর খড়্গহস্ত। তাদের মতে বস্তুবাদীরা (হেলভিটিয়াস ও হলব্যাক) সাম্যবাদী গণতন্ত্রীরা (ম্যাবলে ও রুশো), কমিউনিস্টরা (মরেলি) জেকোবিনদের ও বাবুফের ষড়যন্ত্রের পূর্বসূরী—শেষোক্তরা আবার বর্তমানকালের একনায়কতন্ত্র বিশ্বাসীদের (বিশেষ করে কমিউনিস্টদের) আগমনের পথ প্রস্তুত করেছে (Encyclopaedia on Marxism, Communism and Western Society, Vol III, pp. 170-82).

৫ এনলাইটেনমেন্ট সম্পর্কে এঙ্গেলস—Marx-Engels, On Literature and Art, pp. 270-71

৬ Lenin—Under a False Flag, Vol 21, pp. 143-45

৭ মার্কস বলেছেন—"The country that is more developed industrially only shows, to the less developed, the image of its own future."—Capital, Vol. I, Preface to the first German edition.

৮ এশিয়ার বুকে এই বুর্জোয়া জাগরণের হাওয়া কিভাবে এসে লাগল তার পরিচয় দিতে গিয়ে লেনিন লিখেছেন- পশ্চিম ইওরোপের দেশগুলিতে (ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে) ১৭৮৯ থেকে ১৮৭১—মোটামুটি এই কালপর্বের মধ্যে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব জয়যুক্ত হয়। আর পূর্ব ইওরোপ ও এশিয়ায় ১৯০৫ সালের পরবর্তীকালে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর আরম্ভ হয় (Lenin—The Right of Nations to Self-determination,

Works Vol. 20, pp. 405-06)। তিনি আরও বলেছেন—এই কালপর্বে এশিয়ার দেশগুলিতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এক দল বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি হয়েছে—যারা নিজ নিজ দেশকে যুগধর্মে দীক্ষিত করতে আরম্ভ করেছে। তিনি মন্তব্য করেছেন—'ইওরোপীয় চেতনা এশিয়ায় ইতিমধ্যেই জেগে উঠেছে, এশিয়ার জনগণ গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে'। (**Lenin-Inflammable Material in World Politics, vol 15, pp. 182-88; Civilised Europeans and Savage Asians, vol. 19, pp 57-58 The Awakening of Asia. vol 19, pp. 85-86.**)

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলায় যা ঘটেছিল তাকে বলা চলে এই বুর্জোয়া জাগরণের প্রারম্ভিক পর্ব।

৯ এশিয়ার দেশগুলিতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্বৈতচরিত্র সম্পর্কে লেনিনের ব্যাখ্যা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন। এমনকি, এইসব দেশে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিণত অবস্থাতেও এই দ্বৈতচরিত্র ছিল আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। (**Lenin—The Right of Nations to Salf-determination, Works, vol 20, pp 409-12, Preliminary Draft of Theses on the National and Colonial Questions, vol 31, pp 122-28, Report of the Commission on the National and Colonial Questions, vol 31, pp. 215-20.**)

১০ **Marx –The British Rule in India** নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্য করার বিষয় ইংরেজ আগমনের পূর্বেকার অবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রায় এক কথাই বলেছেন —"যেদিন দুর্দিন যখন এল এই দেশে, তখন জ্ঞানের চলমান গতি হল স্তব্ধ, নির্জীব হল নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি, উদ্ধত হয়ে দেখা দিল নিষ্ফল আচারপুঞ্জ, আনুষ্ঠানিক নিরর্থকতা, মননহীন লোকব্যবহারের অভ্যস্ত পুনরাবৃত্তি। সেকালের সমস্ত বাহ্যিকতা ভারতকে বাধাগ্রস্ত করলে, খণ্ড খণ্ড সঙ্কীর্ণ সীমানার বাইরে বিচ্ছিন্ন করল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে। -'ভারত-পথিক রামমোহন রায়'

১১ **Marx-Capital, vol III, pp 776-77.**

১২ চিঠি: মার্কস থেকে এঙ্গেলস, ১৪ জুন, ১৮৫৩।

১৩ **Marx–The British Rule in India** ও **The Future Results of British Rule in India** নামক প্রবন্ধ দুটি দ্রষ্টব্য। এই প্রবন্ধ দুটিতে প্রতিফলিত হয়েছে ভারতের জাগরণ সম্পর্কে এক বৈজ্ঞানিক, বৈপ্লবিক ভবিষ্যৎ-চিন্তা।

১৪ সংক্ষেপে বলতে গেলে দাঁড়ায়, মার্কস যা চাইলেন তা হলো ভারতের পুনরুজ্জীবন, আধুনিকীকরণের ভিত্তিতে। তিনি আরও চাইলেন এই পুনরুজ্জীবন হওয়া চাই ব্যাপক জনগণের স্বার্থে। এক কথায়, মার্কস তুলে ধরলেন, ভারতের বৈপ্লবিক গণতান্ত্রিক জাগরণের এক সম্ভাব্য রূপরেখা।

১৫ বাঙলার জাগরণের বিজ্ঞান-সচেতনতার দিকটির প্রতি প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ও তাত্ত্বিক ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কৃতজ্ঞচিত্তে সেই ঋণ স্বীকার করি।

১৬ আমহার্স্টের কাছে লেখা চিঠি—শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুবাদ—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ৮১-৮২।

১৭ Bengal Spectator—May 1842.

১৮ ঐ, জানুয়ারি ১, ১৮৪৩।

১৯ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৭৭২।

২০ ঐ, 'বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা', শ্রাবণ, ১৭৭৮।

২১ অক্ষয়কুমারের ধর্মমতের পরিবর্তন সম্পর্কে লিখতে গিয়ে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—"বিজ্ঞান-সম্মত পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব পাঠে, মানুষের জ্ঞান যে ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং ইন্দ্রিয়বোধেরই সমষ্টিমাত্র, এইরূপ তাহার ধারণা জন্মে। তত্ত্বান্বেষী অক্ষয়কুমার সুতরাং কতকটা অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়িলেন।" জাস্টিস সারদাচরণ মিত্র লিখেছেন—তিনি 'প্রকৃতিবাদী হইয়াছিলেন'—বিনয় ঘোষ—সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ-চিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড (তত্ত্ববোধিনী প, ৫৮), পৃ. ৬৪৪, ৬৬২।

২২ Amales Tripathi—Vidyasagar, p 31

২৩ বিদ্যাসাগর রচিত সংস্কৃত কলেজ সম্পর্কে পরিকল্পনা—Notes on the Sanskrit College—ইন্দ্র মিত্র—করুণাসাগর বিদ্যাসাগর, পরিশিষ্ট, পৃঃ ৭২৩-২৬।

২৪ ব্যালেন্টাইনের রিপোর্ট সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য ইন্দ্র মিত্র—ঐ বই, পৃঃ ৭৩০-৩১।

২৫ ঐ বই, ঐ পৃষ্ঠা।

২৬ যোগেশচন্দ্র বাগল—জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৯।

২৭ ঐ বই, পৃঃ ৭১-৭২।

২৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—বঙ্গদেশের কৃষক, প্রথম পরিচ্ছেদ।

২৯ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পল্লীপ্রকৃতি, পৃ. ২৪।

৩০ শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ৯৫-৯৬।

৩১ পল্লব সেনগুপ্ত—উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে বিপ্লবী ভারতের চিত্রকল্প।

৩২ Selections from Jnanannesan (Ed. Suresh Chandra Maitra), pp 57-58.

৩৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর চরিত, পৃঃ ৭৩-৭৪।

৩৪ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৭৮৪।

৩৫ ঐ, চৈত্র, ১৭৭৪।

৩৬ Hindoo Patriot, May 10, 1855, also, April 3, 1856.

৩৭ ঐ, ফেব্রুয়ারি ২৫, ১৮৬০।

লক্ষ্য করার বিষয়, নীলকরদের অত্যাচারকে হিন্দু পেট্রিয়ট—'Americanism in Nadia' বলে অভিহিত করেছেন। বোধ হয়, আমেরিকার নিগ্রো দাস প্রথা ও বাঙলার নীলকরদের অত্যাচারের মধ্যে তুলনা করাই এর উদ্দেশ্য।

৩৮ ঐ, জুলাই ১৩, ১৮৫৪।

৩৯ সোমপ্রকাশ, ২১ পৌষ, ১২৮১।

৪০ ঐ, ১১ চৈত্র, ১২৬৯, ২৩ অগ্রহায়ণ, ১২৭৫।

৪১ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'ধর্মতত্ত্ব', 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্র কি বলে', 'বঙ্গদর্শনের প্রথম সূচনা', 'বাহুবল ও বাক্যবল', 'সাম্য' প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'সাম্য', 'বাহুবল ও বাক্যবল'।

৪৩ "স্বীকার করি, কিয়ৎ পরিমাণে ধনাকাঙ্ক্ষা সমাজের মঙ্গলকর। ধনের আকাঙ্ক্ষা মাত্র অমঙ্গল-জনক, এ কথা বলি না, ধন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হওয়াই অমঙ্গলকর।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'মনুষ্যত্ব কি?'

৪৪ ইংলণ্ডের চার্টিষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রসঙ্গক্রমে কমিউনিষ্ট মতবাদের কথা উল্লেখ করেছে—Hindoo Patriot, July 13, 1854.

৪৫ প্যারি কমিউনের (১৮৭১) সময়ে ও পরে প্যারি কমিউন ও বটেই সোস্যালিজম, কমিউনিজম এমন কি 'আন্তর্জাতিক' সম্পর্কে নানা মন্তব্য প্রধানতঃ বিরোধী মন্তব্য, 'ন্যাশনাল পেপার' ও 'সুলভ সমাচারে' প্রকাশিত হয়েছে।

৪৬ সোমপ্রকাশ, ২৮ ফাল্গুন, ১২৭৯ ১ পৌষ, ১২৮০।

৪৭ Marx—The Future Results of British Rule in India.

৪৮ Marx—The East India Question. *On Colonialism*, pp 67-68.

—লক্ষ্য করার বিষয়, মার্কস পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের এই আবির্ভাবকে একটি তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা বলে মনে করেছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে এশিয়ার অবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেনিন লক্ষ্য করেছেন—এইসব দেশে এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছে—যারা ইওরোপীয় চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এইসব দেশে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পতাকাটি ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি ডঃ সান ইয়াৎ সেন, বাল গঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন। —'এশিয়ার জাগরণ' শীর্ষক, লেনিনের প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য।

৪৯ সোমপ্রকাশ, ৯ জুন, ১৮৬২।

৫০ ঐ, ১৪ জানুয়ারি, ১৮৬৭।

৫১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—পল্লীপ্রকৃতি, পৃঃ ৫৩-৫৪।

৫২ বলাই বাহুল্য, এঁরা শিবনাথ শাস্ত্রী বর্ণিত 'বাবু' নন "যারা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া,

বুলবুলির লড়াই দেখিয়া,…রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত" ইত্যাদি—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃঃ ৫৬। উচ্চ শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত এই বাবুরা ছিলেন চরিত্রগুণে আদর্শস্থানীয়। এঁদের স্বাধীন চিন্তা ও দেশানুরাগ প্রথম থেকেই ইংরেজদের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৫৩ National Paper—Dec. 1, 1869, June 28, 1871.

৫৪ Bengal Magazine, April, 1874

৫৫ মার্কসের এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় তদানীন্তনকালের ইংরেজ অফিসারদের বিভিন্ন রিপোর্টে। কর্নেল Phillimore যিনি ছিলেন সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার এক উচ্চস্তরের অফিসার, লেখেন—"The Government have notified to me that they wish to throw cold water on all natives being taught or employed in making geographical discoveries" —Historical Records of the Survey of India, vol II, pp. 354-55, Dehradun. 1954—Debapriya Roy—National Struggle for Self-reliance in Science, *Problems of National Liberation*, vol IV, No 2, Dec 1981—নামক প্রবন্ধে উদ্ধৃত।

৫৬ মেকলের ভাষায়, এই ইংরেজী শিক্ষিতরা হবে—"Indians in blood and colour, but English in tastes, in opinion, in morals and in intellect"

৫৭ এডুকেশন ডেসপ্যাচে, কোম্পানীর এই সংকীর্ণ স্বার্থের কথা, স্পষ্টতই উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে—"This knowledge will teach the natives of India the marvellous results of the employment of labor and capital, rouse them to emulate us in the development of the vast resources of their country, guide them in their efforts and gradually, but certainly, confer upon them all the advantages which accompany the healthy increase of wealth and commerce, and at the same time, secure to us a larger and more certain supply of many articles necessary for our manufactures and extensively consumed by all classes of our population, as well as an almost inexhaustible demand for the produce of British labor." Despatch from the Court of Directors of E I Co to the Governor General of India, No 49, dated the 19th July, 1854—Quoted in J. A Richey- Selections from Educational Records, Part II, p. 365.

৫৮ উড সাহেবের মন্তব্য, N. K. Sinha (Ed), Hundred Years of the University of Calcutta, pp 33-34.

৫৯ পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার উচ্চ শিক্ষা সংকোচনের নীতি অনুসরণ করতে থাকে। এই

নীতির বিরুদ্ধে বাঙলার জনমত উত্তাল হয়ে ওঠে। ২ জুলাই, ১৮৭০, কলকাতা টাউন হলে এর প্রতিবাদে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে উচ্চ শিক্ষা দানের জন্যে যথাক্রমে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন, সিটি কলেজ, রিপন কলেজ প্রতিষ্ঠা উচ্চ শিক্ষা সংকোচন নীতির পরোক্ষ প্রতিবাদ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। ঐ বই, ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬০ ১৮২৮ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ৪৩৬ জন। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন—১৮৪৮ সালে অর্থাৎ আরো কুড়ি বছর পরে ইংরেজী জানা লোকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১,০০০।

৬১ আবেদন-নিবেদনের পথে অর্থাৎ নিয়মতন্ত্রের পথে আন্দোলনেরও গুরুত্ব আছে। ইংলণ্ডবাসী জমিদারদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আয়ারল্যাণ্ডে নিয়মতন্ত্রের পথে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, কার্ল মার্কস তার সম্পর্কে মন্তব্য করেন—Too weak yet for revolutionising those 'social conditions', the people appeal to Parliament, demanding at least their mitigation and regulation. Marx—The Indian Question- Irish Tenant Right, On Colonialism, p. 52

৬২ বিহারীলাল গুপ্তকে রমেশচন্দ্র দত্ত যে চিঠি লেখেন তাতে এই চাপা অসন্তোষের পরিচয় মিলবে। তিনি লিখলেন—I know the India Office Considerations of race are paramount there, they want to shut us out, not because we are critics, but because we are natives, and their policy is rule by Englishmen .. Licking the dust of their feet will not move them from this policy, unsparing criticism and persistent fighting can, and will do it.' —যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত রমেশ রচনাবলী, জীবন-কথা দ্রষ্টব্য।

৬৩ রমেশচন্দ্র দত্ত মিলের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। —"The government of a people by itself" said John Stuart Mill, "has a meaning and a reality, but such a thing as government of one people by another does not, and cannot, exist. One people may keep another for its own use, a place to make money in, a human cattle-farm to be worked for the profits of its own inhabitants"
মিলের উপরোক্ত বক্তব্যটি তুলে ধরার পরে রমেশচন্দ্র দত্ত মন্তব্য করলেন—"There is more truth in this strongly worded statement than appears at fisrt sight. History does not record a single instance of one people ruling another in the interests of the subject nation". R. C Dutt,—The Economic History of India, vol I, Author's Preface.

৬৪ ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকেও বাঙলায় মাঝে মাঝে কৃষক বিদ্রোহের আবির্ভাব ঘটেছিল।

যেমন, রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), সেরপুরে পাগলাপন্থীদের বিদ্রোহ (১৮২৫), তিতু মীরের বিদ্রোহ (১৮৩১), ফরাজী আন্দোলন, সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), নীল বিদ্রোহ (১৮৬০), পাবনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭৩) প্রভৃতির উল্লেখ করা চলে। এই বিদ্রোহগুলির গতিমুখ পরিচালিত হয়েছিল দেশীয় সামন্ততন্ত্র ও বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে। তবে এই আন্দোলনগুলি ছিল স্থানীয় ও স্বতঃস্ফূর্ত। আন্দোলনগুলির চেতনা ছিল নিম্ন মানের। ফলে, এই বিদ্রোহগুলি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ সম্পর্কে লেখকের বিস্তারিত মতামতের জন্যে পড়ুন—**Peasant Risings as a Problem of Historiography, Marxism and Indology, Ed. Debiprasad Chattopadhyay, p. 137-52.**

৬৫ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার মূল কারণ—এই আন্দোলনের চেতনা মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার ঊর্ধ্বে উঠতে পারে নি। মধ্যযুগীয় চিন্তার প্রতীক লাঠি ও সড়কি আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র এনফিল্ড রাইফেলের কাছে অকেজো হয়ে পড়েছিল।

৬৬ কেউ কেউ মনে করেন উনবিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহগুলি 'বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল।' (সুপ্রকাশ রায়—ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম', পৃঃ ২২০)। 'বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদ' কথার অর্থ। নয়। আমাদের দেশে বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিকল্প হিসাবে।

উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহগুলির সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী মর্মবস্তুটি ছোট করে দেখা ভুল। তবে তার উপর আধুনিক রঙ চড়ানো এবং তাকে অত্যাধিক আদর্শায়িত করে দেখাও ঠিক নয়। (এ বিষয়ে লেখকের বিস্তারিত মতামতের জন্য পড়ুন **R. C. Dutt—The Peasantry of Bengal, (Manisha)** ভূমিকা দ্রষ্টব্য.

৬৭ বাঙলার জাগরণের সার্থকতা যে আধুনিকতায় তা 'চারিত্র পূজা' নামক পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

৬৮ অক্ষয়কুমার দত্ত—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, উপক্রমণিকা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২১।

৬৯ এই সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"ঘুমের অবস্থায় মনের জানলা যখন সব বন্ধ হয়ে যায়, মন হয় বন্দী। তখন যে-সব স্বপ্ন নিয়ে সে খেলা করে বিশ্বসত্যের সঙ্গে তাদের যোগ নেই, কেবলমাত্র সেই সুপ্ত মনের নিজের উপরেই তাদের প্রভাব এক কেন্দ্রে আবর্তিত, তা তারা যতই অদ্ভুত হোক, অসংগত হোক, উৎকট হোক।" ......রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ভারত পথিক রামমোহন রায়।

৭০ শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

৭১ **Ramananda Chatterjee—Rammohun Roy and Modern India,** *The Father of Modern India*, **pp. 81-82**

৭২ **J. K. Majumdar (Ed)—Indian Speeches and Documents on British Rule, pp. 47-48**

৭৩ **Rammohun Roy—Exposition on Judicial and Revenue Systems of India, 1832.—Sushovan Chandra Sarkar—Rammohun On Indian Economy, pp 74-79.**

—কাজেই দেখা যায়, পরবর্তীকালে '**drain theory**' বলে যা পরিচিত হয়, তারও প্রথম ব্যাখ্যা রামমোহনের হাতেই শুরু হয়।

৭৪ **Rammohun Roy—Additional Queries respecting the Condition of India, p. 68.** ঐ বই, টীকা দ্রষ্টব্য।

৭৫ **Rammohun's View on India's political dependence, as recorded by Victor Jacquemont—J K. Majumdar (Ed), Indian Speeches and Documents on British Rule, p 41.**

৭৬ বিপিনচন্দ্র পালের প্রবন্ধ—**The Father of Modern India, pp. 201-05.**

৭৭ **Hindu Pioneer**—এর ফাইল কোথাও না থাকায় মূল প্রবন্ধ দেখার উপায় নেই। তবে ঐ প্রবন্ধ দুটির সারকথা লিপিবদ্ধ রয়েছে 'এশিয়াটিক জার্নালের' পাতায়। ঐ জার্নালে ট্রেভেলিয়ানের বিখ্যাত বই '**On the Education of the People of India**' নামক পুস্তকের একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। লেখক ইংরেজ। তিনি এই প্রসঙ্গে ইয়ং বেঙ্গলের চিন্তার উদাহরণ হিসাবে বেশ কয়েকটি মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন।—**Asiatic Journal, May-August, 1838.**

৭৮ **The Capabilities of India**—এই শিরোনামে চিঠিটি 'রিফর্মার' কাগজে ছাপা হয়—চিঠিটি 'ক্যালকাটা মান্থলি জার্নালে' পুনর্মুদ্রিত হয়—**Calcutta Monthly Journal, February, 1831.**

৭৯ **Birth of the Deshutuishunce Shutah, October 1841—Gautam Chattopadhyay—(Ed) Bengal : Early Nineteenth Century (Selected Documents), pp. 265-77.**

৮০ **Preliminary Remarks—Rammohun Roy on Indian Economy, p. x.**

৮১ ডিরোজিওর মূল কবিতার দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত অনুবাদ। এই কবিতাটি সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসু মন্তব্য করেছেন—'তাঁহার (ডিরোজিও) এই দেশে জন্ম ছিল। কিন্তু অন্যান্য ফিরিঙ্গী যেমন বলে, 'মোদের বিলাত', তিনি সেরূপ বলিতেন না। এই দেশকে তিনি স্বদেশ জ্ঞান করিয়া ইহার প্রতি যথেষ্ট মমতা করিতেন। তাঁহার একটি কবিতাতে তাঁহার স্বদেশানুরাগের অত্যুৎকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।—রাজনারায়ণ বসু : হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত—দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত—(পৌষ, ১৩৬৩), পৃঃ ১৪-১৫।

২০৫০১

৮২ কাশীপ্রসাদ ঘোষ লিখিত উপরোক্ত কবিতা—'The Farewell Song' এবং তাঁর অন্যান্য কবিতা—যা 'The Shair and Other Poems' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় তা এই সুরে গাঁথা ছিল। এই পুস্তক লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ককে উৎসর্গ করা হয়। এইগুলি তিনি লিখেছিলেন, তাঁর কথায়—'by way of national poetry'—**Asiatic Journal. May-August, 1831.**

৮৩ স্বৈরতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তুলনামূলক বিচার—**Preliminary Remarks, Rammohun on Indian Economy.** তাছাড়া ইওরোপের গণতান্ত্রিক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে তাঁর সপ্রশংস উক্তি সুবিদিত।

৮৪ **Selections from Jnanannesan. p 36.**

৮৫ ঐ, পৃঃ ৪৮।

৮৬ কি রামমোহন, কি ডিরোজিও, কি ডিরোজিও-শিষ্যেরা ইংরেজ শাসনকে 'বিধাতার আশীর্বাদ' বলে মনে করতেন। যে মানসিকতা থেকে তাঁরা এই মত পোষণ করতেন তা বোঝার চেষ্টা করা উচিত।

এঁরা সকলেই যুগধর্মের স্রোতধারায় অবগাহন করতে চাইলেন। তাঁরা মনে করলেন—মধ্যযুগীয় অন্ধকার দূরীকরণে, নতুন বৈজ্ঞানিক যুগের আলো বিস্তারে ইংরেজ শাসন কিছুটা সাহায্য করবে। ইংরেজ শাসন নতুন সভ্যতার উপযোগী যেসব বৈষয়িক উপাদান (স্টীম এঞ্জিন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ, উন্নত ধরনের চাষ-বাস, সংবাদপত্র প্রভৃতি) প্রবর্তন করল তার মধ্যে তাঁরা দেখলেন ইংরেজ শাসনের এক উজ্জীবনকারী ভূমিকা। হীন স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হয়ে ইংরেজ যে এই বৈষয়িক উপাদানগুলি প্রবর্তন করছে এবং ইংরেজ শাসনের ধ্বংসকারী ভূমিকাটিই প্রধান, এটি সম্যকরূপে তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন নি।

প্রায় সমসাময়িক কালেই (১৮৫৩) কার্ল মার্কস ভারতে ইংরেজ শাসন ও তার ফলাফল সম্পর্কে যে প্রবন্ধগুলি রচনা করেন তাতে আমরা অন্য একটি চিত্র দেখতে পাই। কার্ল মার্কসের চোখে ধরা পড়েছে ভারতে ইংরেজ শাসনের ঔপনিবেশিক চরিত্রটি। ইংরেজ শাসনের উজ্জীবনকারী ভূমিকার পাশাপাশি তিনি তুলে ধরেছেন এর ধ্বংসকারী মূল চরিত্রটি। তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ভারতের অগ্রগতির পথে ইংরেজ শাসন মূল বাধা এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ইংরেজ শাসনকে উৎপাটিত করেই আসবে ভারতের জনগণের স্বার্থে রূপায়িত ভারতের প্রকৃত উজ্জীবন। এই সিদ্ধান্তগুলি হল মার্কসের বৈজ্ঞানিক আন্তর্জাতিকতাবাদী চিন্তার ফসল।

বলাই বাহুল্য, বাঙলার জাগরণের নেতাদের চিন্তাধারা—যা ছিল বুর্জোয়া লিবারেল ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত—তাদের কাছে এই স্বচ্ছ দৃষ্টি আশা করা যায় না। তাই বলে তাঁরা ইংরেজের ক্রীতদাস ছিলেন—একথা মনে করা ভুল। বস্তুত, তাঁরা ইংরেজ শাসনে ছড়িয়ে দেওয়া নতুন বৈষয়িক উপাদানগুলি দেশের স্বার্থে সদ্ব্যবহার করতে সংকল্প নিলেন, তাঁরা বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার পথ ধরে দেশের পুনরুজ্জীবন আনতে চাইলেন।

৮৭ ১৮৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আর্টস কলেজের সংখ্যা ছিল ২১, ১৮৮২ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০—**Hundred years of the University of Calcutta, Ch. IV ; আরও দ্রষ্টব্য, Anil Seal—The Emergence of Indian Nationalism, Appendix I.**

৮৮ 'ভারত-সভা' বাস্তব চাষীদের মধ্যে নব-জাগরণের ভাবধারা ছড়িয়ে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল—প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া, পৃঃ ৪৪-৪৮।

৮৯ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রীর মন্তব্য লক্ষ্য করার মত। তিনি লিখলেন— 'সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল, এক নবশক্তির সূচনা হইল, এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে জাগিল।' —রামতনু লাহিড়ী, পৃঃ ১৯৬।

এই প্রসঙ্গে ১৮৫৭ ও তদানীন্তন কালে বাঙলার বুদ্ধিজীবীদের মনোভাব—এই প্রশ্নটি অবশ্যই উঠতে পারে। কেউ কেউ বলে থাকেন—১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানটি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। তাই বাঙলার বুদ্ধিজীবীরা তাতে যোগ দেয় নি। এই ধরনের মন্তব্য অতি-সরলীকরণ ছাড়া কিছু নয়।

বস্তুত, ১৮৫৭ সালে যে অভ্যুত্থানটি ঘটেছিল তাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা যায় একথা মোটেই সঙ্গত নয়। এই বিদ্রোহ ছিল নির্যাতনকারী জাতির বিরুদ্ধে নির্যাতিত জাতির যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, যদিও এটি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত ও অনেকাংশে নিম্নমানের চেতনা-সম্পন্ন।

বাঙলার বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে গিয়ে ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হয়েছিল, এটি যেমন ঠিক নয়, তেমনি আবার এই বিদ্রোহের সমর্থনে তারা এগিয়ে গিয়েছিল তাও নয়। প্রকৃতপক্ষে, এই বুদ্ধিজীবীরা নিরপেক্ষতার মনোভাব গ্রহণ করা, নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করাই সুবিধাজনক বলে মনে করেছিল। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিল—এই বিদ্রোহের পিছনে যতই যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকুক না কেন, নিম্নমানের চেতনাসম্পন্ন বিদ্রোহীদের পক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানে সুসজ্জিত ইংরেজদের কাছে পরাজয় ছিল অবধারিত।

তবুও ইংরেজরা তাদের সন্দেহের চোখে দেখত। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী মশায় শিবচন্দ্র দেব সম্পর্কে যে কাহিনীর উল্লেখ করেছেন সেটি তাৎপর্যপূর্ণ (রামতনু লাহিড়ী, পৃঃ ১২৪)। সন্দেহটি যে একেবারে অমূলক ছিল না তা বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে প্রকাশিত দু'চারটি গল্প-উপন্যাস পড়লে বোঝা যায় (সুপ্রকাশ মিত্র—১৮৫৭ ও বাংলাদেশ নামক গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য)।

বাঙলার বুদ্ধিজীবীদের নিরপেক্ষতা অবলম্বনের আসল কারণ—১৮৫৭ সাল: এমন একটি সময় যখন আমাদের দেশে বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে নি—একটি বুর্জোয়া ভাবাপন্ন ক্ষুদ্র ইংরেজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছিল মাত্র। একটি শ্রেণীর উদ্ভব, তার সংখ্যা বৃদ্ধি, তার শ্রেণীসংহতি ইত্যাদি—যা একটি সম-মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীকে বলশালী করে,

টিকে বাংলা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে, দেশের মাটিতে সেই প্রক্রিয়াটি তখনও দানা বেঁধে ওঠেনি।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে—যখন জাতীয় বুর্জোয়া ও পেটিবুর্জোয়ার আবির্ভাব ঘটল, যখন এদের মধ্যে শ্রেণীসংহতি বৃদ্ধি পেতে থাকল, যতই তারা নবতর চেতনায় উজ্জীবিত হতে থাকল ততই তাদের ১৮৫৭ সালের অভ্যুত্থানটি সম্পর্কিত মনোভাবেও পরিবর্তন লক্ষিত হতে থাকল। লক্ষণীয় যে 'সোমপ্রকাশ', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ইতিবাচক দিকটির উপর বেশি বেশি জোর দিতে থাকে। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অধিকতর বিপ্লবী অংশ সাহস সঞ্চয় করে এটিকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলতে অগ্রসর হয় (**Sedition Committee Report** দ্রষ্টব্য)।

৯০ সোমপ্রকাশ, ১১ আগস্ট, ১৮৬২।

৯১ ঐ, ৪ জানুয়ারি, ১৮৭৫।

৯২ 'মুথার্জিস ম্যাগাজিন' থেকে উদ্ধৃত, যোগেশচন্দ্র বাগল—জাতীয়তার নবমন্ত্র, পৃঃ ৭১-৭২।

৯৩ অমৃতবাজার পত্রিকা, ১৭ মার্চ, ১৮৭০।

৯৪ পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রায়তের সমস্যা নিয়ে যে আলোচনা চলেছিল (যা 'রায়তের কথা' নামে পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে) তাকে এই আলোচনার জের বলা চলে।

৯৫ এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য পড়ুন—**R. C. Dutt—The Peasantry of Bengal, Introduction.**

৯৬ রাজনারায়ণ বসু—মহা হিন্দু সমিতি।

৯৭ সোমপ্রকাশ, ২১ জানুয়ারি, ১৮৬৭।

৯৮ অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৩ অক্টোবর, ১৮৭১।

৯৯ এই প্রসঙ্গে চণ্ডীচরণ সেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে। তাঁর রচনা 'মহারাজা নন্দকুমার', 'অযোধ্যার বেগম', 'ঝাঁসীর রাণী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১০০ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র দত্তের নাম সুপরিচিত। মোটেই সুপরিচিত নয়, অথচ উল্লেখযোগ্য, এমনি কয়েকটি রচনার পরিচয় মিলবে সুকুমার মিত্র প্রণীত '১৮৫৭ ও বাংলাদেশ' নামক গ্রন্থে।

১০১ যোগেশচন্দ্র বাগল—'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত'—এই বইখানিতে হিন্দু-মেলা সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত রয়েছে।

১০২ শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী, পৃঃ ৩৩২।

১০৩ বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের চিন্তায় দেশপ্রেম-মূলক উপাদান প্রচুর ছিল বলেই তা পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনের ভিতরকার অধিকতর বিপ্লবী ধারাটিকে (যা 'সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলন নামে পরিচিত) পরিপুষ্ট করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

১০৪ বঙ্কিম, ভূদেব প্রভৃতি জাতীয় ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ঐতিহাসিক কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করতেন। তারা রাজপুত বীরেরা অত্যাচারী 'যবন' রাজাদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সাহসিক অভিযান পরিচালনা করেন তার কাহিনী তুলে ধরে দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় মনোভাব জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। তাঁদের এই ধরনের রচনা মুসলমান সমাজের বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াত। সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানেরা এর সুযোগ নিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা সঙ্গত কারণেই এই ধরনের রচনার সমালোচনা করতে থাকেন। মুজিবর রহমান সম্পাদিত জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র 'দি মুসলমান'—এর ফাইল খুললেই এই বিতর্কের পরিচয় পাওয়া যায়।

১০৫ হিন্দুধর্মের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন সামাজিক অনুশাসনকে (যেমন জাতিভেদ-প্রথা, পৌত্তলিকতা প্রভৃতি) আদর্শায়িত করে দেখার এক প্রবণতা এই সময়ে পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে দেখা যায়।

তবে শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতির 'বেদে আছে' মনোবৃত্তির সঙ্গে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের চিন্তাকে এক করে দেখলে ভুল হবে।

বঙ্কিম-বিবেকানন্দ ইওরোপীয় সভ্যতার ইতিবাচক দিকগুলি, বিশেষ করে তার আধুনিকতার দিকটি সম্পর্কে বিশেষ সজাগ ছিলেন। বঙ্কিমের চিন্তার উপর বেন্থাম, মিল ও রুশোর চিন্তার প্রভাব সুবিদিত। বিবেকানন্দের চিন্তায় তৎকালীন ইওরোপের গণজাগরণের এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবনার কিছুটা প্রভাব পড়েছিল। তবে ইওরোপীয় সভ্যতার বিষময় দিকগুলি (যুদ্ধোন্মাদনা, ঔপনিবেশিক নিপীড়নের নীতি প্রভৃতি) যত উদগ্রভাবে দেখা দিতে থাকল ততই তাঁদের মনে দেখা দিল ইওরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সংশয়। তারা আর ইওরোপীয় সভ্যতাকে চরম ও পরম বলে মেনে নিতে পারলেন না। তারা নতুনতর এক তত্ত্ব আবিষ্কারে অগ্রসর হলেন। বঙ্কিম লিখলেন—'যেদিন ইওরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম কর্ম একত্র হইবে, সেইদিন মানুষ দেবতা হইবে' (ধর্মতত্ত্ব)।

১০৬ ইওরোপীয় ধনতান্ত্রিক সভ্যতার সংহারকারী ভূমিকাটি বঙ্কিম কঠোর হস্তে উন্মোচন করেছেন। তিনি লিখেছেন 'এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতাব্দী। সেই রক্তমাংসপূতিগন্ধশালিনী, কামান-গোলা-বারুদ প্রাচলোডের টর্পীডো প্রভৃতিতে শোভিতা রাক্ষসী—এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তাহা ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ারমুখী, এ দেশে আসিয়াও কালমুখ দেখাইতেছে।' ('ধর্মতত্ত্ব') পরাধীন দেশের মানুষ হিসাবে বঙ্কিম ইওরোপীয় সভ্যতার পররাজ্য-গ্রাসী রূপটিকে সচক্ষে দেখে মন্তব্য করেন—'ইওরোপীয় **Patriotism** একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইওরোপীয় **Patriotism** ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।' (ঐ)

ক্রমবর্ধমান ধনতান্ত্রিক সভ্যতার এই সমালোচনা খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু এই সমালোচনার দুর্বলতার দিক এইখানে যে তিনি ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ও ইওরোপীয় সভ্যতাকে সম-অর্থ-

বাচক বলে মনে করলেন। এই ধারনা থেকে তিনি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিকল্প হিসাবে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের এক কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যার দিকে মুখ ফেরালেন। ('কৃষ্ণচরিত্র')। ভারতের 'নিজস্ব বাণী' আবিষ্কারের এই চেষ্টা ভারতকে বেশ কিছুটা বিশ্ব বৈপ্লবিক চিন্তাধারার তরঙ্গ (শ্রমিক অভ্যুত্থান, সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রভৃতি) থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে সাহায্য করল।

১০৭ অধ্যাপক সুশোভন সরকারের মতে বাঙলার জাগরণে ছিল দুটি ধারা—পাশ্চাত্যবাদী ধারা এবং পুনরুজ্জীবনবাদী ধারা। এই দুটির মধ্যে প্রথমটিকে তিনি ঊর্ধ্বে স্থান দেবার পক্ষপাতী। তিনি লিখেছেন—'In the history of the Bengal Renaissance, I rank the contribution of westernism higher than that of traditionalism' তাঁর মতে ইয়ং বেঙ্গল শুধু পাশ্চাত্যবাদের প্রতিনিধি নয়, তার 'র‍্যাডিক্যাল' এবং বঙ্কিম পুনরুজ্জীবনবাদের প্রতিনিধি ও তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল। এই দুয়ের মধ্যে তুলনা করে তিনি মন্তব্য করেছেন—'It is permissible to doubt whether the change has been a gain in our national life' (Bengal Renaissance and Other Essays, pp. 18-19, 119-21, 152-53)

ইয়ং বেঙ্গল—যাঁরা পাশ্চাত্যকরণের প্রক্রিয়া ও আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াকে একাকার করে ফেলেন, যাঁরা ইংরেজ শাসন সম্পর্কে অত্যধিক মোহ পোষণ করতেন (ইংরেজ শাসনের কল্যাণ-দায়িনী ভূমিকায় তাঁদের গভীর বিশ্বাস ছিল, এমন কি তাদের কেউ কেউ ইংরেজ রাজকে 'গরীব কা বাপ' (Bengal Spector, April 25, 1843) বলে মনে করেছেন, তাদের 'র‍্যাডিক্যাল' বলা কতটা সঙ্গত—এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। এদের সঙ্গে তুলনা করলে বঙ্কিম ও পুনরুজ্জীবনবাদীরা যারা ইংরেজ শাসন ও দেশবাসীর স্বার্থের বিরোধ সম্পর্কে অধিকতর সচেতন ছিলেন—যারা মাৎসিনি ও সমধর্মী চিন্তার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন ('বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে ইতালীর ঐক্য আন্দোলন, জার্মানীর ঐক্য আন্দোলন প্রভৃতির উল্লেখ ও তার প্রেরণা বেশ সুপরিস্ফুট), জাতীয় চেতনার উন্মেষে তাঁদের দান বেশি বৈ কম নয়।

আবার পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনকে বেশি বড় করে দেখার একটি প্রবণতা কোন কোন গবেষকের মধ্যে আছে। যেমন, অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠি মনে করেন ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই সৃজনশীলতার উপাদানগুলি নিহিত ছিল এবং পশ্চিমের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করে এক-আধটু সংশোধনই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। (Tripathi-Vidyasagar, pp. 1-6) এই মত অনুসরণ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ইয়ং বেঙ্গলের ভূমিকায় কোন সদর্থক দিকই নেই, তারা শুধু পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ করেছিল, তারা ছিল নকল-নবীশের দল (ঐ বই, পৃঃ ৮২-৮৮)।

বাঙলার জাগরণের প্রথম পর্বটি পাশ্চাত্যকরণের যুগ এবং দ্বিতীয় পর্বটি প্রাচ্যকরণের যুগ—এইভাবে দেখা উচিত নয়। প্রথম পর্বে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার সুফলগুলিকে আয়ত্ত করার—আধুনিকতাকে গ্রহণ করার সুতীব্র আগ্রহ। প্রথম পর্বে কেউ

কেউ (বিশেষ করে ইয়ং বেঙ্গল) ইংরেজিয়ানা ও আধুনিকতা—এই দুটিকে সম-অর্থবাচক বলে মনে করতেন। তবে সেই পর্বের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিরা—যেমন, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার (পরবর্তীকালে এই ধারা অনুসরণ করেন রবীন্দ্রনাথ) পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকতা—এই দুইয়ের পার্থক্য সম্পর্কে বিশেষ সজাগ ছিলেন এবং তাঁরা দেশকে পাশ্চাত্যকরণের দিকে নয়, আধুনিকতার দিকে নিয়ে যেতে বিশেষ সচেষ্ট হন।

আবার যাঁরা মনে করেন—ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যেই প্রগতিশীলতার মূল উপাদানগুলি লুক্কায়িত ছিল, এবং বাইরে থেকে আনা এক-আধটু সংশোধনই যথেষ্ট ছিল, তাঁরা ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনটি জীবনের স্রোতধারাকে যে সম্পূর্ণ রূপে রুদ্ধ করে দিয়েছিল—এটি বিস্মৃত হন। তাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে যুগধর্মের গুরুত্বটি খুবই ছোট করে দেখেন। মনে রাখতে হবে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ দেশের ঐতিহ্য সন্ধানে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন, কিন্তু আধুনিকতাকে বাদ দিয়ে নয়।

১০৮ আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের সম্পর্কটি কি—এ প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। কি রামমোহন, কি ইয়ংবেঙ্গল, কি বিদ্যাসাগর, কি বঙ্কিমচন্দ্র, কি বিবেকানন্দ, কি রবীন্দ্রনাথ—সকলের কাছেই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছিল এইভাবে—আধুনিকীকরণের সঙ্গে পরিচয় ছাড়া দেশবাসীর পক্ষে ইওরোপীয়দের সমকক্ষ হওয়া ও দেশের জাগরণের পথ প্রশস্ত করার আর কোন উপায় নেই। আবার দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটিকে সংযুক্ত করতে না পারলে, এই প্রক্রিয়াটি দেশবাসীর চেতনায় প্রবেশ করবে না এবং এটি বন্ধ্যা হয়ে রইবে। রামমোহন ব্রাহ্ম আন্দোলনের মাধ্যমে এই কাজটি সুসম্পন্ন করতে চাইলেন। এমন কি ইয়ংবেঙ্গল—যাঁদের চোখে পাশ্চাত্যকরণ ও আধুনিকীকরণ—এই দুটি প্রক্রিয়া প্রায় একাকার হয়ে গিয়েছিল—তাঁরাও বলতে বাধ্য হলেন যে ইওরোপীয় চিন্তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে, তবে তাকে প্রকাশ করতে হবে ভারতীয় ভঙ্গীতে। ইওরোপের বিজ্ঞানকে এদেশের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে। (Selections from Jnanannesan, pp. 57-58)। মোট কথা ইয়ংবেঙ্গলকেও প্রশ্নটি ভাবতে হয়েছিল, তবে এই প্রশ্নটির তাঁরা কতটুকু সদুত্তর দিতে পেরেছিলেন সে প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। বিদ্যাসাগর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার আধুনিকতা, যদিও জাতীয় ঐতিহ্যের বলিষ্ঠ দিকটির প্রতি দৃঢ়মূল থেকে তিনি সংস্কারকে গ্রহণ করাতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিম-বিবেকানন্দ হিন্দু ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতী। তাঁরাও সাধারণভাবে আধুনিকতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন নি। এঁদের চিন্তায় সমকালীন ইওরোপের প্রগতিশীল চিন্তাধারার চূড়ান্ত প্রভাব লক্ষ্য করার মত। যুগধর্ম ও ঐতিহ্য—এই দুইয়ের শ্রেষ্ঠ মিলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথে। তাই তিনি একদিকে যেমন আধুনিক, তেমনি ভারতীয়।

আধুনিকীকরণ ও ঐতিহ্য সন্ধান পরস্পর সংযুক্ত। আধুনিকীকরণ যদি দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয় তাহলে তা নকলনবীশীর নামান্তর হয়ে উঠতে বাধ্য। আবার ঐতিহ্য সন্ধান যদি আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়ায় (যেমন 'বেদে আছে' মনোবৃত্তি),

তাহলে তা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক জাতির ঐতিহ্যের মধ্যে একটি ভালো দিক আছে, আবার আর একটি খারাপ দিক আছে যে ঐতিহ্য প্রতিক্রিয়াশীল তা আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কখনও সাহায্য করতে পারে না, যেমন জাতিভেদের পক্ষে যত ব্যাখ্যাই দেওয়া হোক, তা কখনও আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটির সহায়ক হতে পারে না। আবার যে ঐতিহ্যটি প্রগতিশীল (যেমন, কবীর-নানক-দাদু-চৈতন্যের চিন্তা—যার মধ্যে পুরোহিততন্ত্র ও জাতি-বর্ণের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে), যা তদানীন্তনকালে সমাজকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল, সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে বর্তমানের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াটির কোন বিরোধ নেই, গুণগতভাবে এই দুটি পৃথক হলেও, একটি অপরটির পরিপূরক।

কাজেই ঐতিহ্য যাচাই করে নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ—এঁরা সকলেই নিজের মত করে এই যাচাই করার কাজে হাত দেন। অবশ্য, কার চেষ্টা কতটা সার্থক হয়ে উঠেছে কালের বিচারে তার চূড়ান্ত হিসাব মিলবে। যুগধর্মের আলোকে ঐতিহ্য সন্ধানের কাজে লেনিনের যে রচনাগুলি মার্কসবাদীর কাছে দিকনির্দেশক হতে পারে তা হল **The Heritage we Renounce, In Memory of Herzen. Tolstoy, the Mirror of the Revolution; The National Pride of the Great Russians** প্রভৃতি।

১০৯ অধ্যাপক সুমিত সরকারের মতে এই মডেলের কোন মূল্য নেই, সমগ্র বাঙলার জাগরণ ইংরেজের নকলনবিশী ছাড়া কিছু নয়। তিনি মন্তব্য করেছেন—**'In India, full-scale colonial rule lasted the longest, and there was ample time for the growth of dependent vested interests, the elaboration of a hegemonic infra-structure producing 'voluntary' consent side by side with more direct politico-military domination. The English-educated intelligentsia in its origins was very much a part of this system, nowhere more so than in Bengal' (Sumit Sarkar—Rammohun Roy and the Break with the Past)**

এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে তিনি রামমোহনের আধুনিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন ও মন্তব্য করেছেন—এটি ছিল: **'not of full-blooded bourgeois modernity, but of a weak and distorted caricature of the same which was all that colonial subjection permitted.'**

ইয়ং বেঙ্গলের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—**'Its impact on Bengali society as a whole, as distinct from its intelligentsia crust, was very nearly nil.' (Sumit Sarkar—The Complexities of Young Bengal).**

কেউ যদি দাবি করেন যে বাঙলার জাগরণের মধ্যে দিয়ে 'মৌলিক সামাজিক পট-পরিবর্তন' শুরু হয়েছিল তাহলে তিনি অবশ্যই এই জাগরণের ভূমিকাকে বাড়িয়ে দেখছেন। কিন্তু বাঙলার জাগরণের মধ্যে দিয়ে সংস্কারবাদের ভাবে, ভাষায়, ভঙ্গীতে যে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছিল তার কি কোন মূল্য নেই ?

সুমিত সরকার আক্ষেপ করে বলেছেন—বাঙলার জাগরণের নেতাদের মধ্যে ডিসেম্বিস্ট-দের বা নারোদনিকদের বলিষ্ঠতা নেই। তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন এই দেখে যে বাঙলার জাগরণের নেতারা—ভিয়েৎনাম বা চীনের মত বুর্জোয়া লিবারেল ধারাটিকে আক্রমণ করতে পারেন নি।

ভারতের ইতিহাসে কেন নারোদনিক বা ভিয়েৎনামের পুনরাবৃত্তি ঘটল না—এ নিয়ে বিলাপ করে লাভ কি ? ভারতের ইতিহাস অন্য খাতে প্রবাহিত হয়েছে। এখানে নানা ঐতিহাসিক কারণে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মূল স্রোত বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের পথ ধরে অগ্রসর হয় নি. এটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের পথ ধরে বিকাশলাভ করেছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে দ্বৈততা (**dualism**) অনিবার্য তা ভারতের মত একটি পরাধীন দেশে নিজস্ব বিশিষ্টতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। ঐতিহাসিকের কাজ—এই আন্দোলনের ইতিবাচক দিকটি তুলে ধরা. এর নেতিবাচক দিকটি বিশ্লেষণ করা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এর একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন উপস্থিত করা।

পরাধীন দেশগুলিতে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূল্যায়ন কিভাবে করতে হয় তার নির্দেশ লেনিনের রচনাবলীতে ছড়ানো রয়েছে। লেনিন মন্তব্য করেছেন—জাতীয় আন্দোলনের গোড়ার দিকে বুর্জোয়ারা নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে যদিও এই নেতৃত্ব দ্বৈতচরিত্র-'র স্পষ্ট। বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের মধ্যে যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মর্মবস্তুটি ছিল এবং থাকতে পারে তিনি তাকে সমর্থন করার পক্ষপাতী ছিলেন। (**Lenin : The Right of Nations to Self-determination**—এই প্রসঙ্গে লেনিনের ঔপনিবেশিক থিসিস এবং ঐ থিসিসকে কেন্দ্র করে যে নন-রায় বিতর্ক বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য)।

লেখকের মতে, বাঙলার জাগরণের মার্কসীয় বিচারের মূলসূত্রটি লেনিনের এই নির্দেশের মধ্যে রয়েছে।

১১০ পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের উপর সমসাময়িক ইওরোপীয় চিন্তার প্রভাব খুবই স্পষ্ট। 'আর্য্য দর্শনের' সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ যে বইগুলি রচনা করেন তার মধ্যে ছিল—'জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্ত', 'ম্যাটসিনির ইতিবৃত্ত', 'গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত' প্রভৃতি।

১১১ আয়ার্ল্যাণ্ডের হোম রুল আন্দোলন আমাদের দেশের স্বাধীনতাকামী বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ উদ্বুদ্ধ করেছিল।

১১২ নীল বিদ্রোহ ও পাবনার কৃষক বিদ্রোহ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, সাঁওতাল বিদ্রোহ তা করে নি।

১১৩ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণ সম্পর্কে কয়েকটি সুচিন্তিত মন্তব্য উপস্থিত করেছেন। তিনি এই জাগরণের ইতিহাসকে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করেছেন—যেমন, ১) অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ১৭৬৫—সূচনা, ২) ১৭৬৫-১৮০০, প্রস্তুতি পর্ব, ৩) ১৮০০-১৮৫০, গঠনকাল; ৪) ১৮৫০ ১৯১১, শ্রেষ্ঠ পর্ব, সার্থক পরিণতি; ৫) ১৯১১-৪৭, ১৯৪৭-৬৭ অবক্ষয় ও অধঃপতন।

—Suniti Kumar Chattopadhay—'The Changing Culture of Calcutta, Periodisation of Calcutta Culture of Modern India,' Bengal Past and Present, Jan-June, 1968.

এই পর্ব বিভাগের মধ্যে দিয়ে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙলার জাগরণের একদিকে ধারাবাহিকতা ও অন্যদিকে পরিবর্তনের দিকটি (Change and Continuity) নিজের মত করে তুলে ধরেছেন।

১১৪ উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণ ও তার সঙ্গে পরবর্তীকালের জাতীয় আন্দোলনের সম্পর্ক—এই বিষয়ে নেহরুর মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। নেহরু লিখেছেন—'A number of very remarkable men rose in Bengal in the nineteenth century, who gave the lead to the rest of India in cultural and political matters, and out of whose efforts the new nationalist movement ultimately took shape.—J. Nehru—The Discovery of India, p. 371.

১১৫ এই ঐতিহাসিক পটভূমিতে বাঙলায় মার্কসবাদ প্রচার অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নবজাগরণ

সুশীল জানা

১

বর্তমানে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ সম্পর্কে আমাদের বুদ্ধিজীবী মহলের নানা অংশে—এমন কি বিদেশীদের মধ্যেও নানারকম প্রশ্ন উঠতে দেখা যাচ্ছে। ঐ 'নবজাগরণের' প্রাণপুরুষ যাঁরা তাঁদের কাজকর্ম চিন্তা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক পক্ষ দাবী করছেন—এদেশে নবজীবনবোধ উন্মেষের উৎস তাঁরাই, এমন কি এদেশের সবরকম প্রগতিশীল সামাজিক ও জাতীয় আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক চেতনার প্রাথমিক প্রেরণা পরিবেশ জাতি ও কালগত নানা ক্রটিবিচ্যুতি সত্বেও এসেছে তাঁদেব কাছ থেকেই—কখনো ব্যক্তি-গতভাবে, কখনো গোষ্ঠীগতভাবে, কখনো একাধিক গোষ্ঠীযোগে সম্মিলিত ভাবে। অন্যদিকে বিরোধীপক্ষ উপরোক্ত নবজাগরণের দাবীকে শুধু অলীক বলেই প্রতিপন্ন করতে চাইছেন না—তার প্রাণপুরুষদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত-ভাবে ক্ষুরধার সমালোচনায় কাটছাঁট করে খর্ব করে এনেছেন। দু'পক্ষই দাবী করেন বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা। কিন্তু সত্য কে? সহজ উত্তর—সত্য 'ইতিহাস।'—ইতি হ আস: এ সব ঘটেছিল। কিন্তু ঘটনাপুঞ্জই কি ইতিহাস? খণ্ড খণ্ড ঘটনাপুঞ্জ যেমন সত্যকে প্রকাশ করে, তেমনি অর্ধ সত্য এবং তুচ্ছ ও মিথ্যাকেও প্রকাশ করে। এর ভিতর থেকে আমরা সত্যকে কেমন করে উদ্ধার করবো? নবযুগের পৃথিবীর ভাবুক সমাজতত্ত্ববিদ, দার্শনিক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানীরা জগত ও জীবনের মৌলিক সেই সত্যকে আবিষ্কার করছেন—যা বিকাশ উন্মুখ, বিবর্তমান। বাধা বা প্রতিবন্ধকতার সামনে অবশ্যই তার গতি হয় শ্লথ বিলম্বিত অথবা থমকে দাঁড়ায় কিন্তু নিশ্চিহ্ন হয় না। আবার পরিবেশগত আনুকূল্যে গতি যায় বেড়ে—যাকে আমরা বিপ্লব বলি। এ মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে যেমন, তার গড়া সমাজ সভ্যতার ক্ষেত্রেও তেমনি। 'নবজাগরণে'র ব্যাপারটা মানুষের সমাজ ও সভ্যতার

ইতিবৃত্ত। আলোচ্য ক্ষেত্রে সভ্যতা বিকাশের গতিপথে এ একটা 'বিশেষ অধ্যায়ের' আলোচনা। মর্ত্য-মানুষের অমিত সম্ভাবনার এ ক্ষুদ্র একটা অংশ-মাত্র। পুরুষানুক্রমিক নানা অভিজ্ঞতায়, জীবন-চেতনায় সে জাগছে কাল থেকে কালে নানা অভিঘাত ও দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এ গতি কখনই সরল নয়—দেশ ভেদে, তার পরিবেশ ভেদে, প্রতিবন্ধকতার চরিত্র ভেদে তার আদলও একরকম থাকে না। এরই ভেতর থেকে সত্যস্বরূপ সেই আগুয়ান গতিকে—বিকাশকে আমাদের বেছে নিতে হয়, চিনে নিতে হয়, চেনার শক্তি অর্জন করতে হয়। মনে পড়ে, ইওরোপে এককালে ফ্যাসিবাদের বিধ্বংসী দানবীয় ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছিলাম—সভ্যতার চাকা থেমে যাবে এ আমি বিশ্বাস করিনে। এ শুধু কবির কল্পনাশ্রিত বিশ্বাস মাত্র নয়—এ বিশ্বাস মানুষের অমিত শক্তি ও সম্ভাবনার প্রতি বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের প্রবল ঘোষণা আমরা শুনেছি ইওরোপের নবজাগরণে। যে কালে, যে দেশে বা গোষ্ঠীতে এ বিশ্বাসের প্রতি সন্দেহ দেখা দেয়—বুঝতে পারি, গতি সেখানে অগতির দুর্দশায় মানুষের অসম্মানকে ডেকে আনছে। তার উদ্দেশ্য ভাল নয়।

এ আর নতুন করে বলার কিছু নেই যে গোটা ইংরেজ শাসন কালটা জুড়ে আমাদের দেশে ইতিহাসের চাকা চলেছে নানা বাঁকাচোরা পথে, নানা বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কতটা পথ আমরা কোন আদলে অতিক্রম করেছি অথবা সে আদল ইওরোপে আদৌ ছিল কি নেই—তেমন তুলনামূলক হিসেবে ইওরোপের সঙ্গে যদি আমাদের না-ই মেলে, তাতে আজ বিংশ শতাব্দীর সমালোচনায় বিগত ১৯শ শতাব্দীর অগ্রগতিকে ঠেকানো যাবে না। কিন্তু আমাদের অর্জিত সাফল্যে সংশয় ঘটানো যায়, বিকৃতি ঘটানো যায়। আমাদের স্বাধীনতার পরে দেশী বিদেশী সমালোচকদের হঠাৎ এই উদ্দীপনা লক্ষ্য করবার মত। তাঁদের সমালোচনার দৃষ্টিতে আজ আমাদের নবজাগরণের ব্যাপারটাকে খাটো করে দেখা হচ্ছে এবং সে জাগরণের উদ্যোক্তাদের 'বিদেশীর তল্পিবাহক' বলেও আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। বাংলা তথা ভারতের পরাধীনতা ও ধর্ষিত এদেশে বৃটিশ শাসনের শোষণ ও কঠোরতাকে তাঁরা খুবই লঘু করে দেখছেন। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক স্বার্থে হৃষ্টপুষ্ট পাশ্চাত্যের বর্তমান উত্তরপুরুষ সমালোচকদের বহু 'অতীত পাপ' চাপা দেওয়ার অপচেষ্টা বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু

কৌতুককর হল ঐ জাতীয় দেশীয় সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী। প্রকারান্তরে তাঁরা গুরুতর দাবী পেশ করছেন একটা পযুর্দস্ত পরাধীন, জটিল এশীয় সামন্ত-ব্যবস্থার মধ্যে সন্তজাগ্রত মানুষদের কাছে। অথবা লঘু করে দেখছেন তাঁদের সেদিনের জীবনপণ প্রচেষ্টাকে। এই সব সমালোচকেরা তবে কার 'তল্পি-বাহক?' Comprador কার? আমাদের 'নবজাগরণের' বড় স্পর্শকাতর একটা প্রারম্ভ-বিন্দু আছে, মূলেই বোধ করি সেটা ভুলে যাই। একদা ইটালীর 'নবজাগরণ' সৃষ্টি করেছিল সাম্রাজ্যের সমাধিভূমি. আর আমাদের নবজাগরণের সূত্রপাত এক সাম্রাজ্যলোভী বিদেশীর উপনিবেশ সৃষ্টির মধ্য-ভূমিতে। ইওরোপের নবজাগরণের একটা মস্ত বড় কথা 'discovery of world and man', —জগৎ-ও মানুষের আবিষ্কার, আমাদের ক্ষেত্রে তার সূত্রপাত উপনিবেশ ও বহু শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত এক মানবগোষ্ঠীকে নানা ছলে শাসনে ও শোষণে। এই পরিমণ্ডলের মধ্যে দিয়ে আমাদের নবজাগরণের প্রথম স্তর অতিক্রান্ত হয়েছে নানা সংস্কার আন্দোলন, পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকার ও মালিন্যমুক্ত সবল একটা জাতীয় ঐতিহ্যের সন্ধানে—জাতীয় আত্মমর্যাদার সন্ধানে।

বস্তুত, নবজাগরণের আলোকে আমাদের সাংস্কৃতিক—প্রধানত সাহিত্যকে অবলম্বন করে যে জাগরণ তা ১৯শ শতাব্দীর মধ্য ভাগের আগে নয়। প্রসঙ্গত Jacob Burckhardt এর রেনেসাঁস সম্পর্কিত সেই উক্তি মনে পড়ে: পাঁচশ বছরের ভস্মস্তূপ থেকে ডানা মেলেছিল যেন রূপকথার পাখী। আমাদের ক্ষেত্রে শুধু পাঁচশ নয়, কয়েকটা পাঁচশ। এই ডানা মেলার ইতিকথা চলেছে আমাদের সারা ১৯শ শতাব্দী জুড়ে। শতাব্দীর শেষার্ধে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। জন্ম সন ১৮৬১, যখন নবজাগরণের ধারা তার দ্বন্দ্বসংঘাতের একটা প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে এসেছে। এবং যার মূল শিকড় শহরে। রেনেসাঁস-জাতবুর্জোয়া সভ্যতার যা স্বভাবধর্ম। এই শহরকে ঘিরেই সীমিত এক চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্তরে আলোকের যা কিছু বিচ্ছুরণ ঘটেছে, নতুন জীবন-বোধ—তথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ ঘটেছে। গ্রাম-প্রধান এ দেশের বৃহত্তর সমাজে সে বোধ ও বিকাশের গতি নবধারার শিক্ষাদীক্ষা প্রসারের অভাবে অত্যন্ত ক্ষীণ। উপরন্তু রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার প্রতিবন্ধকতা, দুর্মর মধ্যযুগীয় ভৌমস্বার্থ ও বর্ণাশ্রম স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা। প্রাচীন সভ্যতা-আশ্রিত জাতিগুলি যেন এক-একটি কূর্ম

অবতার। যখনি কোনও অন্যতর জীবন চর্যা ও চিন্তার সমাগম ঘটে তখন তার সমাজ নামক বস্তুটার প্রথম প্রতিক্রিয়া কমঠ-বৃত্তি, নিজেকে বাইরের জগত থেকে গুটিয়ে নেওয়া। তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তনের' গুরু—কুম্ভকযোগে যার বিনাশ থেকে আত্মরক্ষা ও প্রতিরোধ। বাংলায় তুর্কী অনুপ্রবেশ ও রাজ্যস্থাপনকালে তার এই চেহারা আমরা দেখেছি। তুর্কী আক্রমণ ও তার প্রথম দুশো বছরে বাংলার সাংস্কৃতিক (কোনও উল্লেখযোগ্য নজীর নেই। ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব এই কঠিন কচ্ছপের খোলস থেকে তাকে টেনে বের করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর দেওয়া নতুন জীবনের কোনও স্থায়ী রূপ শেষ পর্যন্ত টেকেনি। কালক্রমে নানা মধ্যযুগীয় সংস্কারের তথাকথিত 'ঐতিহ্যে' তা হারিয়ে গেছে। আর ঠিক ঐ শতাব্দীর বছরগুলির মধ্যে দিয়ে ইওরোপে চলেছে তখন পুনরুজ্জীবনের যুগান্তকারী রূপায়ণ ও বিজয় অভিযান। থাক সে ইওরোপের কথা, আমরা দেখছি সারা ১৯শ শতাব্দী জুড়ে আমাদের দেশে যে পুনরুজ্জীবনের আয়োজন—তার গতি কত সীমাবদ্ধ এবং প্রকৃতি কত অসম্পূর্ণ, সমাজের সর্বস্তরকে তা স্পর্শ করতে পারেনি। তারই মধ্যে অবশ্য শিক্ষায়, সমাজবোধে, স্বাদেশিকতায় ও আন্তর্জাতিকতাবোধে জেগে উঠছে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ। এই গোটা কালটার যাবতীয় তরঙ্গের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবন জড়িত—তার প্রস্তুতিপর্বাংশ পিতা ও পারিবারিক সূত্রে। এক শতাব্দীতে জন্ম তাঁর—জীবনাবসান পরবর্তী শতাব্দীতে। এক শতাব্দীর দ্বন্দ্ব ও নবীন উন্মেষের মধ্যে তাঁর জীবন-চেতনা, শিল্পী-চেতনার জন্ম ও পরিপোষণ—জীবন শেষ আর এক শতাব্দীতে যখন তাঁর পরিপোষিত সভ্যতার সংকট অনুপস্থিত এবং নতুন এক সভ্যতার—সাম্যবাদী সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ঘটছে। এদিক থেকে তাঁকে 'নবজাগরণে'র শেষ মহান পতাকাবাহী বলা যায়—যে পতাকা তিনি বহন করে এনেছেন আমাদের বিংশ শতাব্দীতে, যেখানে রেখে গেছেন তাঁর শেষ স্বাক্ষর। শুধু বাংলা নয়—সারা ভারতবর্ষের তরফ থেকে। তাঁর সুবিশাল বিচিত্র রচনাবলী এটারই প্রমাণ দেয়। সে কথা পরে আলোচ্য। আপাতত আমাদের কৌতূহল, যিনি জন্মেছেন, দুই কালের দুই সভ্যতার দ্বন্দ্বের মাঝখানে সেখানে পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে তাঁর নিজের দৃষ্টিকোণটা কী? কী তাঁর বিশ্লেষণ? তাঁর স্মৃতিচারণ, চিন্তা ও ব্যক্তিগত মতামত এ বিষয়ে একটা উল্লেখযোগ্য পর্বের জীবন্ত সাক্ষ্যস্বরূপ।

বাংলার 'নবজাগরণ' সম্পর্কে তিনি স্বতন্ত্র কোনও প্রবন্ধ রেখে যান নি। কারণ বোধ করি এই যে, স্বয়ং যিনি নবজাগরণের একজন মহৎ অংশীদার, তাঁর কাছে ও ব্যাপারে হয়ত কোনও প্রশ্নই ছিল না। প্রশ্ন ছিল না তাঁর পূর্বসূরি-দের চিন্তাধারা ও কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কেও। মনে রাখতে হবে—আমাদের কূর্মধর্মী বৃহৎ সমাজ ও মননের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এসব বক্তব্য।

আমাদের নবজাগরণের প্রথম অধ্যায়ে নানা সংস্কার-আন্দোলন। এবং সে অধ্যায়ের নেতৃত্বে রামমোহন। সেই কালের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনের অবদান সম্পর্কে আমাদের এই জীবন্ত সাক্ষীর প্রথম হলফনামা—

> 'রামমোহন রায় যখন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন তখন এখানে চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। আকাশে মৃত্যু বিচরণ করিতেছিল। মিথ্যা ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল।…
>
> 'অজ্ঞানের মধ্যে মানুষ যেমন নিরুপায় যেমন অসহায়, এমন আর কোথায়। রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারি-দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল।… সেই নিশীথে "মাভৈঃ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া যিনি একাকী অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহার মাহাত্ম্য আমরা আজিকার এই দিনের আলোকে হয়তো ঠিক অনুভব করিতে পারিব না।…
>
> 'কী সংকটের সময়েই তিনি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার একদিকে হিন্দু সমাজের তটভূমি জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল, আর একদিকে বিদেশীয় সভ্যতা সাগরের প্রচণ্ড বন্যা বিদ্যুদ্‌বেগে অগ্রসর হইতেছিল, রামমোহন তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।'
>
> [রামমোহন রায়]

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে 'চতুর্দিকে কালরাত্রির অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল', 'আকাশে মৃত্যু বিরাজ করিতেছিল', 'বঙ্গসমাজ সেই' 'প্রেতভূমি ছিল'—বস্তুত এসব উক্তির চিত্ররূপটা কী? নানালৌকিক অলৌকিক বিশ্বাস, বিচিত্র সব কুসংস্কার, তন্ত্রমন্ত্র, পুরোহিতের প্রতাপ—রহস্যময় বিধিলিপি-নির্ভরতা—এসব মিলে তখন আমাদের ঐতিহ্য-আশ্রিত ধর্ম। সমাজতত্ত্ববিদ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কথায়—

> 'The crass rites, ceremonies, beliefs that were being

added to Brahmins since the Gupta period, made it a jumble of rites and customs existing only for priestly exploitation.···Gupta age Brahmanical rites, Mahayanist ceremonies and beliefs, Buddhist-tantrik rites,··· Sahajyanist customs were all pounded together by the aggressive attack of Islam.

'Indo-Aryan customs at the time of marriage and law, Pauranic fasts and festivals,···totemistic notions of purity and taboo in the matter of touch and smell, non-Aryan customs, Buddhist-Tantrika rites and necromancies, Sahajyanist laxity of moral, non-vedic Phallic worship, belief in astrology, auguries and divinations, belief in witch-craft and sorcery were the compound known as Hinduism.

[Nineteenth Century and Renaissance)

বিচিত্রতরঙ্গসংকুল এ ধর্মাচরণ-মহাসাগরের কাণ্ডারী একমাত্র ব্রাহ্মণ পুরোহিত, যাদের মধ্যে বেদ-উপনিষদের চর্চা একেবারেই ছিল না। ঋগ্বেদের কল্পিত মাত্র ৩৩টি প্রাকৃত দেবতা তখন কিম্বদন্তীর ৩৩ কোটি দেবতায় সম্প্রসারিত, পূজিত ও প্রচারিত—অর্থাৎ পৌত্তলিকতার বিপুল মহোৎসব। পুরোহিত সমাজ তখন ব্রাত্য অনার্য কোনও দেবতাকেই আর বাইরে রাখে নি—দু'চার ছত্র সংস্কৃত মন্ত্র রচনা করে বিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে গ্রহণ করেছে। নেতৃত্ব তার একচ্ছত্র।

বাংলার জনসমাজ তখন প্রধান দুই ধর্মধারার নেতৃত্বে চালিত—এক ব্রাহ্মণ, অন্যটি বৈষ্ণব। ব্রাহ্মণরা অধিকাংশই শাক্ত। অন্যদিকে বৈষ্ণব সমাজের নেতৃত্বে গোস্বামীরা—যারা গৃহস্থের গুরুস্থানীয়। এ দুই ধারার নানা আচার, নানা অনুষ্ঠান—জীবনকে তুচ্ছ করার মতো উন্মাদনা ও অন্ধবিশ্বাস নানাভাবে ছড়ানো। দু-একটা নমুনা দিলেই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখিত সেই 'কালরাত্রি', সেই 'প্রেতভূমি'র স্বরূপটা স্পষ্ট হবে।

Francois Bernier তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে আমাদের দেশের রথযাত্রার একটা বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন। বর্ণনা পুরীর—যেখানে স্বয়ং চৈতন্যদেব পূজিত

জগন্নাথের রথযাত্রা-সমারোহ ভারতখ্যাত। উৎকট এক ধর্মোন্মাদনার চিত্র দিয়ে বার্নিয়ের লিখছেন—

> 'যখন সেই জগন্নাথের রথ ঘর্ঘর করে চলতে থাকে তখন সমবেত দর্শক-যাত্রীদের মধ্যে এমন এক বিকট বন্য উন্মাদতার সঞ্চার হয় যে তার তাড়নায় অনেকে সেই চলন্ত রথের চাকার তলায় পথের উপর শুয়ে পড়ে এবং নিষ্পেষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।...এর চেয়ে মহত্তর আত্মত্যাগ ও বীরত্বের নিদর্শন আর কিছু নেই,.. এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে পারলে তারা তৎক্ষণাৎ স্বর্গে চলে যাবে এবং সেখানে দেবতা তাদের পুত্রবৎ স্নেহ করবেন ও পালন করবেন।'

(বিনয় ঘোষ অনূদিত)

অন্যদিকে 'সতী'-প্রথার এক পাশব ধর্মানুষ্ঠান। ১লা অগ্রহায়ণ, ১২৩০ সাল—ইংরেজি ১৮২৩ সালের 'সমাচার দর্পণ' সহমরণের এক বর্ণনা দিয়ে লিখছে—

> 'মোং কোন্নগর গ্রামের কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি কুলীন ব্রাহ্মণ সর্বশুদ্ধা বত্রিশ বিবাহ করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তাহার জীবদ্দশাতে দশ স্ত্রী লোকান্তরগতা হইয়াছিল।...২১ কার্তিক বুধবার ঐ চট্টোপাধ্যায় পরলোকপ্রাপ্ত হইলে তাহার সকল শ্বশুর-বাটীতে অতি ত্বরায় তাহার মৃত্যু সংবাদ পাঠান গেল তাহাতে কলিকাতার এক স্ত্রী ও বাঁসবাড়িয়ার এক স্ত্রী ও নিকটস্থা দুই স্ত্রী এই চারিজন সহমরণোদ্যতা হইল।...২৩ কার্তিক...তৃতীয় দিবসের মধ্যাহ্ন কালে...ঐ চারিজন পতিব্রতা সহমরণ করিয়াছে।'

শোকোন্মাদ সদ্যবিধবার আকস্মিক মানস বিপর্যয় বা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যাওয়া এবং সহমরণ-কামনা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সহমরণের ঘটনা শুধুমাত্র তা থেকেই ঘটে নি। পুরুষ স্মার্তপ্রবর এবং লোকশ্রুতি বহুকাল প্রচারেই শুধু নারীর মনে এ সম্পর্কে একটা মিথ্যা ছলনার কল্পলোক সৃষ্টি করতে সক্ষম। ১৬ আগস্ট, ১৮২৩ সালের 'সমাচার দর্পণে'র অন্য এক সংবাদে বলা হয়েছে—শান্তিপুরের 'অষ্টাদশ বৎসর বয়স্কা' এক পরমাসুন্দরী সহমরণে উদ্যত হলে স্থানীয় থানাদার অনেক লোকজন নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় এবং বাধা দেয়। মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়—

> '...কি দরিদ্রতার ভয়ে কিম্বা পরিবারের বিদ্রূপের ভয়ে এই কর্মে

(সে) প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাতে সে উত্তর করিল যে আমার স্বামী আমার জীবিকার্থে সংস্থান রাখিয়া গিয়াছেন এবং সহমরণ করিতে আমার উপরে কেহ জোর করে না কিন্তু আমি স্বামিশবের সহিত দগ্ধ হইলে চতুর্দশ ইন্দ্রকাল পর্যন্ত পতিলোকে বাস করিব।...'

বহুপূর্বে বার্নিয়ের সাহেবও এরকম ঘটনার উল্লেখ করে গেছেন। সহমরণ-যাত্রীর মুখে শুনেছেন এই অলীক দার্শনিকতা ও রহস্যময় জন্মান্তর সম্পর্কের কথা। মন্তব্য করে গেছেন—

'মৃত স্বামীর ভস্মাবশেষের সঙ্গে নিজের দেহ মিশিয়ে দেওয়ার চেয়ে জীবনের মহত্তর কর্তব্য আর কিছু হতে পারে না। এটাই হল সনাতন প্রথা।... আমার ধারণা, পুরুষরাই হল এই সব প্রথা ও সংস্কারের স্রষ্টা।'

(বিনয় ঘোষ অনূদিত)

ইওরোপাগত বার্নিয়ের সাহেবের ধারণা ভুল ছিল না। তাঁর মজ্জায় ছিল বোধ করি রেনেসাঁসের মানবিক উদার দৃষ্টি—তাই আমাদের দেশের পাশবিক এ অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর উপরোক্ত মন্তব্য। অন্যদিকে সেই রেনেসাঁস উজ্জীবিত আমেরিকার আধুনিক এক বংশধর, ডেভিড কফ নামক এক সাহেব তাঁর British Orientalism and Bengal Renaissance গ্রন্থে ঘৃণ্য সতী-প্রথার মধ্যে ভয়ানক একটা বীরত্ব দেখেছেন। অন্য কিছু না। বাস্তবিক, অবক্ষয় আর কাকে বলে। জানি, রবীন্দ্রনাথও অপার এক সহিষ্ণুতার মধ্যে আমাদের চির অন্তরালবাসিনী নারীর এই রকম ধৈর্য, বীরত্ব ও প্রেমকে দেখেছেন—কিন্তু তার প্রসঙ্গ ভিন্ন। বস্তুত, 'সতী-প্রথা'র পৈশাচিক দিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কতখানি সজাগ ছিলেন তা তাঁর 'মহামায়া'* গল্পে বিধৃত হয়ে আছে।

'সতী' প্রসঙ্গ সেকালে তর্ক বিচারের ক্ষেত্রে সমাজে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। তথাকথিত আর্যধর্মনিষ্ঠ আমাদের সমাজে ঋগ্বেদের স্থান শীর্ষে। তা ঋষি নয়—স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী, এবং তার নির্দেশ অপরিহার্য ও অপরিবর্তনীয় বলে গৃহীত হত। সতীপ্রথার স্বপক্ষে ঋগ্বেদের যে শ্লোকগুলি স্বয়ং রঘুনন্দন উদ্ধৃত করেছেন তা মূল থেকে বিকৃত প্রমাণিত হয়ে যায়। শ্রেণী ও

বৈষয়িক স্বার্থে তথাকথিত স্মার্তবিধানদাতারা সমাজ তাঁদের বহুশ্রদ্ধেয় ঋগ্বেদকেও বিকৃত ও প্রক্ষিপ্ত করতে দ্বিধা করে নি। স্বয়ং রামমোহনের তর্কবিচার ছাড়াও এ বিষয়ে সেকালের অন্য এক প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদের বাংলা অনুবাদের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

> চিতার সম্মুখে সদ্যবিধবার প্রতি ঋগ্বেদ উচ্চারণ করেছে—
> '৮। হে নারি! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে গতাসু অর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া এস। যিনি তোমার পানিগ্রহণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন, সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্তব্য ছিল, সকলি তোমার করা হইয়াছে।' [১০।১৮।৮]
> বুঝতে কষ্ট হয় না—উপরোক্ত কথাগুলি সদ্যবিধবার প্রতি সান্ত্বনা বাক্য। তাকে পোড়াবার কোনও কথা এখানে নেই। এই শ্লোকের ঠিক আগের শ্লোকটি এই—
> '৭। এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া, মনোমত পতি-লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া সর্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন।' [১০।১৮।৭]

এ শ্লোকেও কোথাও পোড়াবার কথা নেই। এই শ্লোকটি সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মন্তব্য করে গেছেন—

> 'মূলে এই ঋকের শেষে এই শব্দগুলি আছে, "আরোহন্তু জনয়ঃ যোনিং অগ্রে।"... কিন্তু 'অগ্রে' শব্দের পরিবর্তে 'অগ্নেঃ' শব্দ পাঠ করিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ সতীদাহ প্রথা বেদসম্মত, এইরূপ বিবেচনা করিয়াছিলেন।'...

প্রাচ্যবিদ্যাবিদ ম্যাক্সমূলারের মন্তব্য থেকে জানা যায়—মূল পাঠের এই বিকৃতি প্রথম ধরা পড়ে অধ্যাপক উইলসনের চোখে।

এ বিকৃতির মাশুল কী?—কয়েক লক্ষ জীবন ছাড়াও কিছু বিশুদ্ধ বৈষয়িক লাভ। ১৮১৫—১৮২৮ সালের মধ্যে শুধু বাংলাদেশেই সতী হয়েছিল ৭,১৪১। অন্যদিকে, খাস বারানসী-কেন্দ্রিক সনাতন বিধান-আশ্রিত উত্তর ভারতে মাত্র ১০৫টি। এর কারণ উত্তরাধিকার নির্ণায়ক দুই

সমাজ-বিধির প্রথা—মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ। বাংলাদেশে প্রচলিত 'দায়ভাগ—যেখানে সন্তানহীনা বিধবারও সম্পত্তিতে অধিকার দেওয়া হয়েছে। অতএব তাকে 'সতীধর্মে' উদ্দীপিত করে পুড়িয়ে শেষ করতে পারলে সম্পত্তির অন্য অংশীদারদের বাড়তি লাভ।

এই মর্মান্তিক প্রথা রহিত করবার জন্য রামমোহন দ্বারকানাথ প্রমুখ লর্ড বেণ্টিঙ্কের কাছে যে আবেদন করেন তাতে আরও এক বাস্তব ও জৈব কারণ উল্লেখ করা হয়েছে—

> '—হিন্দু প্রধানেরা আপন ২ স্ত্রী পরস্পরার প্রতি অতিশয় সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া ··অবলা জাতির রক্ষণাবেক্ষণ যে পুরুষের নিয়ত ধর্ম তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া বিধবারা উত্তরকালে কোনক্রমে অন্যাসক্ত না হইতে পান'···ইত্যাদি।

এসব কারণও বিদ্যমান ছিল—এবং তথাকথিত উচ্চবর্ণের মর্যাদাহানিকর দুর্ঘটনার অপ্রতুলতাও তখন ছিল না। বাংলার ব্রাহ্মণসমাজে দেবীবর ঘটকের মেলবন্ধন-রহস্যের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। কদর্য কৌলিন্য-মর্যাদার অহংকারে ভরা দেশ, বহুবিবাহ যেখানে ধর্মাচরণের সম্মান পায়, স্ত্রীশিক্ষা যেখানে শূন্যের পর্যায়ে—কেবল মা-ঠাকুরমার মুখ থেকে শোনা সতীধর্মের ব্যাখ্যান ও লোকশ্রুতি মাত্র সম্বল। তা'র ভেতরের আসল চেহারাটা যে কী, আমাদের এ শতাব্দীর শরৎচন্দ্র তাঁর 'বামুনের মেয়ে'তে উদ্‌ঘাটিত করে গেছেন। অন্যদিকে বিগত শতাব্দীর বিদ্যাসাগর মশায় 'বিধবা বিবাহ' আলোচনা প্রসঙ্গে ঐ কদর্য কৌলীন্যের একটা ৪|৫ পৃষ্ঠা জোড়া প্রায় ২০০ নামের তালিকা দিয়ে গিয়েছেন। সে তালিকা সারা বাংলাদেশের নয়—খাস কলকাতার আসপাশের খবর মাত্র—বয়স অনুপাতে তার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দু-একটা নমুনা উদ্ধৃত করলে ছবিটি সম্পূর্ণ হবে :

নাম	বিবাহ	বয়স
ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৮০	৫৫
ভগবান চট্টোপাধ্যায়	৭২	৬৪
পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬২	৫৫
তিতুরাম গাঙ্গুলি	৫৫	৭০
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬	২০
শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৪	১৮

এবং বিদ্যাসাগর মশায় ত্রুটিভয়ে সবিনয়ে জানাচ্ছেন—

> 'কুলীনদিগের বিবাহের যে-সংখ্যা প্রদর্শিত হইলে, তাহা ন্যূনাধিক হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা অধিক সংখ্যক বিবাহ করিয়াছেন তাঁহার নিজেই স্বকৃত বিবাহের প্রকৃত সংখ্যা অবধারিত বলিতে পারেন না।'
>
> (বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী : সা, প্র, পৃঃ ২০৬)

সেদিনের সেই দেশ ও সমাজ—তার আচার-বিচার বিশ্বাস আজ উপকথার মতই শোনাবে। নরবলি(১), অন্তর্জলি, কাপালিক ও তান্ত্রিক শাক্ত, বামাচার(২), যখ(৩), সাগরে সন্তান বিসর্জন(৪), সতীদাহ(৫) ইত্যাদির বিবরণে এ প্রবন্ধ ভরে তোলার বোধ করি আর প্রয়োজন হবে না। প্রাসঙ্গিক চিত্ররূপ দেবে এ বিষয়ে উল্লেখিত সৃষ্ট সাহিত্য।

ব্রাহ্মণ্যচর্যার এইসব অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চলেছে বাংলার বৈষ্ণব ধারা। এককালে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধারায় যে বাংলাদেশ হাবুডুবু খেয়েছিল সে ধর্মের আদর্শগত উচ্চমান অতীতের স্মৃতি মাত্র। গুরু গোঁসাই—যাঁরা সমাজের নেতা, তাঁরা গোঁড়া ব্রাহ্মণদেরই আচারপদ্ধতি অনুকরণ করলেন। 'আচণ্ডালে ধরি দেয় কোল' তখন পুঁথির কথা মাত্র—জীবনের কথা নয়। গোস্বামীরা তাঁদের সম্প্রদায়গত সহজাচার, ভেক, কণ্ঠিবদলের পাশাপাশি গ্রহণ করলেন ব্রাহ্মণের পৌরহিত্য কৌশল। এ সম্পর্কে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অধঃপতিত একটা সমাজ-চিত্র তুলে ধরেছেন—

> '…various Vaishnava Sects fell under the influence of old Sahajyana cult and extreme form of Bamachara. They have unspeakable practices. In the name of love of Radha for Krishna, sex-laxity became prevalent. Again, the Goswammi Gurus put into practice the custom of Gurugnai or Guru-Prasad ··i.e. the custom

১-২। কপালকুণ্ডলা : বঙ্কিমচন্দ্র
৩। সম্পত্তি সমর্পণ : গল্পগুচ্ছ—রবীন্দ্রনাথ।
৪। দেবতার গ্রাস : রবীন্দ্রনাথ।
৫। মহামায়া : গল্পগুচ্ছ—রবীন্দ্রনাথ।

of sending the newly married wife after attaining her puberty, to spend her first night with the Goswami who is the Guru of the family. This practice has been prevalent all over the country among the Vaishnavas irrespective of cast and rank.···To the Vallavacharya sect it is a part of their "Pustimarga" doctrine.'*

১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ নিয়ে বোম্বাইয়ে এক মানহানির মামলা দায়ের হয়—যা 'বল্লভাচার্য মানহানি মামলা' রূপে পরিচিত। বাংলার বৈষ্ণবধর্ম প্রভাবিত সমাজের অংশে এই 'পুষ্টিমার্গ' প্রথম সুপ্রচলিতই ছিল—কালিপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' তার আংশিক চিত্ররূপ প্রকাশিত।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ছাড়াও আরও একটা ধর্ম-প্ররোচনার চাপ তখন লক্ষ্যণীয়—তা আগন্তুক ক্রিশ্চান মিশনারীদের। আমাদের পৌত্তলিকতার রঙ্গ আগে থেকেই মুসলমান ধর্মীয় আইনদাতাদের কাছে ছিল বিজাতীয় 'কাফেরের ধর্ম', ইংরেজের চোখে তা হল ঘৃণ্য বর্বরের ধর্ম—'hethen'-এর ধর্ম। এবং প্রথম যুগের উপনিবেশ-সন্ধানী ইওরোপীয়দের দ্বারা সারা ইওরোপে সে নিন্দাবাদ মুখরোচক সংবাদ হিসেবে ভারতের একটা কলঙ্কিত চিত্রকে প্রচার করেছে। শুধু বাইরে নয়—উৎসাহী মিশনারীরা ইংরেজ কোম্পানীর ছত্রছায়ায় নির্ভয়ে তাদের ধর্মের ডাক এবং নানা সহায়তার প্রলোভন নিয়ে হাজির হয়েছে আমাদের দোরগোড়ায়। এই মিশনারীদের হালচালের কিছুটা পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত অংশে পাওয়া যাবে—

'They had formed a very low or base idea of the Hindoo Shastras···and thought that their own was of a much higher order and form.···They were trying to convince people of this not only by publication of articles etc. in their organs from time to time but preaching it before the doors of the natives on and often.**

* Social Heredity of 19th Century—Dr. B. N. Datta
** Rammohun Ray and progressive movement in India
—J. K. Majumdar

এই কালের ধর্মান্দোলন ও তার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মাঝখানে রামমোহনের এগিয়ে আসা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী উক্তিকে স্মরণ করি—'রামমোহন রায় তাঁহার অটল মহত্ত্বে মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন।' কেন মাঝখানে দাঁড়ালেন? এ প্রতিরোধের ভূমিকার অর্থ শুধু তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম-জিজ্ঞাসার অন্তর্গত বলে মনে করি না—এ সমাজগত, তার ভবিষ্যত-গত। একালের কিছু সমালোচক যাঁরা তাঁকে ইংরেজ কোম্পানীর 'দালাল মাত্র' হিসাবে চিহ্নিত করতে বদ্ধপরিকর, তাঁরা তাঁকে শুধু কোম্পানীর নয়, 'খৃষ্টধর্মেরও' দালালী করতে দেখেছেন। এ কথা ঠিক, তাঁর একেশ্বরবাদ প্রচারে মিশনারী সম্প্রদায় আশা করেছিল—শেষ পর্যন্ত তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন। কিন্তু তা হয় নি। এ সম্পর্কে মিশনারীদের হতাশাজনক বিরোধ-বিসম্বাদ উল্লেখ্য। রামমোহন স্বসমাজের মাঝখানে মাথা উঁচু করে দাঁড়ালেন—ঐতিহ্যের নামে পুঞ্জীভূত অনেক জঞ্জাল পরিষ্কার করে শুধু বাঙলা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের একটি সর্বমালিন্যমুক্ত ধর্মের ঐতিহ্যকে স্থাপনের চেষ্টা করলেন। সেকালের পরি-প্রেক্ষিতে রামমোহনের এই ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ শুধু বিশুদ্ধ ব্যক্তিত্ব নয়, লক্ষ্য করেছেন স্বজাতিপ্রীতি, দেশপ্রীতি, স্বাদেশিকতার প্রথম নবীন এক উন্মেষ, স্বসমাজকে বাঁচাবার চেষ্টা।

রামমোহনের আবির্ভাবের পূর্বে এবং সিরাজের পতনের পর অর্ধশতাব্দী কাল—যে কালে বাঙালী সমাজে নবাগত বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সমবেত রাষ্ট্রচিন্তা বা রাজনৈতিক চিন্তা বা সামন্ততান্ত্রিক ধরনের কোনও একটা ওলট-পালট করার মতো রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের আভাসও পাওয়া যায় না। সিরাজের পতনকালে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি বা দেশীয় 'মহাশয়দের' কিছু উচ্চাশা ও স্বপ্ন ছিল তা ইংরেজ কোম্পানীর দুর্ধর্ষ ফৌজী তাড়না ও কূটকৌশলে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। মিরকাশিমের পর তার আর কোনও চিহ্ন রইল না। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর পুরাতন ভূম্যাধিকারীদের সব উদ্ধত চিহ্ন একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। বাঙালী হিন্দুর বৃত্তিজীবী বুদ্ধিজীবী উচ্চতর মহল পাঠান মুঘলের আমল থেকে সুলতান ও সম্রাট সেবায় দীর্ঘকাল অভ্যস্ত ছিল—প্রভু বদলে তারা ফার্সী ছেড়ে বরং দ্রুত ইংরেজী ভাষা আয়ত্তের দিকে ঝুঁকে পড়ল। রাজশক্তি আয়ত্তের বিন্দুমাত্র চিন্তা সেখানে দেখি না। অন্যদিকে বিপর্যস্ত রাজ্যহারা বাংলাব মুসলমান সমাজের উন্নত সচেতন অংশ বোধ করি হত-মর্যাদা ও অভিমানে দীর্ঘকাল নীরবতার অন্তরালে

স্তব্ধ হয়ে রইল। বহু পূর্বে হৃতরাজ্য হিন্দুর বিদেশীদের সঙ্গে মেলামেশা কাজকর্ম তাদের সেদিন ভালো লাগার কথা নয়। হিন্দু মুসলমানের বাংলার তখন এই হাল।

এই নিষ্ক্রিয়তা ও নিশ্চেষ্টার জড়ত্বের পরিমণ্ডলে একটি প্রাণবান দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন রামমোহনের মধ্যে। তাঁর স্বল্পকালীন কর্মানুষ্ঠানের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন ভাবী বাঙালী সমাজের নানামুখী প্রগতির ধারা। বলছেন—

> 'শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গসাহিত্য বল, সমাজ বল, ধর্ম বল…তিনি কোন কাজে না হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।'
>
> (বঙ্কিমচন্দ্র)

রামমোহনের এইসব বহু বিচিত্র কর্মধারার লক্ষ্য কী ছিল? চরিত্র কী ছিল? 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন—

> 'অধুনাতন কালে দেশের মধ্যে যাঁহারা সকলের চেয়ে বড় মনীষী, তাঁহারা পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বকে মিলাইয়া লইবার কাজেই জীবনযাপন করিয়াছেন। তাহার দৃষ্টান্ত রামমোহন। ·· আশ্চর্য উদার হৃদয় ও উদার বুদ্ধির দ্বারা তিনি পূর্বকে পরিত্যাগ না করিয়া পশ্চিমকে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।'

কাল বদলায়, অতীত বাস্তব ক্রমশ দূরে সরে যায়—তার একদা ভয়ংকর বিভীষিকারও তীক্ষ্ণতা যায় কমে। মানব-সমাজের পুরুষপরম্পরাগত স্মৃতির ইতিহাস এমনিই হয়। ১৯শ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে, সেই স্মৃতির ম্লানতায় রবীন্দ্রনাথ সক্ষোভে বলছেন—'ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা বলিয়া আমরা জানি না।'*

বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পার হয়ে বোধ করি আরও ভুলেছি। নইলে স্বাধীনতা-পরবর্তী আমাদের একালের কিছু কিছু সমালোচনায় তাঁর মূল্যায়ন অপমানিত হবে কেন?

আগেই বলা হয়েছে—রবীন্দ্রনাথের 'নবজাগরণ-দৃষ্টি' তাঁর নানা রচনায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। বর্তমান প্রচেষ্টা সেগুলিকে একত্রে সংগ্রহ করা। তাঁর মন্তব্য ও বক্তব্য সেকালের যেসব ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে উচ্চারিত হয়েছে—যারা

* বঙ্কিমচন্দ্র (১৩০১)—রবীন্দ্রনাথ।

বাংলার নবজাগরণের মহৎ অংশীদার ছিলেন—আমার আপাত লক্ষ্য, সেগুলিকে সামনে তুলে ধরা।

রামমোহনের পরে যে মানুষটি এ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

> 'বিদ্যাসাগর এই অকৃত কীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাংলার ইতিহাসে অতি বিরল। এত বিরল যে, এক শতাব্দী কাল মধ্যে কেবল আর দুই-একজনের নাম মনে পড়ে।' (বিদ্যাসাগর চরিত)

শতাব্দী-বিরল কী সে অনন্যতন্ত্রতা? সমাজ সেবায় সমাজের নীচুতলা পর্যন্ত তাঁর নিরভিমান অকুণ্ঠ উপস্থিতি, শিক্ষা বিস্তারের আজীবন উদ্যম, সমাজে একান্ত অবহেলিত নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত সংগ্রাম, নিষ্ঠায় আদর্শে অটল এক নির্ভীক ব্যক্তিত্ব। প্রথম দেশীয় চেষ্টায় উচ্চতর পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপন (মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসন—বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য:

> '…যিনি লোকাচার রক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন এবং সংস্কৃত বিদ্যায় যাহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজি বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপন করিয়া গেলেন।'
>
> (বিদ্যাসাগর চরিত)

অধিকন্তু, রামমোহন ও বিদ্যাসাগরকে একই বন্ধনীতে রেখে বলেছেন—

> 'একদিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপরদিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকট সাদৃশ্য দেখিতে পাই।…বেশভূষায়, আচারে ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালী ছিলেন। স্বজাতীয় শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না। স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূল পত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন—নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষরূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন।'… (বিদ্যাসাগর চরিত)

উপরোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে আমাদের নবজাগরণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। মাতৃভাষার চর্চা, চরিত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সামঞ্জস্য, লোকহিতৈষা, সংস্কারশূন্য জাতীয় শাস্ত্রজ্ঞান ও আত্মনির্ভরতা।

একথা ঠিক, সাহিত্যে আমাদের যে সংস্কৃতিগত নবজাগরণ, তা মধুসূদনের আগে ঘটে নি। মাতৃভাষা চর্চার ক্ষেত্রে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর তার পথ তৈরী করে গেছেন মাত্র। Jacob Burkhardt কথিত 'মরুভূমির মাঝখানে আকস্মিক প্রস্ফুটিত সেই বিস্ময়কর ফুল'-এর আত্মপ্রকাশ বস্তুত সহসা ঘটে না। সে ফুল পূর্ণ প্রস্ফুটিত হতে কেটে গেছে কম করেও দুই শতাব্দী। আমাদের প্রথম মুকুল মধুসূদন—১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ তখন অতিক্রান্ত। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের একটা বিশেষ লক্ষণ—এই কালে ইওরোপের জাতীয় ভাষাসমূহের বিকাশ। গ্রীক ও লাতিনের প্রতি সম্ভ্রম থেকেই তাদের জাতীয় অর্বাচীন ভাষা ইতালীয়, ফরাসী, পর্তুগীজ, ইংরেজি প্রভৃতি তাদের জাতীয় চেতনা উন্মেষের বাহন হিসেবে গড়ে উঠেছিল। অনুরূপ ধারাতে গড়ে উঠেছিল আমাদের বাংলা—তথা জাতীয় ভাষার চর্চা। নবজাগরণের যে জীবন-দর্শন অবশ্যই 'জন' ও 'গণ'—জীবনমুখী, আমাদের প্রথম যুগের গদ্যরীতির সংস্কৃতবহুল ভাষা তার যথার্থ বাহন হতে পারে নি। তার কারণগুলি রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, পরে তা আলোচ্য। মধুসূদনের কাব্যরীতিও যে ভাষাকে অবলম্বন করেছিল—তাও সংস্কৃতবহুল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিচারণে 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, পাঠ্যাবস্থায় শব্দের টীকাটিপ্পনি ও শব্দাড়ম্বর ওই কাব্যের রসগ্রহণকে তাঁর কাছে দুর্লভ করে তুলেছিল। তাঁর অপরিণত বয়সে তিনি দু-একবার বিরূপ সমালোচনাও করেছেন ঐ কাব্যের আদর্শ ও আঙ্গিক নিয়ে। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত 'সাহিত্য দৃষ্টি' প্রবন্ধে তাঁর যথার্থ রসগ্রহণ স্বীকৃতি দেখতে পাওয়া যায়।* নবজাগরণের প্রথম এই বিদ্রোহী কবিকে সেদিন আর চিনতে তাঁর ভুল হয় নি। 'মেঘনাদবধ' প্রসঙ্গে বলছেন—

> 'য়ুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, এ কথা যখন সত্য, তখন আমরা হাজার খাঁটি হইবার

* দ্রষ্টব্য : 'মেঘনাদবধ কাব্যে সমাজ বাস্তবতা'—ধীরেন্দ্রনাথ রায়।

চেষ্টা করি না কেন, আমাদের সাহিত্য কিছু না কিছু নূতন মূর্তি ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না।'
(সাহিত্য সৃষ্টি)

প্রাচীন কাব্যকথার এ যে এক নবযুগ-উপযোগী নবতর সৃষ্টি, সে কথা দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করেছেন—

> 'য়ুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব ঐশ্বর্যে পার্থিব মহিমার চূড়ার উপর দাঁড়াইয়া আজ আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে।...এই শক্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালে রামায়ণ কথার একটি নূতন বাঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল।...' (সাহিত্য সৃষ্টি)

তিনি বলছেন—রেনেসাঁস একটা বিশ্বগ্রাসী ভাব-প্রবাহ, সমগ্র বিশ্বের মানব-মনের কাছে তার আবির্ভাব। অপ্রতিরোধ্যতার প্রভাবে—

> 'সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলি প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানস সৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে। তাহার কত রূপ, কত রস, কতই বিচিত্র গতি।' (সাহিত্য সৃষ্টি)

বৃহৎ পৃথিবীর নগণ্য এক কোণে অবস্থিত অপরিজ্ঞাত বাংলাদেশ সেদিন এ মহাজাগরণ থেকে নিঃসম্পর্কিত ছিল না।—

পরবর্তীকালের যে মানুষটি নবযুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি পূর্ণতার রূপকার হিসেবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—তিনি বঙ্কিমচন্দ্র। 'বঙ্কিমচন্দ্র' সম্পর্কে তার দীর্ঘ প্রবন্ধের ভেতর থেকে মোটামুটি নবজাগরণের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি সামনে আনার চেষ্টা করছি।

প্রথম, সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে, নবযুগের নবভাব সঞ্চারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের অবদান সম্পর্কে—

> 'পূর্বে কী ছিল এবং পরে কী পাইলাম্‌তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিলাম ··কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য।...
>
> 'আমরা কিশোরকালের বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেইসব সমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে

একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম।'

দ্বিতীয় জাতীয় ভাষা—মাতৃভাষা। এ প্রসঙ্গে সেকালে তার অবস্থানটা কোথায় ছিল, সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবেই বলছেন—

'তৎপূর্বে বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরেজ পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন।'

…'যত কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা সৌন্দর্য প্রেম মহত্ত্ব ভক্তি স্বদেশানুরাগ, শিক্ষিত পরিণত বুদ্ধির যতকিছু শিক্ষালব্ধ চিন্তাজাত ধনরত্ন সমস্তই অকুণ্ঠিতভাবে (তিনি) বঙ্গভাষার হস্তে অর্পণ করিলেন।'…

তৃতীয় লক্ষণ—স্বজাতীয় শাস্ত্রজ্ঞান ও তার আলোচনা। সেদিন আমাদের তথাকথিত ধর্মাশ্রিত সমাজে কেবল নামেই ধর্মশাস্ত্রের স্থান দুর্ভেদ্য; সংস্কারের অন্ধ এক দুর্গের মধ্যে তা অবস্থান করছে। তাকে পাশ কাটিয়ে কোনও গতিই সহজ ছিল না। আমরা দেখেছি—আধুনিক জীবনে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার শতাব্দী সঞ্চিত জঞ্জাল সরাতে রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের আজীবন সংগ্রাম। এ দেশের ধর্মকে স্থূলভাবে গ্রহণ করে তাকে বিকৃত ব্যাখ্যা করার ক্রিশ্চানী অপচেষ্টাও কম ছিল না। এর মাঝখানে স্বাজাত্য, মর্যাদাবোধ ও গৌরব প্রতিষ্ঠার মস্ত বড় একটা দায়িত্ব গ্রহণের জন্য কালোপযোগী মনীষীরও প্রয়োজন ছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

'…একদিকে হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্মগ্রহণে য়ুরোপীয়গণের অক্ষমতা, অন্যদিকে শাস্ত্রগত প্রমাণের নিরপেক্ষ বিচার সম্বন্ধে হিন্দুদের সঙ্কোচ; ‥যথার্থ ইতিহাসটিকে এই উভয় সংকটের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে তাহার অমূলক অংশ পরিত্যাগ করিতে হইবে।'

পুরোহিত নির্দিষ্ট স্মার্তশাস্ত্র নয়—যুক্তি, বুদ্ধি ও ইতিহাস-গ্রাহ্য শাস্ত্র ব্যাখ্যা সেদিন শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে নবজাগরণের একটা বিশেষ লক্ষণ হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই। এরই ভেতর দিয়ে প্রাচীন রচনাগুলির সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দুর পরিচয় ও সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, পুরোহিত-তন্ত্রের দুর্গে আরও আঘাত পড়েছে, ভেঙে পড়েছে অলীক অবতার-বাদের

ধারণা।* বড় হয়ে উঠেছে মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা, মানুষের দাবী। এই কালের আত্মমর্যাদা ও আত্মোপলব্ধির ফলে সৃষ্টি হয়েছে এক জাতীয়তাবোধের। অবশ্যই তার সীমাবদ্ধতা আছে। সে প্রায় পৌণে শত বৎসরের কেবলমাত্র শিক্ষিত হিন্দুর পথপরিক্রমার ফল।

আরও একটা অসম্পূর্ণতার দিক ছিল—নগরকেন্দ্রিক রেনেসাঁস আমাদের নগর ও নাগরিক শিক্ষা-দীক্ষার সংকীর্ণ এলাকায় সীমাবদ্ধ থেকে যাওয়া। তাকে সমগ্র জনজীবনমুখী করতে পারা যায় নি। এ বিষয়ে গ্রামের মানুষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের একটা কঠোর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।

> 'কলিকাতাবাসী নব্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক পল্লীগ্রামের কোনও সংবাদ রাখেন না; তাঁহারা, কলিকাতার ভাবভঙ্গী দেখিয়া, তদনুসারে পল্লীগ্রামের অবস্থা অনুমান করিয়া লয়েন।…
> 'কলিকাতায় যে কারণে যতকালে যে কার্যের উৎপত্তি হইয়াছে, যে সকল স্থানে যাবৎ সেই কারণের ততকাল সংযোগ না ঘটিতেছে, তাবৎ তথায় সেই কার্যের উৎপত্তি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

বিদ্যাসাগরের এই জনমুখী দৃষ্টির পরিপূরক হিসেবে পরবর্তীকালে আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায় বিবেকানন্দের।

১৯০৮ সালে প্রকাশিত 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে এই স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলির অর্থবোধক বাক্য ও লক্ষ্য আমাদের নবজাগরণের মূল কথাটির দিকে আকর্ষণ করে—

> 'পূর্ব ও পশ্চিমকে দক্ষিণ ও বামে রাখিয়া (তিনি) মাঝখানে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন।…গ্রহণ করিবার, মিলন করিবার, সৃজন করিবার প্রতিভাই তাঁহার ছিল। তিনি ভারতবর্ষের সাধনাকে ভারতবর্ষে দিবার ও লইবার পথ রচনার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।'

একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মতো। যে অধ্যায়কে অনেকে একালে 'হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদ' বলে চিহ্নিত করে থাকেন—তার সামান্য মাত্র চিহ্ন বা অভিযোগ না বঙ্কিম, না বিবেকানন্দ সম্পর্কে তার উক্তিতে দেখা যাচ্ছে। দুই কালের মাঝখানে দাঁড়িয়ে, আমাদের এই জীবন্ত সাক্ষী বরং সমাজগতির

* বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র।

স্থির এক লক্ষ্যে চলাটাকেই অবলোকন করেছেন। এবং সে চলার গতি যখন প্রকাশ্য সংঘর্ষের মধ্যে এসে পড়েছে—এতদিনের অর্জিত শক্তির পরীক্ষার দিন সমাগত হয়েছে, তিনি আর দ্রষ্টা মাত্র থাকেন নি। ইতিহাস এই চিত্র দেয়—১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধে তিনি রাস্তায় নেমে পড়েছেন, রাখী বাঁধছেন। গান গাইছেন—যে গানগুলি আমাদের দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠ ফুল। সে ফুলগুলি কী বিশেষ কোনও ধর্মের? বিশেষ কোনও সম্প্রদায়ের? —না নবজাগরণের? ঐতিহাসিকরা তার জাত বিচার করুন —আমরা দেখছি: এ সেই মরুভূমির বিস্ময়কর ফুল।

২

১৯শ শতাব্দীর পটভূমিতে রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ কয়েকটি প্রধান প্রধান ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের নবজাগরণের যে বৈশিষ্ট্য, লক্ষ্য ও চরিত্র আলোচনা করেছেন—তার মধ্যে তাঁর একটি বিশেষ বক্তব্য প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মতো বারে বারে উচ্চারিত হতে শুনি। সে সত্য তাঁর ভাষায় 'মিলন-তত্ত্ব' (thesis); বিরোধ নয়—আত্মসমর্পণও নয়। এই মিলন-তত্ত্বের মধ্যেই তিনি লক্ষ্য করেছেন সভ্যতার গতি, জীবনের সচল প্রবাহ। এবং আমাদের রেনেসাঁসের চরিত্রও। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের শেষ দশকে লেখা 'কালান্তর' প্রবন্ধ (১৯৩৩)—বিপুল অভিজ্ঞতা ও মনন একটা সুস্থির সিদ্ধান্তে সংহত, সেই কালে, সমগ্র বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য ও সম্পর্ক কোথায় এবং কী ধরনের—তাঁর সন্ধান দিয়ে বলছেন:

> 'একদা রেনেসাঁসের চিত্তবেগ ইটালি থেকে উদ্বেল হয়ে সমস্ত য়ুরোপের মনে যখন প্রভাবিত হয়েছিল তখন ইংলণ্ডের সাহিত্য স্রষ্টাদের মনে তার প্রভাব যে নানারূপে প্রকাশ পেয়েছে সেটা কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। না হলেই সেই দৈন্যকে বর্বরতা বলা যেত। সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাকতেই পারে না—এই দেওয়া নেওয়ার প্রবাহ সেইখানেই নিয়ত চলেছে যেখানে চিত্ত বেঁচে আছে, চিত্ত জেগে আছে।'

এই দেওয়া-নেওয়া যেমন প্রাণের মৌলিক একটা লক্ষণ, তেমনি এ লক্ষণ কোন একটা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধও নয়— এসব দেশের, সর্বকালের।

জীবনের মৌলিক এ লক্ষণকে পাশ্চাত্য অথবা প্রাচ্য—এই রকম মার্কা মেরে দেওয়া ঠিক নয়।

জীবনের এই লক্ষণ নিয়ে আমাদের 'বাঁচা চিত্ত', 'জাগা চিত্ত' একদা আমাদের নবযুগের সৃষ্টি করেছিল। সেখানে নানা গোষ্ঠীর সমাবেশ যেমন ছিল—তেমন তার পার্থক্যও ছিল। ব্রাহ্ম ছিল, হিন্দু ছিল—যেমন অতি বাম ছিল, তেমন গোঁড়া সনাতনপন্থী ছিল এবং মধ্যপন্থীও ছিল। আমাদের সমাজ-গতির ক্ষেত্রে, জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে সেদিন যাঁদের অবদান আমাদের অগ্রসর করে দিয়েছে বিশ্ব-ইতিহাসের গতির দিকে—সামঞ্জস্যের দিকে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেদিক থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি এবং কোনভাবেই তা গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতায় আবিল বা আচ্ছন্ন নয়। তাঁর কলম বিদ্রূপে সরব হয়ে উঠেছে শুধু সেইখানে—যেখানে তৎকালীন দেশীয় পরিবেশে অতি বাম বা অতি দক্ষিণপন্থী গোঁড়ামী সমাজ-গতির প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। বস্তুত, নবযুগ-চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য তিনি চিহ্নিত করেছেন তা তাঁর সংহত ভাষায়—

> 'আধুনিক ভারতবর্ষে যাঁহাদের মধ্যে মানবের মহত্ত্ব প্রকাশ পাইবে, যাঁহারা নবযুগ প্রবর্তন করিবেন, তাঁহাদের প্রকৃতিতে এমন একটি স্বাভাবিক ঔদার্য থাকিবে যাহাতে পূর্ব ও পশ্চিম তাঁহাদেব মধ্যে একত্রে সফলতা লাভ করিবে।'

কিছুটা টুকরো টুকরো এবং এখানে ওখানে ছড়ানো হলেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি 'মিলন-তত্ত্বের' ব্যাপারটিকে আমাদের নবযুগের মর্মস্থান রূপে চিহ্নিত করেছে বারে বারে। সেই নিরিখে এখন আমাদের বিচার্য, এর মধ্যে তাঁর নিজের অবস্থান কোথায়।

সুদীর্ঘ জীবনে গদ্যে পদ্যে অজস্র তাঁর রচনা সম্ভার এবং এই দীর্ঘকালের মধ্যে বিশ্ব-ইতিহাসের যেমন রূপ-রূপান্তর ঘটেছে, তেমনি সমাজ-ভিত্তির অর্থনৈতিক রূপ-রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতিসমূহ এবং মানব-সম্পর্কের নানা পরিবর্তনও ঘটেছে। মানুষের বোধ-বুদ্ধি চেতনা প্রেরণারও নানা দিকে বিকাশ ঘটেছে—যেমন দেশ-দেশান্তরে, তেমন স্বদেশেও। এর মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে তাঁর চিন্তা ও রচনার ধারা—যার মধ্যে থেকে তাঁর 'নবজাগরণ'-জাত প্রেরণা ও গতিটিকে আমাদের খুঁজে নিতে হবে। বলা বাহুল্য তা বিস্তৃত

আলোচনা ও বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। আমরা এখানে মোটামুটি তাঁর পথরেখাটিকে খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করব।

এ অনুসন্ধানের কাজে, কি তাঁর কাব্যে-সাহিত্যে আর কি মননে দর্শনে কতটা যে তিনি পাশ্চাত্যের, কেউ কেউ সাল তারিখ ধরে ধরে তার বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। 'আমরা য়ুরোপের কার কাছ থেকে কী কতটুকু পেয়েছি তাই অতি সূক্ষ্ম বিচারে চুনে চুনে অনেক পরিমাণে কল্পনা ও কিছু পরিমাণে গবেষণা বিস্তার করে আজকাল কোন কোন সমালোচক আধুনিক লেখকের প্রতি কলম উদ্যত করে নিপুণ ভঙ্গীতে খোঁটা দিয়ে থাকেন।'—এ বক্তব্যে পাশ্চাত্য-সন্ধানীরা ক্ষমা করবেন—মন্তব্য আমার নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। বস্তুত, আমাদের নবজাগরণের চরিত্র-বিচারে রবীন্দ্রোক্ত 'মিলন-তত্ত্ব'টিকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবলি পাশ্চাত্য প্রভাবের অনুসন্ধান করা মনে হয় ঠিক নয়। কেউ কেউ 'মিলন-তত্ত্বের' এই ঝোঁকটাকেই পাশ্চাত্য-শিক্ষাজাত উদারতা বা আধুনিকতা (liberalism ও modernism) বলেন, westernism বা প্রতীচ্যাগত প্রভাব বলতে চান।* এতে পূর্বে উল্লেখিত রবীন্দ্রনাথের 'বাঁচা চিত্ত' 'জাগা চিত্তে'র তত্ত্ব বা theory মেলে না। ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা আসার আগে এদেশে ও বস্তুটা একেবারেই ছিল না—এই কথাটাকে মেনে নিতে হয়। কিন্তু সেটা কি সত্যি? যে-সভ্যতার ভিত্তি দুর্বল সে-সভ্যতা অন্য কোন প্রবলতর সভ্যতার আক্রমণের কাছে আত্মসমর্পণ করে হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যে সভ্যতা বহু প্রাচীন, ঐতিহ্যের ভিত্তি যার দৃঢ়মূল কোন না-কোন সত্যোপলব্ধির (হোক ভাববাদী) উপর প্রতিষ্ঠিত, সে-ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে ঘটে সম্মিলন। ভারতবর্ষে এমন সংঘাত প্রাচীন যুগে এবং মধ্যযুগে একাধিকবার ঘটেছে কিন্তু তার আত্মসমর্পণ বা অবলুপ্তি ঘটে নি। কিছুকালের একটা প্রতিরোধের পর বরং মিলন মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে সভ্যতা তার সম্প্রসারিত হয়েছে। এ তর্কের মীমাংসা ইতিহাসবিদেরা করুন—আমরা শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রে, মননের ক্ষেত্রে এই 'মিলন-তত্ত্বকেই' দেখি। আমরা আমাদের ১৯শ শতাব্দীতে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মৌলিক বিরোধ—দুই কালের দুই সভ্যতার বিরোধকে (antithesis) লক্ষ্য করি কিন্তু সম্মিলনের (thesis) ক্ষেত্রে আমাদের 'নবজাগরণ'—সভ্যতার সম্প্রসারণ। ইওরোপের রেনেসাঁস যে সর্বশৃঙ্খলমুক্ত মানুষের মহান প্রতিশ্রুতি ঘোষণা

* Rabindranath and Renaissance in Bengal—by Susobhan Sarkar.

করেছে, ইওরোপ যে মর্যাদায় তাকে গ্রহণ করেছে—রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা সত্ত্বেও আমাদের 'বাঁচা চিত্ত' সেভাবেই তাকে নিতে চেয়েছে, মিলিয়েছে—মিলেছে, সামঞ্জস্য করতে চেষ্টা করেছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর পূর্বপুরুষদের সেইভাবে অনুসরণ করেছেন। তাঁর 'রাষ্ট্র-নৈতিক মত'* গ্রন্থের মন্তব্যে তিনি জানিয়েছেন।

> 'বালককালের অনেক প্রভাব জীবনপথে শেষ পর্যন্ত সঙ্গী হয়ে থাকে, ..আমাদের ব্রাহ্ম পরিবার আধুনিক হিন্দু সমাজের বাহ্য আচার-বিচার, ক্রিয়া-কর্মের নানা আবশ্যিক বন্ধন থেকে বিযুক্ত ছিল। আমার বিশ্বাস, সেই কিছু-পরিমাণ দূরত্ববশতই ভারতবর্ষের সর্বজনীন সর্বকালীন আদর্শের প্রতি আমার গুরুজনদের শ্রদ্ধা ছিল অত্যন্ত প্রবল।...একথা সকলের জানা যে, সেকালে আমাদের পরিবারে ভারতেরই শ্রেষ্ঠ আদর্শের অনুসরণ করে ভারতের ধর্ম সংস্কার করবার উৎসাহ সর্বদা জাগ্রত ছিল।' (বাং ১৩৬৬, ইং ১৯২৯)

বস্তুত এই 'মিলন-তত্ত্বের' কাণ্ডকারখানা একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। আমাদের 'নবজাগরণে' এ একটা সুকঠিন পরীক্ষা। বড় বড় প্রতিভার ক্ষেত্রেও তার শ্রেণীগত, তার জাতধর্মগত নানা সীমাবদ্ধতা, নানা পিছুটান লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীচরিত্র এবং জাত-পাত চরিত্র (class ও caste) দুটিই মেশামিশি হয়ে বিরাজ করছে। তাই বঙ্কিমের 'বাংলাদেশের কৃষক' এবং 'সাম্যে'র পাশাপাশি দেখা যায় 'বাংলায় ব্রাহ্মণা-ধিকার'-এ একটা জাত-পাতগত গৌরববোধ। রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' প্রবন্ধে দেখা যায়—রেনেসাঁসের যে সর্বমানবমুখী আবেদন থাকা প্রত্যাশিত, তার বদলে সমাজ বলতে সেখানে সেই প্রাচীন সুবিধাভোগী শ্রেণী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উল্লেখমাত্র, 'আর্য-সমাজে'-তারাই গৃহীত ও গণ্য; শূদ্র অন্ত্যজ— তারা কোল ভিল সাঁওতাল ধাঙড় ইত্যাদি। স্মার্ত-ধুরন্ধর রঘুনন্দনের অনুশাসিত বাংলায় ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ছাড়া তো আর কোন জাতই ছিল না। বোংকরি জাত-পাতগত এ অভিজাত-গর্ব ও ধারণার উপর সর্বাপেক্ষা যিনি প্রচণ্ড আঘাত হানেন এবং অনাগত শূদ্র যুগের আবাহন রচনা করে যান তিনি বিবেকানন্দ।

*Political Philosophy of Rabindranath—by Sachindranath Sen.

তাই বলা যায়—আমাদের মিলন-তত্ত্বের পদ্ধতি চলেছে নানা জটিলতার মধ্যে দিয়ে, নানা বিরোধী স্রোতধারায়। এর পরেও আছে প্রবল anti-thesis-এর মূল দ্বন্দ্বগত ঘাত-প্রতিঘাত। রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ এক প্রতিভার মনোজগতে তার তরঙ্গায়িত বিক্ষোভ কেমন ধরনের—তার কিছুটা পরিচয় পাবো প্রমথ চৌধুরীকে লেখা কবির এক চিঠি থেকে। চিঠি-পত্রের কথা মনের বড় নিভৃত উপলব্ধি ও সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> '…এখন এক-একবার মনে হয়, আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলছে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম ও পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্ছে না, আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে—সেইজন্যে একদিকে বেদনা, আর একদিকে নৈরাশ্য। একদিকে কবিতা, আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালোবাসা, আর একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি, আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ।'…

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব ও তার উৎসমূলের পরিচয় এবং কর্মে ও চিন্তায় তার বিচিত্র বিস্তারের এ হল স্বয়ং কবি-কৃত বিশ্লেষণ। সেই বিশ্লেষণের আলোকে ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বৎসরের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নানা কর্মকাণ্ড ও চিন্তার ধারা—সমাজচিন্তা, স্বদেশচিন্তা, ধর্ম ও দর্শন, কর্মের প্রচণ্ড উন্মাদনা এবং পরবর্তী ঔদাসীন্য ও ভাবজগতে অধিষ্ঠান—সব কিছুর একটা ধারণা পরিষ্কার হয় বলে মনে করি। এ সব বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

মোটামুটি এখানে আমরা তাঁর 'নবজাগরণ'-ভাবনার গতিপথটিকে অনুসরণ করছি। ১৯০৫-এর পর তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় ১৯২২ সালের বিলাত যাত্রায়, সঙ্গে ইংরেজিতে অনূদিত কবিতার পাণ্ডুলিপি 'গীতাঞ্জলি'—১৯০৫-এর real থেকে সরে যাওয়া ideal-এর ফসল। আমাদের মনে হয়—এ কবির 'মিলন-তত্ত্বে'র গভীরতর ও বৃহত্তর অর্থপূর্ণ এক প্রথম পদক্ষেপ। 'গীতাঞ্জলি' পাশ্চাত্যের ভাবুক 'নিউক্যাসলে কয়লা বয়ে নিয়ে যাওয়া' নিশ্চয় নয়। কবির জীবনে নতুন এ এক দিগন্তের উন্মোচন। পাশ্চাত্য

তাঁর ideal-এর ফসলকে সগৌরবে গ্রহণ করেছে—নোবেল একাডেমির সভায় কবিকে পুরস্কার দিতে গিয়ে উপ্‌সালার আর্চবিশপ জানালেন—

> 'The Nobel prize for literature is intended for the writer who combines in himself the artist and the Prophet. None has fulfilled these conditions better than Rabindranath Tagore.'

বিদেশের উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে দেখছি 'combines in himself the artist and the Prophet'—ভাবুক শিল্পী ও ভবিষ্যৎদ্রষ্টার এক সম্মিলন। কবিশিল্পী আমাদের সকলের কাছে সুপরিচিত, কিন্তু এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টার কী পরিচয়, প্রকৃতি কী?

১৯০৫-এর 'রাখীবন্ধনে'র স্মরণে শান্তিনিকেতনে ৩০ আশ্বিন প্রতি বৎসর এ অনুষ্ঠান হত। বাংলা ১৩১৬, ইং-১৯০৯ সালের অনুষ্ঠানে কবি অজিতকুমার চক্রবর্তীকে এক চিঠিতে লিখছেন—

> 'যে-রাখীতে আত্মপর শত্রুমিত্র স্বজাতি বিজাতি সকলকেই বাঁধে সেই রাখীই শান্তিনিকেতনের রাখী।···পূর্ব-পশ্চিম, রাজা-প্রজা সকলকেই ভারতবর্ষ সকল প্রকার বিরুদ্ধতার ভিতরেও একক্ষেত্রে আকর্ষণ করবার জন্য চিরদিন চেষ্টা করছে—এই তার ধর্ম, এই তার কাজ, অন্য দেশের পোলিটিক্যাল ইতিহাস থেকে এ সম্বন্ধে আমি কোন শিক্ষা নিতে প্রস্তুত নই, আমাদের ইতিহাস স্বতন্ত্র।'

কবির কাছে কী সে ইতিহাস? বহুকে, বিচিত্রকে নিকটকে-দূরকে ঐক্য গ্রথিত করার ইতিহাস। যুগযুগান্তরের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নানা জাতির উদয় বিলয়ে, নানা আক্রমণ ও জয়-পরাজয়ের পরে, নানা ধর্ম ও মত-পথের বিরোধের মধ্যে এক উদার, সহিষ্ণু, অবিচল স্বদেশ মূর্তি তাঁর ideal—তাঁর বহু রচনায় এর সাক্ষাৎ আমরা পাই। সহস্র দ্বন্দ্ব-বিরোধের মধ্যে দিয়ে এই ভারতবর্ষ একটা ঐক্যের সূত্র গ্রথিত করে চলেছে কাল থেকে কালে। কবির মনে এই কথাটা ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে যে, ভারতবর্ষ যে সত্যের জোরে আপনাকে নিশ্চিতভাবে লাভ করতে পারে—সে সত্য প্রধানত "বণিগবৃত্তি নয়, স্বরাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বাজাগতিকতা (Internationalism)।'···ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈত তত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগ সাধনা।'

আশা করি, কর্মে যোগ সাধনা বলতে কেউ যৌগিক সাধনা ধরে নেবেন না—এহল একনিষ্ঠ কর্ম।

আমরা জানি, সেকেলে (১৩১৬) অর্থাৎ ১৯০৯-১০ সালের দিকে 'স্বরাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়—বিশ্বজাগতিকতা'—কবির এ উপলব্ধিজাত সত্য আমাদের দেশের দশের কাছে যেমন উপহাসের বস্তু ছিল—আজও তার কিছু কমতি হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই মহান প্রতিভার দীর্ঘ পদযাত্রার মানচিত্র অাঁকতে হলে আমার উপায় নেই, তাঁকে অনুসরণ করেই চলতে হবে। 'বিশ্ববোধ' প্রবন্ধে তিনি বলছেন—

> 'সাম্রাজ্যিকতা বোধকে য়ুরোপ পরম মঙ্গল বলে মনে করছে এবং সেজন্য বিচিত্রভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে—বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল।...'

এবং একটা আহ্বান অনুভব করছেন মনে মনে। বলছেন—'আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড়ো রকম করে সার্থক করবার দিন আমাদেব এসেছে।' এই ছিল সেদিন পাশ্চাত্যে 'গীতাঞ্জলি' পরিবেশনের পেছনের ভূমিকা বা মানসিক প্রস্তুতি। বস্তুত, তাঁর জীবনীকার প্রভাতকুমার এই রকম একটা আভাস দিয়েছেন—তিনি 'গীতাঞ্জলি'র কবিতাগুলি ইংরেজিতে তখন অনুবাদ করছেন 'বিলাতে গিয়া যদি কিছু পড়িতে হয়।'

এই বিলাত যাত্রায় নোবেল প্রাইজ ছাড়াও কবির লাভ হল নতুন অভিজ্ঞতা। তাঁর 'বাঁচা চিত্ত' 'জাগা চিত্ত' পাশ্চাত্যের প্রাণ-চাঞ্চল্য থেকে যেমন নতুন জীবন-রস সংগ্রহ করেছে, আধুনিক জগত ও জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে—তেমনি তাঁর কথিত সেই Ideal ও Real-এর দ্বন্দ্ব-ভূমি থেকে নতুনতর উপলব্ধি আরও গাঢ়তর গভীরতর হয়েছে, তাঁর সেই 'মিলন-তত্ত্ব' আরও দৃঢ়ভিত্তিতে স্থাপিত হয়েছে।

এর পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধল—কবি-মনে তার প্রতিক্রিয়া কী, সে তাঁর 'বলাকা' কাব্যের বহু কবিতায় বিধৃত হয়ে আছে। সংক্ষেপে বলা যায়—জরাগ্রস্ত আচার-বিচার-সংস্কারের ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে শুধু স্বদেশের ক্ষেত্রেই নয়—সর্বদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যৌবনের গান, জীবনের গান, গতির গান। এবারের ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা ভ্রমণে কবির যে অভিজ্ঞতাগুলি লাভ হল সেগুলি লক্ষ্যণীয়। প্রথম : সেই দেশের সাম্রাজ্যবাদী রূপ, যে-দেশ থেকে একদা রেনেসাঁসের মহৎ ভাব ও বাণী ভারতকে নবজীবনের প্রেরণা দিয়েছিল।

এ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ পূর্বে তিনি অবশ্য স্বদেশেও পেয়েছেন। দ্বিতীয়ঃ তাঁর উপলব্ধ সত্য, পূর্বোক্ত 'বিশ্ববোধে'র শ্রোতাও এখানে আছে। তৃতীয়ঃ দেখলেন এই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কিছু ইওরোপীয় মানুষকে। তাঁদের কথা, পরবর্তী কালে 'বলাকা'র যুদ্ধ-সম্পর্কিত কবিতাগুলি শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের বোঝাবার সময় কিছু ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন। সে-ব্যাখ্যার অনুলেখন থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ৪র্থ কবিতা 'শঙ্খ' ব্যাখ্যায় বলছেন—'...যে যুদ্ধ হয়ে গেল তা নূতন যুগে পৌঁছবার সিংহদ্বার স্বরূপ।'...এ যুদ্ধ যে ক্ষুদ্র স্বার্থে, লোভে, শক্তির দম্ভে, জাতিগত দৃষ্টিসংকীর্ণতার নাগপাশে মানুষকে বাঁধতে চেয়েছে সে সম্পর্কে বলছেন—

> 'আরও ভাঙবে, সংকীর্ণ বেড়া ভেঙে যাবে, ঘরছাড়ার দলকে এখনও পথে পথে ঘুরতে হবে। পাশ্চাত্য দেশে দেখে এসেছি, সেই ঘর-ছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবীকালকে দেখতে পাচ্ছে যে-কাল সর্বজাতির লোকের।... রোমা রোলাঁ, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতি এই দলের লোক। এরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল বলে অপমানিত হয়েছে, জেল খেটেছে, সর্বজাতিক কল্যাণের কথা বলতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছে।...পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায়, এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখছে।'

উপরে উদ্ধৃত 'নূতন যুগ' বলতে তিনি কী বোঝাচ্ছেন ? —১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব—জাতিবর্ণহীন, নতুন আর এক সভ্যতার অভ্যুদয় ছাড়া এ আর কী হতে পারে ? লিখছেন—'এখানকার যে-সব মনীষী বিশ্বমানবের সমস্যা বড় রকম করে চিন্তা করছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এঁদের সঙ্গে আলাপ হলে মন মুক্তি লাভ করে। কেননা মানুষের মুক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে ভাবের ক্ষেত্র।'

(শান্তিনিকেতন পত্রিকা, বাং ১৩২৭, ইং ১৯২০)

প্রসঙ্গত বলে রাখা দরকার, ১৯১২ সালের বিলাত ভ্রমণে কবি ইংলণ্ডের বহু গুণীজনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন বহু বুদ্ধিজীবী ও বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে। এবার ১৯২০ সালের ভ্রমণে অন্তরঙ্গ হয়েছেন রোমা রোলাঁর সঙ্গে। তাঁর সম্পর্কে রোলাঁর একটা পূর্ব-আকর্ষণও ছিল, এর আগেই জাপানে 'ন্যাশনালিজম' সম্বন্ধে যে বক্তৃতা তিনি দেন মুদ্রিত আকারে তা রোলাঁ দেখেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে, রোলাঁ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাবুক-

দের স্বাক্ষরযুক্ত 'Declaration of Independence of the spirit' নামে যে এক ইশতেহার প্রকাশ করেন, তাতে রবীন্দ্রনাথেরও স্বাক্ষর ছিল—সেই সূত্রেই পত্র-পরিচয়।

সেই বিখ্যাত ইশতেহারের কিছু উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয় :

'Arise ! Let us extricate the spirit from these compromises, these humiliating alliances, this secret slavery. The spirit is the servant of none : We have no other master···We serve Truth alone which is free, with no frontiers, with no limits, with no prejudices of race or caste···We work for it, but for it as a whole···We do not recognise nations, we recognise the people—one and universal.'

১৯২০ সালে আবার য়ুরোপ যাত্রার পূর্বে কবির মানসিক অবস্থাটা জানা এ প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ১৯১৯ সালে 'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠা কালে কবি বলছেন—'উহার (বিশ্বভারতী) মৈত্রীর আদর্শ ভারতের বাহিরেও বলিবার মত কথা।'···যুদ্ধান্তে রণক্লান্ত য়ুরোপের কাছে তাঁহার কিছু বলিবার আছে—এইটি মনের মধ্যে তীব্রভাবে অনুভব করিতেছেন। (র. জীবনী)

এই অনুভূতি এবং উপরে উদ্ধৃত ইশতেহারের আবেদন—দুটির গরমিল নেই বরং এ একটা সামঞ্জস্যের দিকে কবিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সেই 'মিলন-তত্ত্ব' জাত বিশ্ববোধের সঙ্গে কোথাও তার বিরোধ নেই। বরং সর্বজাতিক সেই মিলন-যজ্ঞের দিকে এগিয়ে যাওয়ার এটি পূর্বাভাস।

এবারে সারা ইওরোপে ঘুরছেন কবি, ঘুরছেন আমেরিকায়। একদিন রেনেসাঁসের যে পীঠস্থান থেকে নতুন এক সভ্যতার আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ হয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে, উচ্চারিত হয়েছিল মানব-মর্যাদার মহত্তম বাণী—বিকারের নিষ্ঠুর পীড়নে তা তখন হয়ে গেছে প্রেতভূমি। তার মধ্যে মানুষও আছে—রোলাঁ, লেভি, হাউপ্টমান, যাকোবি, টমাস মানের মত মানুষ —আর আছে যুদ্ধবিধ্বস্ত ছন্নছাড়ার দল। নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে ভারতবর্ষের কবি ঘুরে বেড়ান। ১৯২১ সালে এনড্রুজকে লেখা এক চিঠিতে তাঁর সে সময়কার মানসিক অবস্থার চিত্রটা এই রকম দেখা যায়—

'···পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ দুঃখক্লিষ্ট, সেজন্য আমার মন অত্যন্ত ভারা

ক্লান্ত। কিন্তু রুদ্ধ হৃদয়ে তীব্র আক্রোশ প্রকাশ করিয়া কি হইবে? সত্যের মহাশক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছি।

'পূর্ব ও পশ্চিমের মিলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা কিন্তু আজ চারিদিকে বিভীষিকাময় রাজনীতি ছাড়া কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না।..

(তবু) এই মিলনের মধ্যে মহা ভবিষ্যতের বীজ সুপ্ত,—এই কথা যখন অন্তরে অনুভব করি, তখন প্রত্যক্ষ বর্তমানের মর্মন্তুদ মনোবিকার হইতে নিরাসক্ত মনকে ফিরিয়া পাই। আমার ভারতীয় আত্মিক সাধনা হইতে এইটি জানিতে পারিয়াছি যে দ্বৈতের মধ্যেই অদ্বৈতম্ প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব ও পশ্চিমের দ্বৈতভাবের মধ্যেও এই ঐক্য, এই অদ্বৈতম রহিয়াছে। সুতরাং পরস্পরের মিলনে উভয়েই একদা সার্থক হইবে।' (র. জীবনী)

স্বপ্নচারী কবি! একটা পরাধীন দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা! এটা সহজেই অনুমেয় —ক্ষাত্র ক্ষমতার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত যারা, কুবেরের পুঞ্জিত ঐশ্বর্যের বিকার যাদের রাহুর মত গ্রাস করেছে তাদের কাছ থেকে, অথবা তাদের কাগজপত্রে উপহাস অথবা বিরূপ মন্তব্য ছাড়া আর কী পাবেন কবি। পেয়েছেনও তাই। পরাধীন Prophet—সে যে দুস্তর ব্যবধান। শুধু ইওরোপের ভাবুকমণ্ডলী তখনও শেষ হয়ে যায় নি।

প্রায় চৌদ্দ মাস অতিবাহিত করে কবি দেশে ফেরেন—ফেরেন ইওরোপ আমেরিকার একটা প্রভুত্বলোলুপ ভয়ংকর চিত্র নিয়ে। এ যেমন real—নির্মম বাস্তব, তেমনি দেখি তাঁর অটল ideal-কে, আদর্শকে।

এবার বিচার্য তাঁর জীবনের শেষ দূরযাত্রার পর্ব—১৯৩০ সালে সোভিয়েত রাশিয়ায়। তার জীবনীকার প্রভাতকুমার লিখছেন—'কবির ইংরেজ বন্ধুবান্ধবরা তাঁহার শরীর খারাপের অজুহাতে রুশ-যাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টায় ছিলেন।' এই একই অজুহাত দেখা যায় ১৯২৬ এবং ১৯২৯ সালেও। কবি রাজনীতির জটিল পাকে-চক্রে যেতে চিরকাল একান্তই অনিচ্ছুক—কিন্তু তদানীন্তন বিশ্বরাজনীতি-চক্র তাঁকে ছাড়ে নি। এ ইটালীর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, দেখেছি জাপানের ক্ষেত্রে। তাছাড়া আছে নানা রটনা—রাশিয়ার বলশেভিকদের সম্পর্কে কি ভারতবর্ষে, কি বৃহত্তর বিশ্বে নানা ভীতিকর কুৎসার প্রচার। তবু ওদেশটি সম্পর্কে সত্য

কথা শোনাবার মত বন্ধুর অভাবও তাঁর শেষদিকে হয় নি—যেমন রোলাঁ।
১৯৩০ সালে কবি চললেন রাশিয়ায়—এ ভ্রমণের ফসল 'রাশিয়ার চিঠি।'
এ গ্রন্থকে শুধু আমরা তাঁর লব্ধ অভিজ্ঞতার বিবৃতিমাত্র বলে মনে করি না।
তাঁর সারা জীবনের চিন্তার যে পদ্ধতি, যে প্রত্যাশা, যে ideal ও real-এর
দ্বন্দ্ব ও তাঁর 'মিলন তত্ত্ব'জাত পরিণামের জন্য দুর্নিবার একটা আকাঙ্ক্ষাকে
লক্ষ্য করেছি—যাকে সার্বজাতিক (Internationalism) বলে অভিহিত
করতে পারি, তা কী এখানে এসে শান্ত হল? এমন একটা ছবিই আমার চোখে
ভাসে—রিপ্‌ভ্যান উইঙ্কলের মতো কাল-ছাড়া, দেশ ছাড়া এক ঋজুদেহী,
শ্বেতশ্মশ্রু, শুভ্রকেশ বৃদ্ধ ইওরোপ আমেরিকার দেশে দেশে ঘুরছেন দরোজায়
দরোজায় ঘা দিয়ে—পেছনে লেগে রয়েছে ক্ষুদ্র,' সংকীর্ণ ইতর কালের
উপহাস। এ কী Prophet? এ কী পাগল? দেশ ও দশের সীমানা
ছাড়া, চিরাচরিত রীতিপদ্ধতি দেশাচার ছাড়া এ 'পাগল' বললেন, রাশিয়ায়
'না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।'

কেন?—

> 'আজ পৃথিবীতে অন্তত এই একটা দেশের লোক স্বাজাতিক স্বার্থের উপরেও সমস্ত মানুষের স্বার্থের কথা চিন্তা করছে। স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যার অন্তর্গত—এই কথাটা বর্তমান যুগের অন্তর্নিহিত কথা। একে স্বীকার করতেই হবে।'

দূরাতীত এক সভ্যতার মিলন-যজ্ঞের প্রাঙ্গন থেকে যাত্রা শুরু করে, শেষ
হল নতুন আর এক সভ্যতার যজ্ঞভূমিতে।

জীবনের বাকি অংশে বারে বারে তাঁর কাছে ধিক্কৃত হয়েছে পাশ্চাত্যের
তদানীন্তন বিকার, সভ্যতার দুঃস্বপ্ন—তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন 'কালান্তর' ও
'সভ্যতার সংকটে'। সে-সবের আলোচনা, বিশ্লেষণ, স্মৃতিচারণ—তার সব
কিছুকে বোধ করি মাত্র এই দুটি সংহত পংক্তিতে প্রকাশ করা যায়—

> বলে যাব, দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
> গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়॥

[জন্মদিন: ১৩৪৫]

বাঙলার জাগরণ ও 'ভদ্রলোক'

· নরহরি কবিরাজ

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যুক্ত এক শ্রেণীর গবেষক সম্প্রতিকালে বাঙলার ইতিহাস নিয়ে বেশ আলোচনা শুরু করেছেন। তাঁরা বাঙলার ইতিহাসের বিভিন্ন দিক্‌ নিয়ে বই লিখছেন। তবে তাঁদের প্রধান আকর্ষণের বস্তু—ইংরেজ আমলের বাঙলা।

উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, অধ্যাপক ডেভিড কফের কথা। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণ সম্পর্কে একখানি বই প্রকাশ করেছেন। ভারতে ইংরেজ শাসনের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—ইংরেজ শাসনের ইতিহাস শুধুমাত্র ভারত শোষণের ইতিহাস—একথা ঠিক নয়, তাঁর মতে একথা অর্ধ-সত্য, একটি অতি-রঞ্জিত কাহিনী। ঐ অধ্যাপকের মতে ভারতে সভ্যতার আলো বিকীরণের পবিত্র দায়িত্ব পালন করেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তাঁদের সহযোগী ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদেরা, তাঁর মতে ওয়ারেন হেষ্টিংস হলেন 'ভারতের জনক', 'এশিয়ার মুক্তিদাতা'। তাঁর আর একটি আবিষ্কার ভারতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের উদগাতা ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। তিনি মনে করেন ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ ও তাঁদের ভারতীয় সহযোগী ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতেরাই বাঙলার জাগরণের পথপ্রদর্শক। রামমোহন ডিরোজিও প্রমুখরা বাঙলার জাগরণের নায়ক—এই প্রচলিত ধারণাটিকে নস্যাৎ করার জন্যেই অধ্যাপক কফ উপরোক্ত যুক্তিজালের অবতারণা করেছেন।(১)

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়-ভুক্ত আর একজন অধ্যাপক ব্রুমফিল্ড বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনকে তাঁর আলোচনায় বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর পুস্তকে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়, ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে, বাঙলায় যে আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাকে মোটেই জাতীয় জাগরণ বলা চলে না। ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সুবিধা আদায়ের স্বার্থান্বেষী আন্দোলন ছাড়া

এটি আর কিছু ছিল না। বিষয়টি ব্যাখ্যা করে ঐ গবেষক বলেছেন—এটি ছিল 'ভদ্রলোক'দের আন্দোলন। 'ভদ্রলোক' কারা? এই প্রশ্নটির জবাবে তিনি লিখেছেন—যারা কায়িক পরিশ্রম করে না, অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা জমির খাজনা এবং চাকুরিগত জীবিকার উপর নির্ভরশীল, সামাজিক দিক থেকে যারা উপরতলার সুবিধাভোগী অংশের অন্তর্ভুক্ত, শিক্ষার কৌলীন্য ও উঁচু জাতির (Caste) তকমা ধারণ করে যারা গরীব জনগণ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে অভ্যস্ত—তারাই 'ভদ্রলোক'। ঐ গবেষকের সুচিন্তিত অভিমত : ভদ্রলোকেরা জাতীয়তাবাদী বলে যতই বড়াই করুক না কেন, গরীবদের চোখে তারা ছিল 'উপরতলার শোষক জাতিগুলির প্রতিনিধি মাত্র।'—ভদ্রলোকদের আন্দোলন ছিল যতটা ইংরেজ-বিরোধী, তার চেয়েও বেশী জনবিরোধী।(২)

এই মতের প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত এক ধরনের গবেষণামূলক পুস্তকেও। কিছুদিন পূর্বে অক্সফোর্ডে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় (১৯৬৯-৭০)। ঐ সেমিনারে একটি নিবন্ধে রোনাল্ড রবিনসন বলেন—সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে পুরানো ব্যাখ্যা পরিবর্তন করে তিনি নতুন ব্যাখ্যা উপস্থিত করতে চান। তাঁর মতে পুরানো ব্যাখ্যায় (প্রসঙ্গত তিনি হবসন ও লেনিনের নাম উল্লেখ করেন) অত্যধিক জোর পড়েছে ইওরোপ ও এশিয়ার মধ্যে **বিরোধের** দিকটার উপর। তাঁর নতুন ব্যাখ্যার লক্ষ্য হবে—এশিয়া কিভাবে ইওরোপের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের শিকড়টি শক্ত করে রেখেছিল তা দেখানো। তিনি জোর দিতে চান এশিয়া ও ইওরোপের **সহযোগের** উপর।(৩)

এই মডেল অনুযায়ী অধ্যাপক অনিল শীল একখানি বই প্রকাশ করেছেন। তিনি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র চিত্রণ করে বলেছেন—ভারতীয়দের সঙ্গে সহযোগিতাই ছিল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি। প্রথম দিকে ইংরেজ শাসনের সহযোগী হয়ে ওঠে ভারতীয় রাজা-রাজড়ারা। পরে ইংরেজ শাসনের আওতায় একটি ইংরেজী শিক্ষিত সুবিধাভোগী গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, যারা নতুন অবস্থায় নতুনভাবে ইংরেজদের সহযোগী হয়ে ওঠে। তিনি আরও লিখেছেন—এই ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা বাঙলায় 'ভদ্রলোক' বলে পরিচিত। এই ভদ্রলোকেরা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অর্থাৎ বাঙলায় এরা ছিল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক। সামাজিক

মর্যাদার দিক থেকে এরা ছিল উচ্চ জাতিসম্ভূত এবং নীচ জাতির লোকদের ঘৃণা করতে অভ্যস্ত। অর্থনৈতিক জীবনের দিক থেকে এরা ছিল জমির মালিক এবং কৃষক শোষণকারী, নিজেদের ছাড়া অন্য কারুর প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষমতা এদের ছিল না। তারা ছিল এক ছোট্ট গোষ্ঠী, যাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজের বিষয়-সম্পত্তি গুছিয়ে নেওয়া। অনিল শীল বলতে চান—এরা ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের যে হুঙ্কার দেয় নি তা নয়। তবে সে হুঙ্কার ছিল পুতুল খেলার মত। চাপ সৃষ্টি করে ইংরেজের কাছ থেকে বেশি সুবিধা আদায় করা ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। এই আন্দোলন ছিল ব্যাপক জনগণের সঙ্গে যোগাযোগশূন্য। তিনি আরও লিখেছেন—ভদ্রলোক শোষক, কাজেই শোষিতের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার তার ছিল না। 'এদের তুলনায় ব্রিটিশ সরকার অবশ্যই বলতে পারত—কৃষকদের স্বার্থ সম্পর্কে আমরা তোমাদের চেয়ে বেশি সজাগ।'(৪)

কাজেই দেখা যাচ্ছে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করাই 'ভদ্রলোক' তত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য।(৫)

উনবিংশ শতাব্দীর পত্রপত্রিকায় ভদ্রলোক বিষয়ে আলোচনা

'ভদ্রলোক' তত্ত্বটি আধুনিক কালের মার্কিন বা ব্রিটিশ গবেষকদের মোটেই আবিষ্কার নয়। এটি আবিষ্কার করেন ভারতের ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'ভদ্রলোক' কথাটির চেয়ে 'বাবু' কথাটি বেশি প্রচলিত ছিল। ইংরেজ সরকারী কর্মচারী, ইংরেজ সাংবাদিক বা ইংরেজ মিশনারীরা একই অর্থে এই দুটি শব্দ ব্যবহার করত। প্রথম থেকেই 'বাবু' সম্প্রদায়ের একটি অংশের উপর এদের খড়্গ উদ্যত ছিল। বাবুদের যে অংশটি ছিল স্বাধীনচেতা সেই অংশটিকে তারা পছন্দ করত না।

উদাহরণ হিসাবে বলা চলে—'ইয়ং বেঙ্গল' দলের কোন কোন কাজকে এরা ভাল চোখে দেখত না প্রথম থেকেই। 'হিন্দু পাইওনিয়র' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৩৮) দুটি প্রবন্ধের (প্রবন্ধ দুটির নাম যথাক্রমে India Under Foreigners এবং Freedom) কথা উল্লেখ করে জনৈক ইংরেজ সমালোচক মন্তব্য করেন—বাবুদের বেশি ইংরেজী শেখানো উচিত হবে কিনা—তা

ভেবে দেখার প্রয়োজন।(৬) 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' যখন গড়ে ওঠে, তখন ইংরেজ শাসকদের কেউ কেউ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। একজন মন্তব্য করলেন—'বেশি লেখাপড়া শেখালে বাবুদের মাথা বিগড়ে যাবে, তখন তাদের সামলানো শক্ত হবে।'(৭)

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরে ইংরেজ শাসক ও ভারতবাসীর মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। সরকারী উচ্চতর কর্মচারী, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সাংবাদিক এবং ইংরেজ মিশনারীরা এই সময়ে বিশেষভাবে ভারতীয়-বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। যেহেতু বাবু বা ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি নির্ভীক অংশ এই ভারত-বিদ্বেষী মনোভাবের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় তাই তারা ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির (ইংলিশম্যান, 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি) চক্ষুঃশূল হয়ে ওঠে। এই সময় থেকে বাবু বা ভদ্রলোক বিরোধী বিষোদ্গার বিশেষ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের রিপোর্টে (১৮৭৬-৭৭) 'ভদ্রলোক' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়।(৮) এই বিভাগের অন্তর্গত চারটি জেলা থেকে ম্যাজিস্ট্রেটরা জানিয়েছেন যে সমাজে সম্মানিত অথচ স্বল্পবিত্ত—যাদের 'ভদ্রলোক' বলা হয়—তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। গতর খাটিয়ে কাজ করতে এদের গর্বে বাধে, আবার অন্যের উপর নির্ভরশীল জীবনযাপন করতেও এরা ইচ্ছুক নয়: এদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, যদিও এদের জীবিকার সংস্থান হয়ে রয়েছে খুবই সীমাবদ্ধ।

তারপর থেকে বিভাগীয় কমিশনারদের রিপোর্টগুলিতে নিয়মিত 'ভদ্রলোক' শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কিত সরকারী রিপোর্টগুলিতে ভদ্রলোকদের সম্পর্কে যথেষ্ট কটূক্তি স্থান পেয়েছে। সিডিশন কমিটির রিপোর্টেও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে 'ভদ্রলোকদের আন্দোলন' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।(৯) ক্রমশ ভদ্রলোক শব্দটি ব্রিটিশ বড়কর্তাদের মুখে একটি বাঁধাবুলি হয়ে দাঁড়ায়।

সরকারী নথিপত্র থেকে দেখা যায় ভদ্রলোকদের আন্দোলনকে সরকারী বড়কর্তারা বড়ই অপছন্দ করতেন এবং এই আন্দোলন সম্পর্কে নানা কটূক্তি বর্ষণে তাঁরা অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা বলতে থাকেন—এই বাবু বা ভদ্র-লোকেরা জাতির কোন অংশেরই প্রতিনিধিত্ব করে না, তারা প্রতিনিধিত্ব করে শুধু তাদের সংকীর্ণ স্বার্থের; অপরদিকে ব্রিটিশ সরকার ভারতের গরীব

কৃষক, যাদের মধ্যে রয়েছে ধীর, সহিষ্ণু, নিঃশব্দ লক্ষ লক্ষ মানুষ—তাদের রক্ষাকর্তা(১০)—এক কথায়, ইংরেজরাই ভারতের অগণিত জনগণের 'মা-বাপ'।

তখনকার কালে এই 'বাবু' বা 'ভদ্রলোক' তত্ত্বটির মুখের মত জবাব দিতে এগিয়ে এসেছিল—রেভারেণ্ড লালবিহারী দের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বেঙ্গল ম্যাগাজিন'। ঐ পত্রিকায় 'বাবু'—এই শিরোনামায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।(১১) এই প্রবন্ধগুলি নিয়ে তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মহলে রীতিমত আলোড়ন শুরু হয়।

'বেঙ্গল ম্যাগাজিন' (এপ্রিল, ১৮৭৪) লেখে—সবচেয়ে নিন্দিত বস্তুর একটি হল 'বাবু'। কি চাঁচে'র পূজারীরা, কি সরকারী বড় অফিসাররা, বাবুকে নিন্দা করতে গিয়ে এত মশগুল হয়ে পড়ে যে তারা ভদ্রতার সীমারেখাও ছাড়িয়ে যায়। বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ অনেক, যেমন, সে কাপুরুষ, শীর্ণদেহ ও দুর্বল মস্তিক। তার শিক্ষা গভীর নয়। সে সৃজনশক্তি-বর্জিত। তাব বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ—সে স্বজাতি, স্বধর্মচ্যুত। সে উদ্ধত এবং সরকাবী বড়কর্তাদের সম্মান করতে জানে না। নিজের ভাষা না শিখে ইংবেজী ভাষা শেখার দিকে তার অহেতুক ঝোঁক। সে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে নাকি সব সময়েই অভিযোগ করছে, সরকারের সব সময়েই খুঁত কাটছে, সব সময়েই সে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাবার চেষ্টা করছে।

বেঙ্গল ম্যাগাজিনের লেখক বলছেন—হ্যাঁ, এর অনেকটাই সত্যি, আবার অনেকটাই মিথ্যা। দোষেগুণে বাবু যা হবার তাই। সে অর্ধ-নরও নয়, অর্ধ-বানরও নয়, সে যুগের প্রতিনিধি, সকল দুর্বলতা সকল সবলতা নিয়েই। বাবু কি স্বজাতিচ্যুত? এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে লেখক বলছেন—হ্যাঁ, সে এক অর্থে স্বজাতিচ্যুত। দেশবাসীর বিশাল অংশ যারা অজ্ঞান অন্ধকারে আজও রয়ে গেছে তাদের তুলনায় সে চিন্তার ক্ষেত্রে অবশ্যই উচ্চতর রাজ্যে বাস করে। সে অনেক বেশি জানে, তার চিন্তার পরিধি অনেক ব্যাপ্ত, তার বাক্যে প্রকাশ করার ক্ষমতা অনেক বেশি, বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতাও অনেক প্রবল। তার সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের ব্যবধান (যা ঐ লেখকের মতে দুরধিগম্য নয়) অবশ্যই রয়েছে। এই দিক থেকে বিচার করলে—সে 'স্বজাতিচ্যুত'। কিন্তু তার এই মনোভাব কি তার উচ্চ শিক্ষার পরিচয় নয়? উচ্চ শিক্ষা তার মনে জাগিয়েছে বিচার বুদ্ধি। শত্রুপক্ষের এত

গাত্রজ্বালা, এত আক্রমণের কারণ বাবু দেশের ভালোমন্দ সঠিকভাবে বিচার করতে শিখেছে, সরকারী কাজের প্রতিবাদ করতে শিখেছে দেশপ্রেমিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে।

নিন্দুকদের রাগের আরও কারণ তারা শাসক জাতি এবং শাসিত জাতির মধ্যেকার বেড়া ভাঙতে চাইছে। সাদা চামড়ার শ্রেষ্ঠত্ব তারা মানতে চায় না। সাদা চামড়া বলেই মাথা নোয়াতে হবে—এতে তার আপত্তি। লেখকের মতে, এটিকে জাতিবিদ্বেষ বলে চিত্রিত করা ভুল। তার প্রতি শাসকশ্রেণী প্রতি-নিয়ত যে অন্যায় করছে, প্রতিনিয়ত তার যে ক্ষতি করছে, এ হল তার বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদ।

অন্য একটি প্রবন্ধে (অক্টোবর, ১৮৭৪) লেখক বলেছেন—বাবুর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ—কেন সরকারী চাকুরী ছাড়া অন্য কিছুতে সে মন দেয় না, কেন সে বাণিজ্যিক বা শিল্পকর্মে উদ্যোগ দেখায় না? জবাবে লেখক বলেছেন—অভিযোগ করছে ঠিক তারাই যারা বাবুকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। অভিযোগ করছে তারাই যারা আমাদের দেশের উদ্বৃত্ত ধনরাশি, হাজার রকম সূত্র ধরে বিলাতে পাঠাচ্ছে এবং এইভাবে ভারতে মূলধন সঞ্চয়ের কাজকে অসম্ভব করে তুলছে, যারা অন্যায় প্রতি-যোগিতার মারফৎ দেশজ শিল্পের প্রতিটি শাখা ধ্বংস করে দিয়েছে এবং বিদেশী জিনিসের পণ্যক্ষেত্রে ভারতকে পর্যবসিত করেছে। লেখক মন্তব্য করেছেন—এ যেন একটি গৃহস্থের বাড়ীতে তুমি জোর করে ঢুকে পড়লে, গৃহকর্ত্রী'কে একটি চেয়ারে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলে, তার ছেলেমেয়ের জন্যে সে যে খাবার রান্না করে টেবিলের উপর সাজিয়ে রেখেছে সেগুলো গোগ্রাসে গিলে ফেললে, এবং তাকে এই বলে শাসালে—যদি তোমার মুখের চেহারা এতটুকু পাল্টায়, বা মুখ থেকে ক্রন্দন ধ্বনি বেরোয় তাহলে তোমাকে খুন করে ফেলব!

লেখক স্বীকার করেছেন—বাবু মোটেই বিপ্লবী চরিত্র নয়। বেস্থাম ও মিলের ইউটিলিটেরিয়ান মতবাদ তার জীবনদর্শনকে নিয়ন্ত্রণ করে। বাবু ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ চায় না, ইংরেজ শাসনের আওতায় ক্রমে ক্রমে সে স্বায়ত্তশাসনের দিকে অগ্রসর হতে চায়। বাবুর রাজনীতি নিয়মতন্ত্রের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ।

তবুও ইংরেজ শাসকেরা যখন বাবুর উপর এত ক্রুদ্ধ তখন লেখকের মতে, বাবু চরিত্রে নিশ্চয়ই একটি ইতিবাচক দিক আছে।

লেখক বলছেন—যতই রাগ করুক শাসকশ্রেণীর লোকেরা, বাবু যুগের প্রতিনিধিস্বরূপ। কাজেই যত দিন যাচ্ছে ততই বাবু আর বাঙলাদেশে সীমাবদ্ধ থাকছে না। ক্রমশ বাবু'সারা ভারতে এসে উপস্থিত হচ্ছে। কি হিন্দুস্থানী, কি পাঞ্জাবী, কি মারাঠী, কি মাদ্রাজী, কি পার্শী সমাজে বাবুবাদ ব্যাঙের ছাতার মত সর্বত্র গজিয়ে উঠছে।

লেখক আশা পোষণ করেন, যে ভবিষ্যতে কোন পক্ষপাতহীন ঐতিহাসিক যখন ঐ যুগের কাহিনী বিবৃত করবে, তখন বাবু চরিত্র ম্লান বলে প্রতিভাত হবে না, তার চরিত্রের ইতিবাচক দিক যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করবে।

ভদ্রলোকের সংজ্ঞা

বাঙলায় ইংরেজ শাসন প্রবর্তনের পর থেকেই ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সহরের অধিবাসীরা ক্রমেই সজাগ হতে থাকে। বড় জমিদার, বড় মুৎসুদ্দী এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একদল বুদ্ধিজীবী সম্পূর্ণ বৈষয়িক কারণে ইংরেজী জানার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। কিন্তু ইংরেজী শিখলেও তারা প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক জীবনদর্শন আঁকড়ে ধরে থাকল। অপরদিকে, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনুরক্ত হল আর এক ধরনের লোকেরা, যারা মোটামুটি স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ধরের লোক। এরা 'হিন্দু কলেজে' ছাত্র হিসাবে নাম লেখাল। কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে তারা জীবিকার জন্যে বিভিন্ন পেশা, যেমন সরকারী চাকরী, ইস্কুল মাষ্টারি, ওকালতি প্রভৃতির আশ্রয় নিল। তারা প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক জীবনদর্শনের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করল এবং পাশ্চাত্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জীবন দর্শনের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হল।

প্রথম থেকেই ইংরেজী শিক্ষিত এই দুই অংশের মধ্যে যেমন মিল ছিল, তেমনি পার্থক্যও ছিল। মিল এইখানে যে এরা দুই অংশই ইংরেজ শাসনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন, ইংরেজ শাসনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার পক্ষপাতী। এই ব্যাপক অর্থে, ইংরেজী শিক্ষিত বড় জমিদার, বড় মুৎসুদ্দী, হিন্দু কলেজের ছাত্র—এরা সবাই ছিল ইংরেজদের চোখে 'বাবু' বা 'ভদ্রলোক'।

তবে এই 'বাবু' বা 'ভদ্রলোক' সমাজের সকলেই সম-স্বার্থবিশিষ্ট ছিল না। 'কলিকাতা কমলালয়' নামক পুস্তকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—ভদ্রলোকদের সমস্বার্থ-বিশিষ্ট একটি গোষ্ঠী ভাবলে ভুল হবে। এদের মধ্যে ছিল নানা দল। এদের মধ্যেই ছিল ধনী বাবুরা—যারা দেওয়ান, মুৎসুদ্দী ও জমিদার হিসাবে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—বাবুদের মধ্যে ছিল দুই ভাগ—অভিজাত সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত। ভোলানাথ চন্দ্রও লিখলেন—ভদ্রলোকদের দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। একদল ধন-কৌলীন্যে অভিজাত এবং অন্যদল বুদ্ধি-কৌলীন্যে অভিজাত।—রমেশচন্দ্র দত্তও লিখেছেন—ভদ্রলোকদের মধ্যে দুই ভাগ—অভিজাত সম্প্রদায়. ও মধ্যবিত্ত।(১২)

ইংরেজ শাসন-কর্তাদের চোখেও শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যবিত্ত চরিত্রটি স্পষ্টই ধরা পড়েছে। একটি সরকারী রিপোর্টে বলা হয়েছে—ভদ্রলোক বলতে বোঝায় মানী লোক—ধনী লোক নয়।(১৩) আর একটি সরকারী রিপোর্টে ভদ্রলোকদের 'মানী মধ্যবিত্ত' বলে অভিহিত করা হয়েছে।(১৪)

কাজেই 'মধ্যবিত্ত' ভদ্রলোক সমাজের একটি অংশবিশেষ। মধ্যবিত্তের আবির্ভাব একটি তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা। 'বঙ্গদূত' লিখল—ইওরোপের ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রগতির অগ্রদূত। সেই মধ্যবিত্তশ্রেণীর আমাদের দেশেও আবির্ভাব ঘটছে দেখে 'বঙ্গদূত' আশান্বিত। 'সোমপ্রকাশ'ও বারবার মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্বটি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে। 'বঙ্গদর্শন' ও মধ্যবিত্তের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন পুরানো জাতিভেদ প্রথা ভাঙতে শুরু করেছে, অথচ বুর্জোয়া, পেটিবুর্জোয়া, শ্রমিক প্রভৃতি আধুনিক শ্রেণীর জন্ম হয় নি, তখন আবির্ভূত হয়েছিল এই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা। কাজেই এদের মধ্যে জাতির (caste) প্রভাব ছিল অথচ সেটি চূড়ান্ত নয়; আবার শ্রেণীর চিন্তা আসতে আরম্ভ করেছে, অথচ তা স্পষ্ট রূপ তখনও গ্রহণ করে নি।

সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে এরা সবাই ছিল উচ্চজাতির লোক, একথা ঠিক নয়। ভদ্রলোক সমাজে, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত অংশে, জাতির বন্ধন ততটা দৃঢ়মূল ছিল না। বুদ্ধি-কৌলীন্যের মাধ্যমে নীচ জাতির লোকেরা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মর্যাদা লাভ করতে পারত।

আর আর্থিক অবস্থার দিক থেকে এই মধ্যবিত্তেরা ছিল পেশাগত আয়ের উপর মূলত নির্ভরশীল, যদিও গ্রামের জমিদারী ও জোতদারী স্বত্ব থেকেও তাদের আয়ের এক অংশ আসত।

এই দিক থেকে বিচার করলে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা 'ফিউড্যাল' নয়, বরং তারা ছিল বুর্জোয়া সমাজের পুরোগামী—যাদের বলা যেতে পারে 'pre-bourgeoisie'।

অপরদিকে ছিল ভদ্রলোক সমাজের উপরতলার অংশ, অর্থাৎ বড় জমিদার, বড় জোতদার, বড় ব্যবসায়ী এবং এদের উপর নির্ভরশীল একদল বুদ্ধিজীবী। এরা ছিল যথার্থ 'ফিউড্যাল'। এদের মধ্যে জাতির শাসন প্রবল ছিল। এরাই ছিল সমাজের শোষক সম্প্রদায়। কৃষক শোষণ ছিল এদের স্বচ্ছলতার প্রধান উৎস।

ভদ্রলোক সমাজের এই দুই অংশের ইংরেজ শাসন সম্পর্কে দুটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। ভদ্রলোক সমাজের উপরতলার অংশ ইংরেজের বংশবদ। অপরদিকে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা ইংরেজ শাসনের সমালোচক। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গ্রাজুয়েটের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পেতে থাকল, তারা স্কুলে কলেজে শিক্ষক হতে লাগল, উকীল হতে লাগল, ডাক্তার হতে লাগল, ততই পেশাগত ভিত্তিতে গঠিত মধ্যবিত্ত অংশটি, কি সংখ্যায়, কি সংহতিতে প্রবল হতে থাকল। এরা ছিল উপযুক্ত চাকরী বা আয় থেকে বঞ্চিত। তাই ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তারা ক্রমেই হয়ে উঠতে লাগল বিক্ষুব্ধ। তাদের মধ্যে উত্তরোত্তর রাজনীতি-সচেতনতা দেখা দিতে আরম্ভ করল। সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, অস্ত্র আইন, প্রজাস্বত্ব আইন প্রভৃতি নিয়ে তারা ইংরেজ শাসনের খোলাখুলি সমালোচনা আরম্ভ করল। অপরদিকে, ভদ্রলোক সমাজের 'ফিউড্যাল' অংশ এই সব প্রশ্নে সরকারের কাজের সাফাই গাইতে আরম্ভ করল। 'প্রজাস্বত্ব আইন' (১৮৭৫-৮৫) নিয়ে তো রীতিমত ভদ্রলোকদের দুই অংশ দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' নেতৃত্বে সাধারণভাবে রায়তের পক্ষ অবলম্বন করল। অন্যদিকে, 'ফিউড্যাল'দের প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন জমিদারদের পক্ষ সমর্থন করল।

এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলিতে বা ইংরেজ বড় অফিসারদের রিপোর্টে যে ভদ্রলোকদের উপর বিদ্রূপ, কটাক্ষ, আক্রমণ কেন্দ্রীভূত তারা

ভদ্রলোকদের মধ্যবিত্ত অংশ। ভদ্রলোক সম্প্রদায়-ভুক্ত জমিদার ও ব্যবসায়ীরা ইংরেজের সহযোগী। কাজেই এই দ্বিতীয় অংশের বিরুদ্ধে তাদের কোন অভিযোগ নেই। ফিউড্যাল ভদ্রলোক ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক এই দুই অংশকে গুলিয়ে ফেললে ভুল হবে। অথচ উপরোক্ত মার্কিন ও ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা (ব্রুমফিল্ড, শীল প্রভৃতি) ঠিক তাই করেছেন। 'ফিউড্যাল' ও মধ্যবিত্তের মধ্যেকার পার্থক্যটি মুছে দিয়ে প্রথম অংশের দোষগুলি (যেমন কৃষকশোষণ) দ্বিতীয় অংশের ঘাড়ে চাপিয়ে ভদ্রলোক মাত্রকেই হেয় প্রতিপন্ন করার তাঁরা চেষ্টা করেছেন।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভূমিকা

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর তীক্ষ্ণ আক্রমণের বিষয়বস্তু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক এই কারণে যে এরাই ভারতে জাতীয় জাগরণের প্রথম উদ্গাতা। প্রথমে বাঙলায়, পরে অন্যান্য প্রদেশেও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী জাগরণের সূত্রপাত ঘটে। ইংলণ্ডের বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকায় দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, ইতালীর ঐক্য আন্দোলন, পোল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন, জার-বিরোধী নিহিলিস্ট আন্দোলন প্রভৃতির আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মোটামুটি বুর্জোয়া জাতীয়তা-বাদের ছাঁচে এদেশে শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরাই গণতান্ত্রিক জাগরণের উদ্বোধনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

এদের লেখায়, এদের চিন্তায় এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চিন্তার ছাপ অতি স্পষ্ট। এরাই প্রথম উপনিবেশবাদ, এমন কি ধনতন্ত্রবাদের চরিত্র সম্পর্কেও লোকের মনে প্রশ্ন উত্থাপন করে। এরাই প্রথমে আফগানিস্তানে, ব্রহ্মদেশে, চীনে, আরব দেশগুলিতে, এমন কি আফ্রিকায় তখনকার দিনে যে জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হয় যা (এবং ঔপনিবেশিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে পরিচালিত ছিল)—তার প্রতি সমর্থন জানাতে এগিয়ে আসে। এরা প্রথম আমাদের দেশে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে আন্তর্জাতিকতাবোধের উদ্বোধন করে।

ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক শোষণের দিকটি, ভারত থেকে কোটি কোটি টাকা লুট করে ইংলণ্ডে চালান দেবার বিষয়টি (economic drain) সম্পর্কে এরাই প্রথমে দেশবাসীকে সজাগ করে। অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার

প্রয়োজনীয়তার দিকটি দেশবাসীর সামনে এরাই প্রথমে তুলে ধরে। অর্থ-নৈতিক স্বয়ম্ভরতা সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত ভূরি ভূরি প্রবন্ধ, 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী, রমেশ চন্দ্র দত্ত রচিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদি, দাদাভাই নওরোজির বিখ্যাত বই, 'পভার্টি এ্যাণ্ড আন ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া', সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' প্রভৃতি একদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নগ্নচিত্রটি, অন্যদিকে অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার দিকটি দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরে।

এরাই প্রথম বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে কৃষকের স্বত্বের প্রশ্নটি উত্থাপন করে। জমির উপর কৃষকের স্বত্ব (peasant proprietorship) যেসব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সব দেশে (ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি) কৃষকের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে তার ছবি এদেশের সামনে তারাই প্রথম তুলে ধরে। আমাদের দেশে বারে বারে যে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহ ঘটে তার মূল কারণ যে জমির উপর কৃষকের স্বত্বহীনতা—এই দিকটিব প্রতি তারাই প্রথম দেশবাসীর ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সোমপ্রকাশ', 'সাধারণী'র পাতায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা এবং দুর্গত কৃষকের পক্ষ অবলম্বন কবে ভূরি ভূরি প্রবন্ধ কৃষক সমস্যা সম্পর্কে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সহানুভূতির স্পষ্ট পরিচয় বহন করে। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে—প্যারীচাঁদ মিত্রেব 'দি জমিন্দার এ্যাণ্ড দি রাইয়ট', রমেশচন্দ্র দত্তেব 'দি পেজান্‌ট্রি অব বেঙ্গল', সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গল রায়টস', অভয়চরণ দাসের 'ইণ্ডিয়ান রায়ট'—কৃষকের সমস্যা যে সবচেয়ে বড জাতীয় সমস্যা—এই দিকটির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

মূল কথা, এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা দুটি প্রধান বিরোধের দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রথমটি, ইংরেজদেব সঙ্গে ভারতবাসীর বিরোধ, যার সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নটি জড়িত ছিল। অপরটি, ইংরেজ শাসনের সঙ্গে দেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষক-সমাজের বিরোধ। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই বিরোধ দুটির মীমাংসার কথাও তারা ভেবেছিল।

বলাই বাহুল্য, এই আন্দোলনের দুর্বলতা ছিল প্রচুর। এটি ছিল ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—তাও ভ্রূণাবস্থায়। কাজেই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে সংগ্রাম ও আপোষ—যা ঔপনিবেশিক দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—তা যে ভ্রূণাবস্থায়

আরও বড় আকারে দেখা দেবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে। এরা নিজের দেশের পরাধীনতার কথা প্রতিনিয়ত ভেবেছে, পরাধীনতার জ্বালায় জ্বলে মরেছে, কিন্তু পরাধীনতা মোচনের কোন বৈপ্লবিক সমাধানের কথা তারা ভাবতে পারে নি; তারা তুলে ধরেছে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের দাবি। তারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল নিজের চোখে দেখেছে; কৃষকের স্থায্য স্বার্থের পক্ষে বারে বারে কলম ধরেছে; কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমূল উচ্ছেদের দাবি করতে অথবা কৃষক বিদ্রোহের সমর্থনে সরাসরি এগিয়ে আসতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ভয় পেয়েছে। এরা ইওরোপীয় জীবনদর্শনের বৈপ্লবিক চিন্তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বেন্থাম, মিল, স্পেন্সার প্রভৃতির সংস্কারপন্থী চিন্তাকেই নিজেদের কাজের দিক নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করেছে। ইংলণ্ডে টোরী এবং হুইগ—দুই দলের মধ্যে যে বিরোধ ছিল তাকে তারা বাড়িয়ে দেখেছে এবং হুইগদের সাহায্য নিয়ে দেশকে উন্নত করা যাবে—এই মোহ পোষণ করেছে।

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, এত দুর্বলতা সত্ত্বেও এই মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা আমাদের দেশে রাজনীতি-সচেতনতা সৃষ্টিতে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিষয়টি খুব ভালোভাবে বুঝেছিল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী। তারা এই আন্দোলনের মধ্যে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক চেতনার আভাষ দেখে বড় শঙ্কিত হয়েছিল। তাই অঙ্কুরেই এই আন্দোলনকে বিনষ্ট করার জন্যে তারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ আইন, অস্ত্র আইন প্রভৃতি প্রবর্তন করেছিল এবং 'সোমপ্রকাশ', 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রভৃতি তাদের নির্ভীকতার জন্যেই দমননীতির সম্মুখীন হয়েছিল। ইংরেজ শাসকেরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল—এমনিই ব্যাপক কৃষক-সমাজের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ বর্তমান, তার সঙ্গে বিক্ষুব্ধ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এই উন্নততর রাজনীতি-চেতনা যদি একসূত্রে গ্রথিত হয় তাহলে ১৮৫৭ সালের চেয়েও বড়, একটি জাতীয় বিদ্রোহ ভারতে ঘটে যেতে পারে।(১৫)

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রগতিশীলতা বিচারের মানদণ্ড

বাঙলার জাগরণের প্রগতিশীলতা বিচারে মূল কথা: নতুন চেতনার উন্মেষ। এই জাগরণের মধ্যে দিয়ে জাতি নতুন চেতনায় সঞ্জীবিত হয়েছিল

কিনা—এটাই আসল প্রশ্ন। ব্যাপারটি ইংরেজ শাসকদের চোখে ঠিকই ধরা পড়েছিল। শিক্ষিত মধ্যবিত্তের ভাব-ভাবনাকে কেন্দ্র করে এদেশে যে জাতীয় চেতনার আভাস দেখা দিতে লাগল তাকে তারা ভয়ের চোখে দেখতে লাগল। বস্তুত, এই জাতীয় চেতনার উন্মেষের প্রশ্নটি তখনকার দিনে তাদের উদ্বেগের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একথা ঠিক, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলা তথা ভারতে বড় বড় কৃষক বিদ্রোহ, এমন কি, ১৮৫৭ সালের মহা-বিদ্রোহের মত জাতীয় অভ্যুত্থান ঘটেছিল। নিঃসন্দেহে এগুলি ছিল ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী জনগণের অভ্যুত্থান, তবে স্বতঃস্ফূর্ত, পরস্পর বিচ্ছিন্ন এই অভ্যুত্থানগুলি যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁদের চেতনা ছিল নিম্নমানের, সামন্ততান্ত্রিক চেতনার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ধর্ম, গুরুবাদ প্রভৃতিকে আশ্রয় করে এই আন্দোলনগুলি রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেই অর্থে এইগুলি ছিল 'পুরানো ধরনের জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম।'(১৬)

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে এটি আমাদের দেশে আধুনিকতার উদ্বোধনে সাহায্য করেছিল, যদিও এই আধুনিকতা ছিল বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ। প্রত্যেক দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে যে দ্বৈততা (dualism) লক্ষ্য করা যায় (শৈশবে ত বটেই, এমন কি পরিণত অবস্থাতেও) তার প্রতিফলন এর মধ্যেও যথেষ্ট ছিল। তবে দেশের সামাজিক বিকাশের তদানীন্তন স্তরে এই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক জাগরণ ছিল নিঃসন্দেহে একটি অগ্রগামী পদক্ষেপ। ক্রমশ এই বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কৃষক ও শ্রমজীবীরাও যোগ দিতে থাকে (যেমন, স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতির কথা বলা চলে)। কৃষকদের এক অংশ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের চৌহদ্দীর মধ্যে তাদের কাজকে সীমাবদ্ধ রাখে (উদাহরণ হিসাবে বলা চলে, কংগ্রেস নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক আন্দোলনগুলির কথা), অপর অংশ এই চৌহদ্দী অতিক্রম করে অধিকতর বিপ্লবী পথ খুঁজতে থাকে। অর্থাৎ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সড়ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নয়, বরং সেই পথে অগ্রসর হতে গিয়ে কৃষক ও শ্রমজীবীরা অধিকতর শ্রেণী-সচেতন একটি বৈপ্লবিক জাতীয় বিকল্প গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছে। 'সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' ও 'সারা ভারত কৃষক সভা'র উৎপত্তির ইতিহাস এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মনে রাখতে হবে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। এর মধ্যে যে গণতান্ত্রিক মর্মবস্তু থাকে তাকে কেবল বুর্জোয়ারাই ব্যবহার করেননা, তা কৃষক ও শ্রমজীবীরাও ব্যবহার করতে পারে। শ্রমিক-কৃষকের সচেতন অংশ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যে আত্মবিলুপ্তি না ঘটিয়ে নিজস্ব শ্রেণী আন্দোলন, শ্রেণী সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।(১৭) বলা যায় যে, শ্রমিক ও কৃষক, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বুর্জোয়ার চেয়েও বেশি আগ্রহী। কেননা শ্রমিক-কৃষকের সচেতন অংশ জানে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরটি না ডিঙিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে পৌছানো যায় না। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের গণতান্ত্রিক মর্মবস্তুটি শ্রমিক ও কৃষক যথাসম্ভব সমৃদ্ধ করে তুলতে আগ্রহী। কেননা, এই কাজ যত অগ্রসর হবে ততই গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের কাজটি সহজতর হয়ে উঠবে।(১৮)

বস্তুত, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে উদ্ভূত রাজনৈতিক সচেতনতার প্রশ্নটি তদানীন্তন কালের ব্রিটিশ শাসকদের বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছিল। তারা ভয় পেয়েছিল—কৃষক-সমাজ এই আন্দোলনে যোগ দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তাই তারা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও অশিক্ষিত জনগণের মধ্যেকার পার্থক্যটি সযত্নে লালন করতে সচেষ্ট হল। এই উদ্দেশ্যে তারা একটি পাল্টা আদর্শগত অভিযান আরম্ভ করল। তারা প্রচার করতে থাকল—শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী নেতারা 'ভদ্রলোক' অর্থাৎ তারা উচ্চ জাতি ও শোষক শ্রেণীর লোক; তাদের জনগণের নেতৃত্ব দেবার ইচ্ছা বা অধিকার কোনোটাই নেই। পরন্তু ইংরেজরাই ভারতের অনুন্নত জাতি ও গরীব জনতার রক্ষক, তাদের মা-বাপ।

ইংরেজ যে জনগণের মা-বাপ ছিল না তা বড বড় যুক্তি দিয়ে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। ইংরেজ শাসনে জনগণ এত উৎপীড়িত হয়েছিল যে তাদের এর বিরুদ্ধে লডাই না করে উপায় ছিল না। এই কারণেই সারা উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস অসংখ্য স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস। আর কৃষকের 'মা-বাপেরা' পশুশক্তির জোরে এই বিদ্রোহীদের কচুকাটা করতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় নি।

ইংরেজ শাসকেরা চেয়েছিল কৃষক-সমাজ থাকবে নিষ্ক্রিয়, ইংরেজের কৃপাপ্রার্থী। আর ইংরেজ হবে—এই মূক বধির জনসাধারণের গার্জেন বা

মা-বাপ। কৃষকেরা ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংস্পর্শে আসুক, রাজনৈতিক চেতনায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠুক—এ তারা চায় নি, বরং এটিকে তারা বিশেষ ভয়ের চোখেই দেখেছে। এটাই হল 'মা-বাপ' তত্ত্বের গোড়ার কথা।

এই পুরানো সাম্রাজ্যবাদী 'তত্ত্বটিই সম্প্রতিকালে মার্কিন ও ব্রিটিশ গবেষকেরা নতুন করে পরিবেশন করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা প্রচার করতে অগ্রণী হয়েছিল—এতে মার্কিন গবেষক ব্রুমফিল্ড বড় রুষ্ট। তাঁর মতে 'জাতীয়তাবাদী চিন্তার মূল উপাদান—যেমন সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তা, সার্বভৌম রাষ্ট্রগঠন, স্বাধীনতা প্রভৃতি' এই শব্দগুলি ছিল জনগণের কাছে অর্থহীন।(১৯) অর্থাৎ কৃষকদের জাতীয়তাবাদী চেতনায় সঞ্জীবিত করাই ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অপরাধ!

কাজেই দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গায়ে পালিশ লাগিয়ে তাকে ভদ্রস্থ করে তোলাই মার্কিন, ব্রিটিশ গবেষকগণ কর্তৃক প্রচারিত 'ভদ্রলোক' তত্ত্বের লক্ষ্য।

আমাদের দেশের একদল গবেষক সম্প্রতিকালে ইওরোপ থেকে আমদানি এই গিল্টি করা 'ভদ্রলোক' তত্ত্বের চমকে মুগ্ধ হয়েছেন এবং তাঁরা অবিকল ঐ সমস্ত যুক্তি যেন মুখস্থ বলে যেতে আরম্ভ করেছেন।

একজন বিশিষ্ট গবেষক এঁদের মুখ থেকে ভদ্রলোক তত্ত্বটি যেন লুফে নিয়ে মন্তব্য করেছেন—হ্যাঁ, ঠিক তাই, 'ভদ্রলোক'—'ইংরেজের দালাল'। তাঁর মতে বাঙলার রেনেসাঁস বলে যা পরিচিত—তা এই দালালদের কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়। বাঙলার রেনেসাঁস একটি অতি-কথা (myth), একটি প্রবঞ্চনা মাত্র।(২০)

আর একদল বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা এখানে-ওখানে ডেভিড কফ, ব্রুমফিল্ড, অনিল শীলের সমালোচনা করেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁরাও যে ঐ মতেরই সমর্থক তা বুঝতে কষ্ট হয় না। এই গোষ্ঠীর একজন মন্তব্য করেছেন—উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার জাগরণের নায়কেরা ছিলেন 'দালাল বুদ্ধিজীবী'

এবং বাঙলার রেনেসাঁস বলে যা পরিচিত তাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল-বৃত্তি বলাই সঙ্গত।(২১)

ক্রমফিল্ড ও শীলের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোন কোন গবেষক আরও বলতে চান ভদ্রলোকেরা যেহেতু শোষক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাই শোষিত কৃষকের প্রতিনিধিত্ব করার ইচ্ছা বা অধিকার কোনটাই তাদের ছিল না। বরং এদের তুলনায় ইংরেজ শাসকদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল সত্যিই কৃষক-দরদী।(২২)

গভীর পরিতাপের বিষয়, কেন্দ্রীয় সরকারের আশীর্বাদ-পুষ্ট এবং রীতিমত গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠান 'নেহরু মেমোরিয়াল মিউজিয়াম এ্যাণ্ড লাইব্রেরী' রামমোহন সার্ধ-শতবর্ষ পালন উপলক্ষ্যে একখানি বই প্রকাশ করেছেন যার মধ্যে এই মতেরই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। ঐ বইয়ের ভূমিকায় সম্পাদক মহাশয় লিখেছেন—রামমোহন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যে মত পোষণ করতেন তা বীরপূজার মধ্যে পড়ে, সে মত আজ অচল এবং সেই মত খণ্ডন করাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য।(২৩)

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন! ভারত সরকারের আশীর্বাদ-পুষ্ট নেহরু মিউজিয়াম এই ধরনের 'গবেষণার' পৃষ্ঠপোষকতা করে একে জাতে ওঠার সুযোগ করে দিয়েছেন।

লক্ষ্যণীয় বাঙলার জাগরণের বিরুদ্ধে যেন একটি অলিখিত যুক্তফ্রণ্ট গড়ে উঠেছে। এই ব্যাপারে প্রথমে নয়া-উপনিবেশবাদী ঐতিহাসিকেরা (কফ-ক্রমফিল্ড-শীল প্রভৃতি) একটি নতুন 'থিসিস' উপস্থিত করলেন। আর কাল-বিলম্ব না করে এক শ্রেণীর দেশীয় গবেষক এঁদের মন্ত্র-শিষ্য হয়ে উঠলেন। এঁরা যতই 'স্বাধীন চিন্তা' বা 'মৌলিকত্বের' বড়াই করুন, এঁদের গুরু যে পশ্চিমের ঐ তত্ত্ববাগীশেরা এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। সবচেয়ে মজার কথা, 'মার্কসবাদের' নামে শপথ গ্রহণ করে একদল 'বামপন্থী' গবেষকও এঁদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। ট্রটস্কীপন্থী, নয়া-ট্রটস্কীপন্থী, মাওপন্থী, 'নয়া বাম' (New Left) পন্থায় বিশ্বাসী প্রভৃতি নানা রঙের 'মার্কসবাদী'রা নানা অতি-বিপ্লবী যুক্তির অবতারণা করে শেষ পর্যন্ত বাঙলার জাগরণের ভূমিকাটি নস্যাৎ করার চেষ্টা করছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত কোন কোন পুস্তকে এই ধরনের অতি-বিপ্লবী দৃষ্টি থেকে নয়া-উপনিবেশবাদী ব্যাখ্যাকে সমর্থনের নজির মিলবে।(২৪)

সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে—এঁরা প্রকৃতই মার্কসবাদী কিনা? এঁদের একজন ত বলেই বসেছেন—সরষের মধ্যেই ভূত! ভারত সম্পর্কে মার্কসের রচনাগুলির মধ্যেই বাঙলার জাগরণ সম্পর্কে যান্ত্রিক মার্কসবাদী ব্যাখ্যার বীজ রয়েছে।(২৫) আর একজন গবেষক ঘোষণা করেছেন—বাঙলার জাগরণের ইতিবাচক দিক নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাচ্ছেন তাঁরা সেই ব্যক্তিরাই যাঁরা—সোভিয়েত মার্কা গোঁড়া মার্কসবাদের আঁচল ধরে চলতে এখনও অভ্যস্ত।(২৬)

প্রশ্ন উঠতে পারে দেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে এঁরা যে কালাপাহাড়ী মনোভাব গ্রহণ করেন তা কি মার্কসবাদ সম্মত? প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয়—এঁরা যেসব কথা বলেন তার সঙ্গে মার্কসবাদের কি কোন সম্পর্ক আছে?(২৭)

মার্কসবাদীরা বাঙলার জাগরণ সম্পর্কে এক অতিরঞ্জিত চিত্র তুলে ধরতে চান না, তবে তাকে নস্যাৎ করার অবশ্যই তাঁরা পক্ষপাতী নন। তাঁরা শ্রেণীদৃষ্টিভঙ্গীতে অবিচল থেকে বাঙলার জাগরণের মূল্য বিচার করেন। মার্কস নিজেই ভারতের মাটিতে ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আবির্ভাবকে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে চিহ্নিত করেছেন।(২৮) একথাও অবিদিত নয় যে লেনিন এশিয়ার দেশগুলিতে বুর্জোয়া জাগরণে বুদ্ধিজীবীরা যে ভূমিকা গ্রহণ করেন তার গুরুত্বের প্রতি বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।(২৯) এটি আকস্মিক ঘটনা নয় যে মার্কসবাদী সমাজ-বিজ্ঞানীরা বাঙলাব জাগরণের ইতিবাচক দিকটি গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে থাকেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়া'র স্তম্ভে বাঙলার জাগরণ যথাযোগ্য সম্মান লাভ করেছে। ভারতীয় মার্কসবাদীরা মার্কসীয়-লেনিনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেই বাঙলার জাগরণের ইতিবাচক দিকটি যথাযোগ্য মূল্য দিয়ে বিচার করে থাকেন।(৩০) বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদ, বিশেষ করে পরাধীন জাতির বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদ, শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা থেকে, স্ববিরোধ থেকে মুক্ত হবে—এই ধরনের মোহ কোন মার্কসবাদী পোষণ করেন না। প্রশ্ন সেটি নয়। প্রশ্ন হল—সমাজবিকাশের তদানীন্তন স্তরে এই জাগরণ দেশকে অগ্রগতির পথ দেখাতে পেরেছিল কিনা, বিশ্ব বিকাশের মূল স্রোতের সঙ্গে ভারতের যোগ-সাধন ঘটাতে পেরেছিল কিনা, যুগধর্ম ও আধুনিকতার কালস্রোতে দেশকে অবগাহন করতে সাহায্য করেছিল কিনা। যত সীমাবদ্ধই হোক এই কাজে বাঙলার জাগরণ যে সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তার মধ্যে নিহিত রয়েছে এই জাগরণের সার্থকতা, এই জাগরণের ঐতিহাসিক মূল্য।

আগের মত এবং পরের মত পাশাপাশি অবস্থান করছে। যাই হোক, পরবর্তীকালে তিনি ক্রমফিল্ড, শীল প্রভৃতির মতের প্রতিধ্বনি করে লিখেছেন—"The upper-caste Hindus who became bhadralok or 'babus', by their caste and status, and English education, were completely enslaved and logically made inferior through and through." (Benoy Ghosh—'The Bengali Bhadralok, Frontier,

বাঙলার জাগরণ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—"What we call 'Bengal Renaissance'....turned out to be nothing but a historical hoax..."

শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দারও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তিনি লিখেছেন—"A renaissance which assured the people neither a recognition nor a place in the manifestation of its will was from its very inception, from both qualitative and quantitative considerations, a distorted sapless renaissance England having been its wet nurse. it was, as it were. an English renaissance in quite a different garb enacted on India's soil" (Arabinda Poddar—Renaissance in Bengal, Quests and Confrontations,

২১ কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এঁদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক বরুণ দে, অধ্যাপক অশোক সেন, অধ্যাপক সুমিত সরকার প্রভৃতি।

অধ্যাপক বরুণ দের মতে—বাঙলার জাগরণের যারা নায়ক তাদের 'Comprador intelligentsia" নামে অভিহিত করাই সঙ্গত। এদের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন—"Middle class subalternship within a colonial system and territory." বাঙলার জাগরণ সম্পর্কে তাঁর অভিমত—"A Renaisance created by collaboration with British imperialism." (Barun De—A Critique of the Historiography of The Trend entitled Renaissance in the 1?th Century, Barun De—Some Stray Thoughts on the Colonial Context of Modernisation in 19th Century Bengal)

অধ্যাপক অশোক সেন লিখেছেন—"The new Bengali middle class came to be a participant in the building up of the stucture of colonial political economy"—Asok Sen—The Bengal Economy and Rammohun Roy, V. C Joshi (Ed) Rammohun Roy and the Process of Modernisation in India.

অধ্যাপক সুমিত সরকারের মত সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে (পড়ুন, এই বইয়ের "বাঙলার জাগরণ—মার্কসীয় বিচার" নামক প্রবন্ধ, টীকা ১০৯)। অধ্যাপক সুমিত সরকারের মত সম্পর্কে অধ্যাপক রজত রায় মন্তব্য করেছেন, বাঙলার জাগরণের চরিত্র চিত্রণে ক্রমবিকাশ ও সুমিত সরকারের মতে আশ্চর্য রকমের মিল দেখা যায়। (Rajat Roy —Political Change in British India, Indian Economic and Social

২২ K. K. Sengupta—Pabna Disturbances and the Politics of Rent, pp 124-25, 148-50, এই মতের বিস্তৃত সমালোচনার জন্যে পড়ুন—N. Kaviraj—Bengal Renaissance and the Peasant Question, P. N. L., Vol III,

২৩ ঐ পুস্তকের ভূমিকায় রজত রায় লিখেছেন—The current assesments—critical as well as adulatory of—Raja Rammohun Roy's role in the modernisation of India, both of which derive their roots from the 'Renaissance' consciousness of pre-independence Bengali intellectuals, have...been quite fundamentally challenged in this volume" —V. C. Joshi (Ed)—Rammohun Roy and the Process of Modernisation in India. Issued under the auspices of Nehru Memorial Museum and Library, 1975, ঐ বইয়ের বিস্তৃত সমালোচনার জন্যে

২৪ Robin Blackburn (Ed)—Explosion in a Sub-continent, Penguin Books, in association with New Left Review, 1975.

২৫ বিনয় ঘোষ—ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর ইতিহাস ব্যাখ্যা, মধ্যাহ্ন, বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সংকট

২৬ ঐ গবেষকের বিশেষ চক্ষুশূল হয়ে উঠেছেন রজনীপাম দত্ত, সোভিয়েত সমাজ-বিজ্ঞানীরা এবং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা। আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রতি অনুগত, ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবীদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করে তিনি বলেছেন—এ'রা মান্ধাতার আমলের গোঁড়া মার্কসবাদ এখনও আঁকড়ে ধরে আছেন। তাঁর মতে চীন মার্কসবাদের 'চৈনিকীকরণ' করে সৃষ্টিশীল মার্কসবাদের পথ খুলে দিয়েছে, কিন্তু ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবীরা মার্কসবাদের 'ভারতীয়করণ' করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং মতান্ধতার কর্দমে আজও গড়াগড়ি খাচ্ছেন। —Barun De—A Critique of the Historiography of the Trend Entitled Renaissance' in 19th Century India—a paper presented to the Indo-Soviet Symposium on Economic and Social Develop-

ment of India and Russia from the 17th to the 19th century, Moscow, 14th-16th May, 1973.

২৭ বাঙলার জাগরণ নিঃসন্দেহে ছিল বুর্জোয়া জাতীয় জাগরণের চরিত্র-বিশিষ্ট। এই জাগরণের মধ্যে জনগণের জাগরণের চিহ্ন খুঁজে বেড়ানো, এর মধ্যে বৃহত্তর কৃষক সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তির সন্ধান করা, অনৈতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয়। এর সঙ্গে কি মার্কসীয় শ্রেণীবিচার, কি মার্কসীয় দৃষ্টি থেকে বিপ্লবের স্তর বিচার, এর কোন সম্পর্ক নেই। একে মার্কসীয় বিচারের প্রহসন ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

২৮ Karl Marx—The Future Results of British Rule in India.

২৯ 'এশিয়ার জাগরণ' সংক্রান্ত লেনিনের প্রবন্ধাবলী দ্রষ্টব্য।

৩০ এই প্রসঙ্গে প্রথমেই রজনীপাম দত্তের কথা মনে পড়ে। (India Today, Ch. X)। সোভিয়েত সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে বালাভুশেভিচ, ডায়াকভ, ভেরা নভিকভা, ই এন কোমারভ প্রভৃতির নাম করা চলে। সোভিয়েত এনসাইক্লোপিডিয়াতে বিষয়টি যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা হয়েছে (Soviet Encyclopaedia, Vol 3, pp. 166-68) ভারতীয় মার্কসবাদীদের মধ্যে এই কাজে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী সুশোভন সরকার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, গোপাল হালদার, হীরেন মুখার্জী প্রভৃতি।

তৃতীয় ভাগ

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

বাঙলার জাগরণের উপর যাঁরা কালিমা লেপন করতে চান তাঁরা বলেন—যে আন্দোলন দেশের স্বাধীনতার প্রশ্নটি উত্থাপন করে নি, যে আন্দোলন হিন্দু সমাজভুক্ত উচ্চ জাতির আন্দোলন হবার ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করে নি, যে আন্দোলন কৃষকের সমস্যা নিয়ে কখনও চিন্তা করে নি, তাকে জাগরণ বলে চিহ্নিত করা নিতান্ত অবিবেচনার কাজ। এই ধরনের উক্তি কত অসার ও কত অজ্ঞানতাপ্রসূত, এই অংশে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধগুলিতে তার প্রমাণ মিলবে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মূল প্রবন্ধটি পুরোপুরি তুলে ধরা হয়েছে। স্থানাভাবে ও অন্যান্য কারণে (মূল পত্রিকা পোকায় কাটা বা ছেঁড়া থাকায়) হুবহু সমস্ত প্রবন্ধটি কোন কোন ক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রিত করা সম্ভব হয় নি। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক অংশটি তুলে ধরা হয়েছে। তবে কোন ক্ষেত্রেই মূল প্রবন্ধের অঙ্গহানি হয় নি।

দেশের স্বাধীনতার প্রশ্ন

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার(১)

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের যে প্রকার দুঃখ হয় তাহার বিচার।

ব্যষ্টিরূপে ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহার বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষনে সমষ্টিরূপে অনিষ্টাচরণ করিলে যাদৃশ অশুভ ঘটনা হয় তাহারই প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। কোন দেশীয় জনসাধারণে সমবেত হইয়া দেশান্তরীয় লোকের উপর অত্যাচার করিলে তাহার যে প্রকার প্রতিফল প্রাপ্ত হয়। তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা এই প্রকরণের উদ্দেশ্য।

যে সকল মনোবৃত্তি মনুষ্য ও ইতর জন্তু উভয়েতেই আছে, কেবল স্বার্থ-সাধনই যে তাহার প্রয়োজন, তাহা প্রকৃষ্টরূপে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে।* যেরূপ বিভিন্ন জাতীয় ইতর জন্তু সকল সেই সমুদায় স্বার্থসাধিকা বৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া পরস্পর প্রহার ও সংহার করে, সেইরূপ বিভিন্ন জাতীয় মনুষ্যেরাও ঐ সকল প্রবল প্রবৃত্তির বশবর্ত্তি হইয়া চলিলে পরস্পর পশুবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। বরঞ্চ তদ্বিষয়ে আপনাদের অতি প্রখরা বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন করাতে হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও অধিক অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। এ কাল পর্য্যন্ত কোন দেশীয় লোকে দেশান্তরীয় লোকের প্রতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। আবহমান কাল বল-বীর্য্য-বিশিষ্ট দুৰ্দ্ধর্ষ লোকে বীর্য্যহীন ক্ষীণ লোকের উপর আক্রমণ ও অত্যাচার এবং তাহারদিগকে পরাভূত ও নষ্ট করিয়া আসিতেছে। কোন কোন জাতি প্রবল পরাক্রান্ত দুৰ্দ্দান্ত নিষ্ঠুর মনুষ্যদিগের অত্যাচারে একেবারে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সমুদায় অশুভ ঘটনা হইতেই কিছু কিছু সদুপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদনুসারে ঐ দুর্নীত দুঃশীল লোকদিগের দুর্ব্ব্যবহার দৃষ্টে এই নীতি শিক্ষা করা উচিত, যে কোন জাতীয় লোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এবং শারীরিক বল ও বীর্য্যের নিতান্ত হ্রাস করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। হিংস্রস্বভাব পশু ও মনুষ্যদিগের অত্যাচার নিরাকরণার্থে ঐ সমুদায় অত্যন্ত

* ৭০ সংখ্যক তত্ত্ববোধনী পত্রিকায়।

আবশ্যক। উহারদিগের আতিশয্য নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু উচ্ছেদ চেষ্টা কখনই উচিত নহে।

পরম কারুনিক পরমেশ্বর যে মনুষ্যদিগকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি রূপ রমনীয় ভূষণে ভূষিত করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব পদ প্রদান করিয়াছেন ইহা তাহারদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু তিনি জনসাধারণের স্বজাতীয় সুখ স্বচ্ছন্দ সমুন্নতি বিষয়ে ঐ সকল প্রধান প্রবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন কিনা? আর যাহারদের প্রভূত বলবীর্য্য, প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি ও দুর্দ্দান্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি থাকে, তাহারা দুর্ব্বলদিগেব উপর আক্রমণ ও অত্যাচার করিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ অধর্ম্মাচবণ সুখ সৌভাগ্য সঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট উপায় কিনা? এ দুই প্রস্তাব বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা উভয়ই ধনাগমের উৎকৃষ্ট উপায়। মাতৃবৎ প্রতিপালিকা পৃথিবী অপর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য দানে প্রস্তুত আছেন; আমরা শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা সহকারে হস্ত বিস্তার করিলেই যথেষ্ট অর্থ লাভ করিতে পারি। দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ এবং দস্যুতুল্য বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা কিছুকাল দুর্ব্বলের ধন হরণ পূর্ব্বক ভোগ করিতে পাবে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্বারা অর্থের আকর ক্রমে ক্রমে শূণ্য হইয়া আইসে, অন্যের অত্যাচারে সঞ্চিত ধন ক্রমাগত নষ্ট হইতে থাকিলে লোকে ধন সঞ্চয় করণে তাদৃশ যত্নবান না হইয়া ধনাপহারি অত্যাচারিদিগকে প্রতিফলন প্রদানার্থে সর্ব্বতোভাবে সচেষ্টিত হয়।

যদি পরমেশ্বর আমারদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া এই ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বাহ্যবস্তু সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং বিশ্ব রাজ্য পরিপালনার্থে ঐ সকল শুভবৃত্তির প্রাধান্যানুযায়ি নিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তবে কোন দেশীয় লোকে দেশান্তরীয় লোকের সর্ব্বনাশ সঙ্কল্প পূর্ব্বক তাহারদের উপর অত্যাচার ও বল প্রকাশ করিয়া অর্থ ও প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করিলে কখনই স্থায়িতর সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতে পারিবেন না। যদি কোন জাতীয় রাজা বা রাজপুরুষেরা লোভাসক্ত হইয়া অন্যদেশ আক্রমণপূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তাঁহার দিগকে যুদ্ধ নির্ব্বাহার্থে সঞ্চিতধন ব্যয় করিতে হয়, এবং অধিকতর অর্থ আহরণার্থে নানাপ্রকার দুষ্কর ও অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া তৎপ্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। যদি তাঁহারদের শত্রুপক্ষ প্রবল ও জয়ি হয়, তবে তাঁহারদিগেব যুদ্ধে যত ক্লেশ

ও যত ব্যয় হইয়াছিল, সমুদায়ই নিরর্থক যায়, এবং পশ্চাৎ ও তদ্দ্বারা বহুতর দুঃখ উৎপন্ন হয়। যদি তাঁহারা জয়ি হইয়া পরাজিত জাতিকে নিপীড়ন করেন, তবে তাঁহারা পশ্চাৎ দেখিবেন, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়াতে পরিণামে সুখ, স্বচ্ছন্দ ও শান্তিরসেও জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে। বিশেষতঃ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগের যেরূপ অসম্ভাবিত প্রবলতা হইলে পরদেশ আক্রমণ ও তত্রত্য লোকের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্তি হয়, তদ্দ্বারা স্বদেশের রাজনীতি ও রাজপুরুষদিগের ব্যবহার উভয়ই অধর্ম্মদোষে দূষিত হইয়া দুঃখরূপ বিষম বিষ উৎপাদন করে।

সর্ব্বদেশীয় পুরাবৃত্তেই এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় কারণ একাল পর্যন্ত সকল জাতীয় লোকেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ি কার্য করিয়া আসিতেছেন। অতএব এ বিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

১—রোমীয় লোকদিগের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্তস্থল। তাহারা পরিশ্রমে অবহেলা করিয়া পরদেশ আক্রমণ ও পরদ্রব্য লুণ্ঠন এই উভয়ই জীবিকা স্বরূপ জ্ঞান করিত। এ নিমিত্ত, কোন কালেই তাহারা ধর্ম্মশীল, পরিশ্রম পরায়ণ সুখ বিশিষ্টরূপে দৃষ্ট হয় নাই। তত্রস্থ সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা প্রায়ই ভোগাসক্ত ও দুষ্কর্ম্মান্বিত ছিলেন। তাঁহারা যেমন দুঃশীলতা প্রকাশ-পূর্ব্বক লোকের উপর অশেষ প্রকার উপদ্রব করিতেন সেইরূপ কখন কখন দুর্দ্দান্ত ইতর লোকদিগের, কখনও বা অত্যাচারি দুরন্ত রাজাদিগের হস্তে পতিত হইয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিতেন। রোমীয়দিগের সাম্রাজ্যকালে সামান্যলোকে মূর্খ, কলহ প্রিয়, আলস্য-পরবশ ও দরিদ্র ছিল; তাহারা অন্যের ধন হরণ করিয়া উদর-পূর্ণ করিত এবং স্বার্থানুরোধে আপন দেশ ও আপনার-দিগকেও বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইত। তবে যে কখন কখন রোমীয়দিগের দেশে ধর্ম্ম ও শান্তিসুখের সঞ্চার হইত তাহার কারণ তৎকালে ধর্ম্মশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা রোমরাজ্য রূপ বৃহৎ তরণীর কর্ণধার হইতেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাত্মা স্বদেশ-হিতৈষা, ন্যায়পরতা ও অসামান্য বুদ্ধি-শক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক স্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, কারণ তাঁহারা ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন। কিন্তু সামান্যতঃ রোমীয় লোকেরা ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলিত তাহার সন্দেহ নাই।

তাহারা ধর্ম্মানুযায়ি ব্যবহার ও ন্যায়যুক্ত পরিশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবন-

যাত্রা নির্ব্বাহার্থে কেবল পরদ্রব্যাপহরণের উপর নির্ভর করিয়া থাকাতে দুর্ব্বল, নিবীর্য্য; নিরুৎসাহ, অবশ-চিত্ত এবং সমবেত চেষ্টা ও শৌর্য্য প্রকাশে অসমর্থ হইয়া আসিল, এবং তাহারদের নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অশেষ অত্যাচার অসহমান হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি সমস্ত জাতীয় লোকে তাঁহারদিগের অত্যন্ত দ্বেষি ও বিষম শত্রু হইয়া উঠিল। অবশেষ, যখন তাহারদের পাপের ভরা পূর্ণ হইল, তখন অভ্রষ্ট ও অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মশীল অসভ্য লোক সকল সংহার মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাহারদের উপর আক্রমণ করিলেক, তাহারদের সাম্রাজ্য বিনাশ করিলেক, এবং তাহারদের অসাধারণ কীর্ত্তি লুপ্ত করিলেক।

২—আমারদিগের দেশাধিপতি ইংলণ্ডীয় লোক পরপীড়া প্রদান বিষয়েব যেমন দৃষ্টান্তস্থল এমন আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহারা বহুকালাবধি কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ের বশীভূত হইয়া কার্য করিয়া আসিতেছেন। দুর্জ্জয় অর্জ্জন-স্পৃহা, অতি প্রবল আত্মাদর এবং ভয়ঙ্কর জিঘাংসাবৃত্তি তাঁহারদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিদিগকে পরাভূত ও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারা এই সমুদয় বিষম প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া তদনুযায়ি বিধান ও ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তদনুসারেই তাঁহারা পরদেশ অধিকার করেন, তত্রস্থ লোকের সহিত কু-ব্যবহার করেন, বাণিজ্য-বিষয়ক স্বতন্ত্রতার ব্যাঘাত করেন, শিল্প ও ব্যবসায় বিষয়ে অত্যন্ত লোভোদ্ভূত মহানিষ্টকর নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন এবং অন্যান্য ভূরি ভূরি ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিত করেন। যদি জগদীশ্বর এই বিশ্বরাজ্যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাধান্য রাখিয়া বাহ্যবস্তু সমুদায়ের তদনুযায়ি শৃঙ্খলা সম্পন্ন করিতেন তবে এতদিনে, ইংলণ্ড দেশ স্বর্গোপম সুখধাম হইত। কিন্তু পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, তাঁহারদের কর্ম্মবৃক্ষে তদ্বিপরীত ফল ফলিত হইয়াছে এবং পরেও হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রথমতঃ আমেরিকাবাসিদিগের সহিত ইংলণ্ডবাসিদিগের দুর্ব্ব্যবহার এ বিষয়ের এক প্রধান উদাহরণ। সহস্র সহস্র ব্রিটেনীয় লোক ধর্ম্মবিষয়ক অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার উত্তরখণ্ডে গিয়া বসতি করে। এক শতাব্দীর ন্যূনকালেই তাহারদের সংখ্যা ও সামর্থ্যের এরূপ বৃদ্ধি হইল, যে তৎকালে তাহারদের দেশ একটি রাজ্য রূপে পরিগণিত হইতে পারিত এবং যদি ইংলণ্ডীয় রাজা ও রাজপুরুষেরা তাহারদের সহিত *সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন, তবে তদ্দ্বারা ইংলণ্ডের ধন, ঐশ্বর্য্য ও সুখ-সৌভাগ্য সমুন্নতি বিষয়ে বিস্তর আনুকূল্য হইত। কিন্তু ইংলণ্ডীয় লোকের যে প্রকার

প্রবল লোভ, তাহাতে ভিন্ন দেশীয় মনুষ্যদিগের সহিত তাঁহারদের সম্প্রীতি থাকিবার সম্ভাবনা কি ?

ইংরাজেরা তথায় একচেটিয়া বাণিজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং বৎসর বৎসর অশেষ প্রকার উপলক্ষ্য করিয়া রাশি রাশি অর্থ সংগ্রহ করিতেন। বস্তুতঃ তৎকালে আমেরিকা তাহারদিগের শস্যাগার স্বরূপ হইয়াছিল অতএব তাহাকে প্রযত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল ; কিন্তু তাঁহারা অবিলম্বে সম্প্রীতি সেতু ভঞ্জন করিয়া বিবাদ স্রোত প্রবল করিলেন। তাঁহারা যে ষ্টাম্প দ্বারা এদেশের সর্ব্বনাশ করিতেছেন, তথায় প্রথমতঃ সেই ষ্টাম্প ও তদীয় কর সংস্থাপনে সচেষ্ট হইলেন এবং তদনন্তর চা, চর্ম্ম, কাগজ প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের উপর কর স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আমেরিকা-বাসিরা দুই বিষয়েই আপত্তি উত্থাপন পূর্ব্বক স্বদেশে ইংলণ্ডীয় বণিকদিগের পণ্য আনয়ন নিবারণার্থে উদযোগি হওয়াতে, ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষেরা শঙ্কিত হইয়া দুইবারই কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তে নিরস্ত হইলেন ; ইহাতে আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটনার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত দুষ্প্রবৃত্তি কখনও নিরস্ত থাকিবার নহে। তাঁহারদের লোভ ও জিঘাংসানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, অতএব তাঁহারা তদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া স্বীয় অনুমতি অখণ্ডনীয় ও হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্তে আমেরিকার বিচারালয় সমুদায় আপনার দিগের অধীন করিলেন এবং এক্ষণে হিন্দুদিগকে যে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তখন আমেরিকাবাসী স্বজাতীয় ব্যক্তিদিগকেও প্রায় তদনুরূপ দাসবৎ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। আমেরিকাবাসিরা এই সমুদায় দুঃসহ দুর্ব্ব্যবহার অসহমান হইয়া অস্ত্রচালনা দ্বারা এ বিবাদের নিষ্পত্তি করণার্থ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইল এবং উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম আরব্ধ হইয়া আমেরিকার স্বাধীনত্ব লাভ এবং ইংলণ্ডের অপমান ও শাস্তি প্রাপ্তির সূত্রপাত হইল। এ যুদ্ধের কেবল সূত্রপাতে ইংলণ্ডীয় লোকের দুর্জ্জয় দুষ্প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রকাশ পাইতেছে এমত নহে, তাঁহারা রণকালে যে প্রকার পাপাচরণ করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তদ্বিষয়ের দুই এক প্রমাণ প্রদান করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবেক। তাঁহারা ঐ যুদ্ধ নির্ব্বাহ বিষয়ে কোন সুপ্রসিদ্ধ সজ্জাতীয় লোকের নিকট পরামর্শ গ্রহণ বা সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। তাঁহারা জর্ম্মেনির অন্তপাতি কোন কোন স্থানের মারণ ব্যবসায়ি দস্যুদিগকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিলেন, আপনারদের

অসৎ বাসনা সম্পাদনরূপ বিষমব্রতে তাহারদিগকে ব্রতি করিলেন এবং তন্মধ্যে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিবে, তাহারদের প্রত্যেকে ২৫০ টাকা করিয়া তদীয় বিক্রেতাদিগকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। সুসভ্য ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা ভ্রাতৃস্বরূপ স্বজাতীয় লোকের উৎসেদ সাধন কর্ম্মে দুরাচার দস্যুদল সকল নিযুক্ত করিলেন।

আমেরিকাবাসিদিগকে উচ্ছিন্ন করিবার প্রথম উপায় এই; দ্বিতীয় উপায় ইহার অপেক্ষায় দশগুণ ভয়ঙ্কর। ইংরাজেরা ইণ্ডীয় নামক অতি দুর্নীত অসভ্য ইতর লোকদিগকেও ঐ মহাপাপজনক বিষম ব্যাপারে প্রবৃত্ত করিলেন এবং তাহারদিগকে এই প্রকাশ আশ্বাস দিলেন, যে আমেরিকাবাসি ব্রিটেনীয় বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী বা সৈন্য ইত্যাকার যে প্রকার যতলোক নষ্ট করিয়া যত কপাল আহরণ করিতে পারিবে, তাহার প্রত্যেক কপাল আনয়নের পুরস্কার স্বরূপ সমুচিত অর্থপ্রদান করিব। ঐ যুদ্ধ সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান কর্মচারির পত্রেই এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাপ্তেন ক্রাফোর্ড কর্ণেল আণ্ডেমগুকে যে পত্র লেখেন, তাহাতে পশ্চাল্লিখিত ভয়ঙ্কর ব্যাপার লিখিত ছিল। যথা

"স্নেক্ ইণ্ডীয় নামক লোকের অধিপতি দিগের প্রার্থনানুসারে আমি জেমস ব্লয়ড সাহেব দ্বারা মহাশয়ের সমীপে আট গাঁট নরকপাল প্রেরণ করিতেছি। পরমেশ্বর এ সমুদায় রক্ষা করিবেন। এ সকল কপাল শুষ্ক, প্রস্তুতীকৃত, শিরোবন্ধনীর দ্বারা সুশোভিত এবং অসভ্যলোকের জয় চিহ্ন দ্বারা বিভূষিত হইয়াছে। মহাশয় অবশ্যই এই সকল অকপটলোককে কোন প্রকার অতিরেক উৎসাহ দেওয়া সুকৌশল বোধ করিবেন, তাহাব সন্দেহ নাই। এই আট গাঁটের মধ্যে যে সকল সামগ্রী আছে, তাহার চালান ও বিবরণও এই সঙ্গে যাইতেছে। ইণ্ডীয় লোকেরা মহাশয়কে নিবেদন করিতেছে, মহাশয় মহারাজাকে ঐরূপ আট গাঁট তাহারদিগের উপহার স্বরূপে প্রদান করিবেন।"

এই আট গাঁটের মধ্যে যে সমস্ত সামগ্রী ছিল, তাহা অবগত হইলে একেবারে চমৎকৃত হইতে হয়। এক গাঁটে ১০২ কৃষকের কপাল, এক গাঁটে ৮০ জন স্ত্রীর কপাল, এক গাঁটে ২১২ বালিকার কপাল, ইত্যাকার সকল গাঁটই ইংলণ্ডীয় লোকের যশোবিলোপি ও অনপনীয় কলঙ্ককারি বিষম সামগ্রীদ্বারা পূর্ণ ছিল। একটি গাঁটে ১২০টা নানা প্রকার নর কপাল ছিল। আর একটি ক্ষুদ্র

বাক্স ছিল, সে বাক্সটির বিষয় লিখিতে হৃদয় কম্পিত এবং লেখনী স্থগিত হইতেছে। তাহাতে ২৯টি অপোগণ্ড বালকের কোমল কপাল সঞ্চিত ছিল।

আর এই সমস্ত হৃদয় বিদীর্ণকারি দ্রব্যের বিবরণ মধ্যে যে সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপার দৃষ্ট হয়, তাহা নিরশ্রু নেত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তাহাতে এই প্রকার অনেকানেক কথা ছিল, যথা অমুক অমুককে "নখোৎপাটন প্রভৃতি বহুপ্রকার যন্ত্রনা দিয়া জীবিত থাকিতেই দগ্ধ করা গিয়াছে।" অমুক অমুক শিশুকে "তাহারদের জননীদিগের গর্ভ হইতে ছিন্ন করিয়া আনা গিয়াছে।"

এই কি ইংলণ্ডীয়দিগের সভ্যতার ফল, এই কি তাঁহারদের সুবুদ্ধি ও সৎ প্রবৃত্তির কার্য্য? তাঁহারদের স্বদেশীয় কোন মহাত্মা* যথার্থ বলিয়াছিলেন যে, আমরা আপন অস্ত্রকে যেরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়াছি, তাহা মহাসাগরের সমুদায় জলেও ক্ষালিত হইবার নহে।"

তদ্ভিন্ন তাঁহারা যে প্রকারে আমেরিকাবাসি ইংরেজদের গৃহ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিলেন, যে প্রকার ক্রোধভরে তদীয় গৃহ, অঙ্গন, ক্ষেত্রাদি নষ্ট ও দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং শরণাপন্ন ও কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যেরূপ যন্ত্রণাগ্রস্ত ও বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ করিবার প্রয়োজন নাই। ইংরাজেরা যে সকল অতি প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমেরিকা বাসিদিগের উপর অত্যাচার করণপূর্ব্বক যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, যুদ্ধকালেও যে সেই সমুদায় দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তিরই বশবর্ত্তি হইয়া চলিয়াছেন, ইহাই সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কতিপয় উদাহরণ প্রদর্শন করা গেল।

এই ঘোরতর সংগ্রামে কোন দেশীয় মনুষ্যেরা পরমেশ্বরের কিরূপ নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করিয়া কি প্রকার ফল প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইংরাজেরা উপচিকীর্ষা ও ন্যায় পরতা বৃত্তির উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক অর্জন স্পৃহা ও আত্মাদর বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাহাতে আমেরিকাবাসিদিগের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইল এবং উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম ঘটিত হইল। ইংরাজেরা পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্য লাভার্থে, আর আমেরিকাবাসিরা প্রধান প্রবৃত্তি সমুদায়ের প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক স্বকীয় স্বাধীনত্ব সংস্থাপন নিমিত্তে এই বিষম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। এমত স্থলে ইংরাজ-

* Lord Chatham.

দিগের জয় পরাজয় উভয়েতেই হানি সম্ভাবনা বরঞ্চ জয় হইলে অধিক অনিষ্ট হইত। বৃটেনবাসিরা আমেরিকাবাসিদিগকে পরাজয় করিতে পারিলে তাহারদিগকে পদে পদে অপমান করিতেন তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে আমেরিকাবাসিদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিসকল উত্তেজিত হইয়া ভূয়োভূয়ঃ ইংরাজ-দিগের দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইত। এ প্রকার দুঃশাসনীয় রাজ্যশাসন ও প্রজাদ্রোহ নিবারণার্থে বহুসংখ্যক সৈন্য ও রণতরি রক্ষা করিতে হইত, এবং তাহাতে ঐ রাজ্যের সমুদায় উপস্বত্ব অপেক্ষাও অধিক অর্থ ব্যয় হইত। তদ্ব্যতীত, এ প্রকার আচরণ দ্বারা তাঁহারদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল ক্রমাগত প্রবল হইতে থাকিত এবং তাহাতে স্বদেশে যুক্তি বহির্ভূত রাজনীতি প্রচলিত হইয়া আপনাদিগেরও অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন হইত। কিন্তু তাহারদের পরাজয় হওয়াতে অপেক্ষাকৃত উপকার দর্শিযাছে। আমেরিকাবাসিরা বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন, ধর্মবিষয়ে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মিত্র স্বরূপে ইংরাজদিগের বহুতর উপকার করিতেছে। তাঁহারা তাহারদিগকে নিগ্রহ করিয়া যত অর্থ অপহরণ করিতে পারিতেন, এক্ষণে আমেরিকায় বাণিজ্য দ্বারা তাহার দশগুণ ধনলাভ করিতে-ছেন, কিন্তু যখন তাঁহারা ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারদিগকে অবশ্যই তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। তাহাতে ভূরি ভূরি লোকক্ষয় ও রাশি রাশি ধন ব্যয় হইয়া তাঁহারদিগের অশেষ ক্লেশ উৎপন্ন করিয়াছে। তদবধি ইংলণ্ডীয় দিগের ইতিহাস তাঁহারদিগের অধর্ম্ম ও যন্ত্রণা বর্ণনায় মলিন ও কলঙ্কিত হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় রাজ্য যে অতি প্রভূত দুষ্পরিশোধনীয় ঋণজালে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারদিগের ন্যায় বিরুদ্ধ যুদ্ধ প্রবৃত্তিই তাহার একমাত্র কারণ। তাহা কেবল তাঁহারদিগের দুর্জ্জয় আত্মাদর, অর্জ্জনস্পৃহা, প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসাবৃত্তির প্রবলতা ও উত্তেজনার ফল। ইংলণ্ড ভূমি ১৬৮৮ অবধি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১২৭ বৎসরের মধ্যে ৬৫ বৎসর অতি প্রবল যুদ্ধানলে দগ্ধ হয়, এবং তাহাতে ২০২৩০০০০০০০ দুই সহস্র ত্রয়োবিংশতি কোটি টাকা ব্যয় হয়। তন্মধ্যে তত্রত্য প্রজাদিগকে কর স্বরূপে ১১৮৯০০০০০০০ একাদশ শত উননবতি কোটি প্রদান করিতে হইয়াছিল, এবং রাজপুরুষেরা ৮৩৪০০০০০০০ অষ্টশত চতুস্ত্রিংশত কোটি ঋণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ইংরাজদিগকে সেই দুর্ব্বহ ঋণভার বহন করিতে হইতেছে, এবং তন্নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা কর স্বরূপে প্রদান করিতে হইতেছে।

তাঁহারদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে মহানর্থকর বিষম পাপ করিয়া গিয়াছেন, তদীয় সন্তান সন্ততিদিগকে অদ্যাপি তাহার সম্যক শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে। তাঁহারদের যুদ্ধ নির্ব্বাহ নিমিত্ত যত অর্থ নষ্ট হইয়াছে, তাহার বিংশতি ভাগের এক ভাগ যদি ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ি শিক্ষা দান, পথ নির্ম্মান, খাতখনন, দানশালা, স্থাপন প্রভৃতি সৎকার্যে ব্যয় হইত তবে এতদিনে ব্রিটেন ভূমি কি অনুপম সুখধামই হইত।

আপনারদিগের লোকক্ষয়, অর্থব্যয় ঋনপাপ, ধর্ম্মোন্নতি নিবারণ, সুখসভ্যতা বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকতা, স্বজাতীয় প্রজাদিগের দরিদ্রতা বৃদ্ধি ইত্যাকার বিবিধ প্রকার বিষময় ফল ইংরাজজাতির অধর্ম্মরূপ বিষবৃক্ষে ফলিত হইয়াছে।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার (২)

ইংরাজেরা যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমেরিকাবাসিদিগের ওপর অত্যাচার করিয়াছিলেন সেই সকল প্রবৃত্তিরই অনুবর্ত্তি হইয়া ভারতবর্ষ অধিকার ও শাসন করিয়া আসিতেছেন। বিরলে বসিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিলে বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইতে হয়। আমারদের ভারতবর্ষে যাঁহারদের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই, ও অত্রত্য লোকদিগের সহিত যাঁহারদের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই, তাহারা প্রথমে অতি নম্রভাবে এখানে আগমন করিয়া ক্রমে ক্রমে এক সীমা অবধি সীমান্তর পর্যন্ত সমুদায় ভারতবর্ষ ছলে বলে কৌশলে হস্তগত করিয়া এখানকার লোকদিগকে অশেষ প্রকার পীড়া প্রদান করিতেছেন, অথচ আপনারদিগকে সভ্য ও ধার্ম্মিক বলিয়া অভিমান করেন, ইহার পর আশ্চর্য্যের বিষয় আব কি আছে! প্রথমে কতিপয় ইংলণ্ডীয় বণিক অতি মৃদুভাবে আগমন করিয়া সমুদ্রতটে অবস্থিতি করিলেন, এবং তদ্বারা এমত মহারাজ্যের সূত্রপাত করিলেন, যে তাহা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষীয় সকল রাজ্যই গ্রাস করিয়াছে। বৃহৎ বৃহৎ রাজভাণ্ডার লোপ করিয়াছে এবং এখানকার সকল লোকের সৌভাগ্যস্রোত রোধ করিয়াছে।

ক্রমে তাঁহারা ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বাদশাহ, নবাব ও

রাজাদিগের নিকট কুঠী নির্ম্মাণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং যৎ পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন, তৎ পরিমাণে আপনারদিগের চতুরতা বিদ্যা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এক ইউরোপীয় গ্রন্থ কর্ত্তা এ বিষয়ে ইংরাজদিগের নিগূঢ় ভাব ও প্রকৃত অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়াছেন। "এই সমুদায় কুঠী অলক্ষিত রূপে অল্পে অল্পে প্রস্তুত হউক, তবে অবিলম্বেই বিপণির পশ্চাতে দুর্গ প্রস্তুত হইবেক, এবং অনধিকাল পরেই ইংরাজদিগের রণতরি দুর্গ সন্নিধানে নিবদ্ধ হইবেক। হে রাজরাজ মহান মোগল! যদি তুমি রাজ্যমধ্যে ইংরাজদিগের বাণিজ্য ব্যাপার বিস্তৃত হইতে দেও, তবে স্বয়ং সম্রাট হইয়াও ইহা দেখিবে, যে অল্প-কালেই তোমার মন্ত্রিগণ অবাধ্য হইয়া উঠিবেক, তোমার সভাসদেরা প্রতারক হইবেক এবং তোমার কর্ম্মচারিরা গর্ব্বিত হইবেক। যদ্যাপি তখনও রাজ-পদোচিত অনুমতি প্রদানের যে সম্মান, তাহা তোমারই থাকিবেক, কিন্তু তুমি রাজেশ্বর থাকিবে না। বিদেশীয় জনের অদৃশ্য হস্ত তোমার বিধি প্রদর্শক হইবেক, এবং তোমার সমুদায় বাঞ্ছা ও ইচ্ছা পর্য্যন্ত প্রবর্ত্তিত করিবেক।"

এই অল্প কথাতেই ইংরাজদিগেব চরিত্র ও ব্যবহারের যথার্থ বর্ণনা করা হইয়াছে "সূচ হইয়া প্রবেশ করে ও ফাল হইয়া বহির্গত হয়।" এই চলিত কথা তাহাদিগের প্রতি বিলক্ষণ অর্শে। ইংরাজেরা এই অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন এবং তদনুযায়ি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

প্রথমে, ইংরাজ জাতির প্রতিনিধিরস্বরূপ দুই দারুণ দুঃশীল ব্যক্তি নানা-প্রকার অসদুপায় অবলম্বনপূর্ব্বক স্বজাতীয় লোকের লোভ রিপুকে চরিতার্থ করিতে আরম্ভ করে। ক্লাইব সাহেব যে প্রকার প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র করিয়া বাঙ্গলার নবাবকে পদচ্যুত করেন* ও আপনার প্রিয় পাত্র মীরজাফরকে

* ক্লাইব সাহেব এই বিষয় সাধনার্থ মিথ্যা কথন, কপট ব্যবহার, প্রতারণা, জালপত্র প্রস্তুতকরণ, কৃত্রিম নাম স্বাক্ষরকরণ ইত্যাদি যে সকল কুকর্ম করিযাছেন, তাহা বলিবার নহে। যে সকল লোক ঐ ষড়যন্ত্র করেন তন্মধ্যে উমিচাঁদ নামে এক ব্যক্তি ছিল। ক্লাইব সাহেব প্রভৃতি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিবার নিমিত্ত এক জাল লেখ্যপত্র প্রস্তুত করেন। এডমিরাল ওয়াটসন সাহেব তাহাতে স্বনাম স্বাক্ষর করিতে স্বীকার না করাতে ক্লাইব সাহেব কৃত্রিম করিয়া স্বয়ং ওযাটসনের নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন। এ ব্যক্তির অসাধ্য কর্ম কি আছে? মেকালে সাহেব কহেন, এ কথা লিখিতে আমাদিগকে লজ্জিত হইতে হইতেছে। উমিচাঁদ এই প্রকার প্রবঞ্চিত হওয়াতে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া অবিলম্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল।

বাঙ্গলার সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া হস্তগত রাখেন ও তদ্দ্বারা যে প্রকার অর্থ-লাভ করিয়া রাজ্যলাভের সূত্রপাত করেন এবং ওয়ারেন হেস্‌টিংস যে প্রকার ছলবল কৌশল পূর্ব্বক লোক নিপীড়ন করেন, অর্থ ও রাজ্যাপহরণ করেন, এবং নরহত্যা করিয়া তদীয় রক্তে ভারতভূমি অভিষিক্ত করেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

ক্লাইব সাহেব মীরজাফরের সহায় হইয়া যে বিষয়ের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, অতি অপূর্ব্ব ইংরাজি কৌশল প্রকাশপূর্ব্বক কম্পানিকে মোগল সম্রাটের বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের কর সংগ্রাহক করিয়া তাহা সিদ্ধ করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহারদিগের লোভ রিপু সম্যক চরিতার্থ হয় নাই। করসংগ্রহ তাহারদিগের কৌশলের এক অঙ্গমাত্র, ভূমি অধিকার ও একচেটিয়া বাণিজ্য সংস্থাপন করা তাঁহারদিগের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা লবণ, তাম্রকূট প্রভৃতি যে সমুদায় সামগ্রী সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয়, তাহাব উপর গুরুতর কর স্থাপন করিলেন। ইংরাজ ভিন্ন অন্যান্য সকল জাতীয় বণিকদিগকেই দ্রব্যের কর প্রদান করিতে হইত; অতএব এখানে ইংলণ্ডীয় বণিকদিগের একাধিপত্য হইবার আর কি প্রতিবন্ধক রহিল? তাহারদিগের সমকক্ষ স্বরূপে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত হয় কাহার সাধ্য? ক্লাইব সাহেব ভূম্যধিকার বিষয়েও মন্ত্রণা করিতে ত্রুটি করেন নাই, ভূস্বামিদিগের লেখ্যপত্র প্রমাণ করিবার ছলে তাহারদিগের ভূম্যধিকার সকল বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া লইলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি এই যে প্রজা নিষ্পীড়ন ব্রত অবলম্বন করিলেন, অদ্যাপি তাহা সম্যকরূপে সর্ব্বোতভাবে পালন করিতেছেন।

এ সমুদায় কম্পানির লাভ, তদ্ভিন্ন ক্লাইব সাহেবের নিজস্ব বিস্তর ছিল*। তিনি ও অন্যান্য কর্ম্মচারিরা যেরূপ অন্যায় করিয়া ধন উপার্জন করিয়াছিলেন তৎকালে পার্লিয়েমেণ্টের একজন সভ্য তাহার স্বরূপ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

"কম্পানির কর্ম্মচারিরা যে বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহা যে সদুপায় দ্বারা উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহার আর প্রায় কিছুই সন্দেহ নাই। যদি তাহারদিগকে বল, তোমরা কি বল দ্বারা হিন্দুদিগের ধন হরণ

---

* ক্লাইভ সাহেব প্রধান নবাব। তৎকালে কতকগুলি ইংবাজ ভারতবর্ষে আগমন করিবা অন্যায ও অপহরণ পূর্বক রাশি রাশি ধন লাভ করিবা ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল; তাহাবা স্বদেশে গিয়া নবাব নামে খ্যাত হয। তন্মধ্যে ক্লাইব সাহেব সর্বপ্রধান।

করিয়াছ? তাহারা কহিবেক, যুদ্ধেতে এমন অধিকার আছে;—যদি বল তোমরা কি চাতুরী করিয়া অর্থলাভ করিয়াছ? তাহারা কহিবেক, ইহা আমারদিগের পরিশ্রমের পুরস্কার;—যদি বল তোমরা কি একচেটিয়া ব্যবসায় দ্বারা ধন শোষণ করিয়াছ? তাহারা কহিবেক ইহা বাণিজ্যের ফল। বলার্জ্জিত ধনের সহিত উপহারের এবং লুটের সহিত পুরস্কারের এই সকল শাব্দ্যোৎপন্ন বিভিন্নতা বিবেচনা করিয়া কম্পানির মহৈশ্বর্য্যশালি বণিকেরা তৃপ্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাহা ব্যবস্থাপকদিগের শ্রাব্য নহে।"*

এইতো ইংরাজজাতির এক প্রতিনিধির গুণ। কিন্তু দ্বিতীয় প্রতিনিধি হেসটিংসের পাপচরিত্রের সহিত তুলনা করিলে ক্লাইবের দোষ তাদৃশ গুরুতর বোধ হয় না। তিনি ভারতভূমি উচ্ছিন্ন দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। তিনি অপহরণ করিয়াছেন, দস্যুতা করিয়াছেন, এবং নরহত্যা, স্ত্রী-হত্যা ও শিশু হত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছেন। তিনি অযোধ্যার নবাবের নিকট কিঞ্চিৎ অর্থ প্রত্যাশায় নির্দ্দোষ মহিলাদিগের উচ্ছেদ সাধন নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকে নষ্ট করিয়াছেন। এই সংহার কার্য্য এ প্রকার সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, যে যে সকল ইংরাজ কর্ম্মচারি ঐ ভয়ঙ্কর ব্যাপার সাধনে নিযুক্ত ছিল, তাহারদিগেরও তদ্দৃষ্টে হৃৎকম্প হইয়াছিল। কিন্তু হেসটিংসের হৃদয়ে কারুণ্যরসের লেশমাত্র ছিল না। এই দুর্ভাগ্য নির্দ্দোষ রহিলা জাতি একেবারে উচ্ছিন্ন যাউক, তাহারদের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে দুঃসহ যন্ত্রণানলে দগ্ধ হউক, তাহারদিগের গৃহ-দাহ হইয়া সমুদায় ভস্মসাৎ হউক, আর তাহারদের পালিত পশু সকলই বা নষ্ট হউক, কিছুতেই তাঁহার পাষাণময় চিত্ত আর্দ্র হয় নাই। আপনার ও কম্পানির ধন লাভই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাহা হইলেই তিনি চরিতার্থ হইতেন।

তৎকালে কম্পানির কর্ম্মচারিরা দল বদ্ধ হইয়া যে প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাতে বাঙ্গলার লোক নিঃস্ব ও নিরন্ন হইয়া উচ্ছিন্ন যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। মেকালে সাহেব লেখেন, "তাহাদের অত্যাচার সহ্য করা অভ্যাস পাইয়াছিল বটে কিন্তু ইতিপূর্ব্বে এমত অত্যাচার কখনও সহ্য করেন নাই।" এক মোসলমান গ্রন্থকর্ত্তা দুর্দ্দান্ত ইংরাজদিগের দারুণ উপদ্রব ও বাঙ্গালিদিগের দুরবস্থা ঘটনার প্রসঙ্গে দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহেন, "হে পরমেশ্বর! তোমার ব্যথিত ভৃত্যদিগের প্রতি অনুকূল হও এবং তাহারা যে অত্যাচার সহ্য করিতেছে তাহা হইতে তাহারদিগকে পরিত্রাণ কর।"

দেখ, মোগল সম্রাটের মহারাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যৎ কিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তন্মধ্যে তিনি দুটি প্রদেশ ইংরাজদিগের হস্তে রক্ষণার্থ অর্পণ করিয়াছিলেন, হেসটিংস তাহা গ্রহণ করিয়া অযোধ্যার নবাবকে বিক্রয় করিলেন। অযোধ্যার নবাবের পরলোক প্রাপ্তি হইলে পর তাহার কতক বিষয় বিক্রয় করিয়া লইলেন, ও পূর্ব্বোক্ত দুই প্রদেশ পুনর্ব্বার হস্তগত করিলেন, পরে নবাব পুত্র তৎপরিবর্ত্তে বারাণসী প্রদেশ প্রদানে স্বীকৃত হওয়াতে তাহা ফিরিয়ে দিলেন। কাশী-রাজা নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক কর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন, তৎপবে হেসটিংস সাহেব তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া বল ও প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক কর ও দণ্ড স্বরূপে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক অর্থ গ্রহণ করিতে লাগিলেন, অবশেষ আপনার পাপের ভরা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত কাশী আক্রমণ করিলেন, তাহার রাজা চেৎসিংহকে অপমানিত ও পদচ্যুত করিলেন, স্বীয় সৈন্য দিয়া তাঁহার ধন লুট করাইলেন এবং স্বাভিমত ব্যক্তিবিশেষকে রাজসিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া কাশীর ৪০০০০০০ চল্লিশ লক্ষ টাকা কর নির্ধারিত করিলেন ও তথাকার বিচার-কার্য কম্পানির কর্ম্মচারিদিগের অধীন করিয়া লইলেন।

হেসটিংস সাহেব অযোধ্যার নবাবের উপর পুনঃপুনঃ অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে নির্দ্ধন ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অবশেষ, তথাকার দুই বেগমের কিঞ্চিৎ সম্পত্তি ছিল, তাহাও অপহরণ করণার্থ লোভ রিপুকে নিয়োজন করিলেন। তাহার এক বেগমের পুত্র তখন নবাব ছিল, হেসটিংস সাহেব কুমন্ত্রণা করিয়া সেই পুত্রকে দিয়াই তাহার মাতা ও পিতামহীর অসম্ভ্রম ও ধন হরণ করাইলেন। তাহাদের ভূমি-সম্পত্তি সমুদায় অধিকার করিলেন, তাহারদের বাসস্থান আক্রমণ করিলেন, তাহারদের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিকে কারারুদ্ধ করিলেন এবং নিঃশেষে সমুদায় ধন অপহরণ করিয়া হস্তগত করিলেন।

এই সকল অসহ্য অত্যাচার দেখিয়া যদি কেহ তাঁহার দোষোল্লেখ করিত, তবে হেসটিংস নানাপ্রকার ছল করিয়া, নানাপ্রকার মিথ্যা অপবাদ দিয়া, ও কৃত্রিম সাক্ষি উপস্থিত করিয়া তাহাকে নষ্ট করিতেন। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে কেবল এই কারণেই রাজা নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইয়া ইংলণ্ড ভূমিকে অনপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। তিনি ও তাঁহার সহকারি কর্ম্মচারিরা প্রজাদিগকে যে প্রকার নিষ্পীড়ন করিয়াছেন,—প্রহার,

কারারোধ ও অন্যান্য প্রকার দণ্ড দ্বারা যেরূপ দুঃসহ ক্লেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিরশ্রু নেত্রে বর্ণনা করা যায় না। ইংলণ্ডীয় কতকগুলি রাজপুরুষের ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনার কথা কি কহিব? তাঁহারদের ঐ প্রকার পাষাণময় কঠোর হৃদয়, যে এমন দুঃশীল দুরাত্মার দোষ খণ্ডনার্থ এবং অপবাদ বিমোচনার্থ নানা প্রকার যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহারদিগকেও অবশ্য পূর্ব্বোক্ত মহাপাপ সমুদায়ের ভাগি হইতে হইয়াছে। তাঁহারদিগের দেশীয় কোন মহাত্মা* এ বিষয়ে এই যথার্থ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। যথা "এ বিষয়ে গবর্নমেণ্টের নিতান্ত অমনোযোগ দেখিয়া আমারদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে ক্রোধের উদ্রেক না হইবেক? ইহাতে কি ঐ পাপ কর্ম্ম করিতে তাঁহারদের স্পষ্ট অনুমতি প্রদান করা হইতেছে না? তাঁহারদিগের অপরাধি কর্ম্মকর্ত্তারা যে সমুদায় দুষ্কর্ম্ম করিতেছে, তাহারা আপনারদিগকে কি তাহার অংশিরূপে স্বীকার করিতেছেন না? আমার বিষয় কি বলিব? যে দিন আমি এই ভূরি ভূরি ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রথম অবগত হইয়া আপনাকে তাহার প্রতীকার সম্পাদনে অসমর্থ দেখিলাম, সেদিন অতি অশুভ দিন জ্ঞান করিয়া পরিতাপে তাপিত হইয়াছি। ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের ন্যায় আমার অন্তঃকরণে অবিরত অবভাসিত হইয়াছে, যে আমরা যে শক্তির সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার অত্যন্ত অন্যায় নিয়োগ দ্বারা কত কত নগর উচ্ছিন্ন গিয়াছে, কত কত প্রদেশ নির্লোক হইয়াছে, কত কত মনুষ্যজাতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্য হিন্দুদিগের ক্রন্দন-ধ্বনি আমার কর্ণ কুহরে প্রতিধ্বনিত হয়, এবং স্বপ্নযোগে তাঁহারদের ক্ষতবিক্ষত শোণিতাক্ত প্রতিমূর্ত্তিসকল আমার হৃদয় ব্যাকুল করে।"

অবশেষে, ইংলণ্ডীয় রাজপুরুষেরা হেসটিংস সাহেবকে বিচার-স্থলে আহ্বান করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাত বৎসর বিচারের পর যে তাঁহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করেন, তাঁহারদের এ কলঙ্ক কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। তাঁহারা তাঁহাকে নির্দ্দোষ মানিয়া এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানি নামক বণিক সম্প্রদায় তাঁহার পাপের পুরস্কার স্বরূপ বিপুল বার্ষিক নির্দ্ধারিত করিয়া আপনারা তাঁহার সমুদায় দোষের ভাগি হইয়াছেন।

ইংরাজেরা যে দুর্জ্জয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তি হইয়া ভারতভূমি অধিকার করিতে আরম্ভ করেন, ইহাই জ্ঞাপন করিবার নির্মিত্ত তাঁহারদিগের প্রথমকার ব্যবহারের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ লিখিত হইল। তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে

* Burke

হইলে কত প্রহার-ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিতে হইত, কত আর্ত্তনাদের প্রতিনাদ করিতে হইত, কত হৃত-সর্ব্বস্ব ব্যক্তির চীৎকার রব ব্যক্ত করিতে হইত কত অস্ত্রাগত শোণিতাক্ত শরীরের বর্ণনা করিতে হইত, কত স্তূপাকার ভয়ঙ্কর শব সমূহের বিবরণ করিতে হইত।

বস্তুতঃ পলাশির প্রসিদ্ধ যুদ্ধ অবধি সম্প্রতিকার শিখ সংগ্রাম পর্য্যন্ত ইংরাজেরা ভারতবর্ষে যত যুদ্ধ করিয়াছেন ও যত দেশ জয় করিয়াছেন, প্রায় সমুদায়ই অন্যায় পূর্বক সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহারা স্বার্থানুরোধে বল দ্বারা চীনেশ্বরের হিত-বাক্য অবহেলন পূর্বক তাহার প্রজাদিগকে অহিফেনরূপ বিষম বিষ ভক্ষণ করাইয়া কি মহাপাপই করিতেছেন। তাঁহারা চিরকালই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অনুবর্ত্ত হইয়া চলিয়াছেন এবং অদ্যাপি তদনুযায়ি ব্যবহার করিতেছেন, দুর্জয় অর্জন স্পৃহা তাঁহাদের সমুদায় সদ্বৃত্তিকে পরাভূত ও অকর্মণ্য করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহারদের ভারতবর্ষ অধিকার ও শাসনের বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে কুমন্ত্রণা, প্রতারণা এবং অত্যাচার এবং দুর্নিবার লোভের কার্য্যেরই বিবরণ করিতে হয়। ফলতঃ ভূমণ্ডলের যে খণ্ড বিদ্যা জ্যোতিতে বিশিষ্টরূপ পূর্ণ হইতেছে, এবং যাহাতে অন্যান্য সুসভ্য জাতিদিগের নিবাস, সেই খণ্ডে বাস করিয়া যাহারদের প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক পরদেশ আক্রমণ, ছলে বলে পরদ্রব্য গ্রহণ, একচেটিয়া বাণিজ্য সংস্থাপন প্রভৃতি অতি গর্হিত অবৈধ কার্য্য করিতে চক্ষুলজ্জাও হয় না, তাঁহারদের সদ্বৃত্তি ও সচ্চরিত্রের বিষয় আর কি বলা যাইবে* ?

ইংরাজেরা অধর্ম্মসহকারে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন এবং অধর্ম্ম সহকারে শাসন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে তাঁহারা ভারতভূমি অধিকার করিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিতেছেন, সেই সকল মনোবৃত্তির প্রবলতা দ্বারা স্বদেশেরও অনেক প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইয়া আসিতেছে। তথাকার রাজ নিয়ম ও রাজপুরুষ-দিগের ব্যবহার অধর্ম্মদোষে দূষিত হইয়া লোকের বিস্তর ক্লেশ উৎপন্ন

* এস্থলে ইংরাজদিগের দুর্নীতির বিষয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা উক্ত হইল পশ্চাল্লিখিত প্রামাণিক গ্রন্থ সমুদয়ে তাহার বিবরণ আছে, যথা Macaulay's Essays, Taylor's, British India, & CA Ledru Rollin's Decline of England, Cunningham's History of the Sikhs & CA & CA

করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে, যে পরাধীন লোকের অধর্ম্ম না থাকিলে স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। আপনারদিগের শারীরিক দুর্ব্বলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির হীনতাই তাহারদিগের এরূপ দুর্ঘটনার মূল কারণ। বোধ হয়, এক জাতির উপরে অন্যজাতির অত্যাচার করিবার ক্ষমতা এই অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হইয়া থাকিবেক, যে অত্যাচারিত জাতি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া আপনারদিগের পরিত্রাণার্থ অধিকতর বল-বীর্য্য প্রকাশে চেষ্টা করিবেক, কিন্তু ভয় হয়, কি জানি যদি ভারতবর্ষীয় লোকে পরমেশ্বরের অখণ্ড্য নিয়মের অত্যন্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এ পৃথিবী অধিকার বা তাহাতে বাস করিবার অযোগ্য হইয়া থাকে। মনুষ্যের শারীরিক শক্তি প্রকাশ ও উৎসাহ বিশিষ্ট শক্তিমান মানুষদিগের প্রভুত্ব ও রাজত্ব লাভই ঐশ্বরিক নিয়মের প্রথম উদ্দেশ্য বোধ হয়। কিন্তু মনুষ্য ধর্ম্মশীল জীব, ধর্ম্মের আয়ত্ত করিয়া স্বীয় শক্তি নিয়োজন না করিলে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অধার্ম্মিক লোকে রাজ্য অধিকার করিতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরের এই নিয়ম, যে তাহারা সুখ-স্বচ্ছন্দ ভোগ করিতে পারে না।

যে মহাত্মার গ্রন্থানুসারে এই প্রস্তাব লিখিত হইতেছে, তিনি এই প্রকার অনুমান করিয়া লিখিয়াছেন, যে "আমি ভরসা করি, আর এক শত বৎসর অতীত না হইতেই পরমেশ্বরের ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম প্রণালীর জ্ঞান লাভ বিষয়ে ব্রিটেনীয় লোক-সাধারণের এ প্রকার উন্নতি হইবেক, এবং তাহাতে তাহারদিগের এ প্রকাব গাঢ়তর প্রত্যয় জন্মিবেক, যে রাজপুরুষেরা আপনারদিগের ভারত রাজ্যাধিকার হিন্দু ও ইংরাজ উভয় জাতিরই অনিষ্ট-জনক বোধ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবেন, অথবা ধর্ম্মানুগামি হইয়া কেবল হিন্দুদিগের উপকার উদ্দেশে উক্ত রাজ্য পালন করিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে ইতিপূর্ব্বেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে; ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের অধিকারে যে প্রকার সুখ সৌভাগ্যের আলয় হইয়াছে, স্বকীয় রাজাদিগের অধীন থাকিতে সেরূপ কখনই হয় নাই। কিন্তু কেবল ইংরাজদিগের কথা প্রমাণে এ বিষয় অবধারিত করা যায় না, পরাধীন লোকদিগের বাক্য দ্বারা ইহা কখনও স্বপ্রমাণ হইতে শুনা যায় নাই। বিশেষতঃ ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে আমরা হিন্দুদিগকে পরাধীন জাতি বিবেচনা করিয়া শাসন করি, এবং তদনুসারে তাঁহারদিগকে সমুদায় উচ্চ উচ্চ সম্ভ্রান্ত পদলাভে বঞ্চিত রাখি। যথার্থ ধর্ম্মানুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিতে হইলে, তত্রত্য লোকদিগকে পরমেশ্বরের

প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ শিক্ষা দিতে হয়, এবং যাহাতে তাহারদের তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা ও তৎপালনে প্রবৃত্তি হয় এইরূপে প্রস্তুত করিতে হয় ; রাজ্যের বিচার-কার্য্যে তাহারদিগকে নিযুক্ত করিতে হয় ; তাহারদিগকে ও ইংরাজ-দিগকে সমান পদ ও সমান ক্ষমতা প্রদান করিতে হয়, এবং যাহাতে তাহারা বুদ্ধিমান স্বাধীন ও ধর্মশীল হয় তাহার উপায় করিতে হয়। যদি কখনও আমরা তাহারদিগকে এই প্রকার সৌভাগ্যশালি করি, এবং তাহারদের প্রতি কেবল ন্যায় ও দয়ানুযায়ি ব্যবহার করিয়া তৃপ্ত থাকি, তবে তদ্দারা আমার-দিগের প্রতি তাহারদিগের সম্প্রীতি ও সমাদর প্রকাশ হইয়া তখন আর তথায় আমারদের সৈন্য সংস্থাপনের আবশ্যকতা থাকিবে না, অথচ আমরা বাণিজ্য-সম্পন্ন সমুদায় লাভ প্রাপ্ত হইতে পারিব। যদবধি ব্রিটেনীয় রাজ-পুরুষেরা পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মে অবিশ্বাস করিয়া ভারতবর্ষের বর্তমান শাসন প্রণালী রক্ষা করিবেন, তদবধি স্বদেশের রাজ-নিয়মও কখন সম্পূর্ণরূপ দোষশূন্য হইবেক না। আর যদবধি ঐ সমুদায় নিয়ম অধর্ম দোষে দূষিত থাকিবেক, তদবধি ব্রিটেন ভূমির প্রচলিত ধর্ম্ম কেবল বালুময় রজ্জু স্বরূপ হইবেক। সুতরাং তদ্দারা প্রজাদিগকে ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ রাখিবার চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইবেক ; তাহার ধন-সম্পত্তি কেবল আপনার পাশ স্বরূপ হইবেক, এবং তাহার সামর্থ্যরূপ দারুণগর্ভে এমন বিষম ঘুণ গুপ্ত থাকিবেক, যে সে সকল বলক্ষয় করিয়া ব্রিটেনীয় রাজ্যকে অধর্ম্ম-পালিত বিনষ্ট রাজ্য সমুদায়ের মধ্যে গণ্য করিবেন।”

এক্ষণে যাহাতে মহাত্মা কুম্ব সাহেবের এই শেষোক্ত ভবিষ্যৎবাণী সম্পন্ন না হয়, ইংরাজদিগের তাহা চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক রাজ্যশাসন বিষয়ে পরম মঙ্গলাকার পরমেশ্বরের শুভতর নিয়ম পালন ব্যাতিরেকে ইহার আর উপায়ন্তর নাই।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৯৩ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৭৭৩ শক

এক্ষণে কি কি আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক

ভারতভূমি এক্ষণে এক অভূতপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছেন ; এক্ষণে দিন দিন অনেকবিধ পরিবর্ত্তন নয়নগোচর হইতেছে, তাঁহার সন্তানগণ এক্ষণে নানাবিধ

শুভফল ভোগ করিতেছেন ; কিন্তু আমাদিগের অর্জ্জিত যাবতীয় অভিলষিত আবশ্যক বস্তু লাভ দ্বারা চরিতার্থতা লাভ হয় নাই। আমরা দূর হইতে সৌভাগ্য দ্বীপ দর্শন করিতেছি ; সম্মুখে অনেকগুলি দুরতিক্রম প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। সে সকল অতিক্রম করিয়া তথায় গমন আপাতত অসাধ্য বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু যদি অধ্যবসায় রূঢ় হইয়া তথায় গমন চেষ্টা করা যায়, চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা আছে। স্থিরতর প্রযত্ন, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের অগ্রে কি কিছু প্রতিবন্ধকরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারে? কাপুরুষেরাই আপনাদের আশঙ্কা করিয়া পরাঙ্মুখ হয়।

অন্যে কি চেষ্টা পাইয়া আমাদিগের শ্রেয়ঃসাধন করিয়া দিবেন? আমরা কি অন্যের মুখ প্রতীক্ষা করিয়া রহিব? কখনই না। সে মঙ্গল বিশুদ্ধ ও স্থিরতর নহে। আপনাদিগের মঙ্গল আপনারাই চেষ্টা করিয়া লইতে হইবে। আমরা যে জাতির অধিকারে বাস করিতেছি, তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক সাহায্য লাভ হইতে পারে সন্দেহ নাই। তাঁহারা আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে পারেন, কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা কার্য দ্বারাও আমাদিগের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা আমাদিগের যাবতীয় কল্যাণ সাধন করিতে পারেন না। ভারতবর্ষ একটি ক্ষুদ্রতম প্রদেশ নহে। সমুদায় দেশের উন্নতি সাধন বিদেশীয়দিগের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নয়। আপনার শ্রেয়ঃসাধন আপনারই কর্ত্তব্য বলিয়া যখন স্থির হইল, তখন সেই শ্রেয়ঃসাধন বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন্‌গুলি নিতান্ত আবশ্যক, তাহার বিবেচনা বিধেয় হইতেছে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শরীর ও মানস —উভয়বিধ বল ; এই পাঁচটি বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন সর্বাগ্রে আবশ্যক।

প্রথম, কৃষি। এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট পতিত ভূমি বিক্রয় করিতেছেন। অনেক ইউরোপীয় সে সকল ক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইউরোপীয়েরা এদেশে কৃষি কার্য্য করিয়া এদেশীয় কৃষকদিগকে উৎকৃষ্ট কৃষিকার্য্য প্রণালীর শিক্ষা দেন ইহা মঙ্গলের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, এদেশের ভূমি যত এদেশীয়দিগের অধীনে থাকিয়া উৎকৃষ্ট প্রণালীতে তাহার কৃষিকার্য সম্পাদিত হইবে, ততই অধিকতর মঙ্গলের বিষয়। ভারতবর্ষে কৃষকের অভাব নাই ; কেবল কৃষিকার্যের উৎকৃষ্ট প্রণালীরই অভাব ; যদি এই দেশ উর্ব্বর না হইত, তাহা হইলে বর্ত্তমান কৃষকেরা অর্দ্ধেক শস্যও উৎপাদন করিতে সমর্থ হইত না। আমরা যদি কৃষিকার্যের উৎকৃষ্ট প্রণালী শিক্ষা

করিয়া দেশের অধিকাংশ ভূমি আপনারা কর্ষণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের যথার্থ সৌভাগ্য লাভ হয়। নতুবা ইউরোপীয়দিগের চা, নীল অথবা তুলা ক্ষেত্রে কেবল মজুরী করিলে কৃষকদিগের এখনও সে দশা, তখনও সেই দশা থাকিবে। অপর, আমরা যদি আপনারা তুলা প্রভৃতির উৎপাদন বিষয়ে সমর্থ হই, আমাদিগের উপরে ইংলণ্ডের নির্ভর করিতে হইবে সন্দেহ নাই। এরূপ হইলে কি আমাদিগের যুক্তিগর্ভ প্রার্থনা সকল এখনকার ন্যায় তখন অগ্রাহ্য হইবে? তখন কি আর অসার ও অপদার্থ বোধ করিয়া ইউরোপীয়েরা আমাদিগের প্রতি উপেক্ষা করতে পারিবেন? এক্ষণে স্বদেশীয়দিগের নিকটে আমাদিগের জিজ্ঞাসা এই, আমরা যদি আপনারাই ভূমির অধিকারী ও কৃষক এ উভয়েব কার্য নির্বাহ করি, ইংলণ্ড আমাদিগের অধীনস্থ হইবেন, আর যদি নীলকর প্রভৃতির মজুরী কার্য্যে দেহক্ষয় করি, আমাদিগকে প্রত্যেক স্বার্থপর ইউরোপীয়ের দাস হইতে হইবে, ভারতবর্ষীয়েরা এই দুই উপায়ের কোনটি অবলম্বন করিতে চাহেন?

দ্বিতীয়, শিল্প। আমাদিগেব শিল্প নৈপুণ্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেন্টই এই লোপের কারণ। ১৮১০ অব্দেব সনন্দের পূর্ব্বে ঢাকা, বিক্রমপুব, বালেশ্বর প্রভৃতি প্রদেশ সকল প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। আমাদিগের দেশের বস্ত্র ইউরোপের অনেক প্রদেশে নীত হইত। কিন্তু ক্রমশঃ বাষ্পীয় তাঁত প্রভৃতিব প্রাচুর্য্য ও মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডীয় তন্তুবায় বর্গের সুবিধা হেতু আইন হওয়াতে আমাদিগের দেশেব বস্ত্রের বাণিজ্য এককালে লোপ পাইয়াছে। বিদেশে রপ্তানী করা দূবে থাকুক. আমরা স্বদেশের জন্যও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বস্ত্র প্রস্তুত কবিতে পারিতেছি না। সর্ব্বদাই আমাদিগের গবর্ণমেন্ট ও অন্য অনেক ইউরোপীয় "ভারতবর্ষের অর্থাগমের উপায় উদ্ভাবন" এই কথার উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই কথাব যথার্থ অর্থ কি? ভারতবর্ষে প্রচুর তুলা উৎপন্ন ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীর সমুদায় খণ্ডে প্রেরণ করা কি ইহার মুখ্য অর্থ নয়? গবর্ণমেন্ট ভ্রমেও কি কখন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে মাঞ্চেষ্টবের ন্যায় এখানে বাষ্পীয় তাঁত ও অন্যবিধ কল হয়? আমরা ইংলণ্ডের উপর বস্ত্রেব জন্য নির্ভর না করিয়া ইংলণ্ড আমাদিগের উপরে নির্ভর করিবেন, গবর্ণমেন্ট কি কখনও এরূপ কথা মুখে আনিয়াছেন? যদি তাহা না হইল, তবে আমাদিগের যথার্থ শ্রীবৃদ্ধি কোথায়? যতদিন এদেশীয়েরা শিল্পকার্য্যে নিপুণ হইয়া এদেশে নানাবিধ দ্রব্যাদি উৎপন্ন ও প্রস্তুত

করিতে না পারিবেন, তাবৎ অর্থাগমের দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে এ কথাটী বলা বাত্তা শাস্ত্রানুসারে সঙ্গত হইতে পারে না।

তৃতীয়, বাণিজ্য। এক্ষণে ভারতবর্ষে ৯০ কোটি টাকার বাণিজ্য হইতেছে। কিন্তু ইহার কত অংশ আমাদিগের প্রযত্নে সম্পাদিত হইতেছে, ভারতবর্ষ হইতে কয়খানি জাহাজ বিদেশে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়া থাকে? বোম্বাইয়ের কয়েকজন পারসী ব্যতিরেকে ভারতবর্ষে যথার্থ বণিক কোথায়? পারসীরাও পৃথিবীর সকল অংশে বাণিজ্য করিতে গমন করেন না। আমাদিগের ব্যবসায়ীরা ইউরোপীয়দিগের নিকটে দ্রব্য ক্রয় করিয়া স্বদেশীয়দিগকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করেন। তাহাতে টাকা হস্তান্তর হয় এইমাত্র। বিদেশ হইতে টাকা আনিতে না পারিলে দেশের যথার্থ ধনবৃদ্ধি হয় না।

বাণিজ্য বিষয়িনী শ্রীবৃদ্ধি চেষ্টা কি আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক নয়? রুশীয়ার প্রথম পিটর প্রজাদিগকে বাণিজ্য বিষয়ে সর্বশেষ উৎসাহ দান করিতেন, তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে বিদেশে বাণিজ্য কার্য্যে শিক্ষার্থ প্রেরণ করা হইত। এখানে কি সেরূপ করা হইতেছে? আমরা কি চিরকাল এইরূপ অবস্থায় থাকিব? আমরা কি আপনারা নানা দেশে বাণিজ্য করিয়া স্বদেশের ধন ও গৌরব বৃদ্ধি করিব না? যে দেশে বাণিজ্যের সবিশেষ উন্নতি হয়, তদ্দেশীয়দিগের অতুল বল ও অতুল সাহস হয়। আলেকজাণ্ডারকে টায়ারের সম্মুখে ৮ মাস কাল সেনানিবেশ করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। ডেরায়সকে জয় করিতে তাঁহার যত কষ্ট না হইয়াছিল, ঐ বন্দর গ্রহণ করিতে তদপেক্ষা বহুগুণে অধিক কষ্ট হয়। বাণিজ্যের বলেই, নেদারলণ্ডের লোকেরা স্পেনীয় দ্বিতীয় ফিলিপের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছিল; বাণিজ্যের বলেই ইংরাজেরা মহাবীর নেপোলিয়নের পতন সাধন করিয়াছেন। ভারতবর্ষের হিতৈষী পুত্রমাত্রেরই যেন এই কথা স্মরণ থাকে।

চতুর্থ, বুদ্ধিবল। যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপ ও ব্যায়ামাদির ব্যতিরেকে শারীরিক বল ও সাহসাদি বৃদ্ধি সম্ভাবিত নয়, সেইরূপ সবিশেষ চালনা ব্যতিরেকে বুদ্ধিবল বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধিবল বৃদ্ধির একমাত্র উপায় বিদ্যার সবিশেষ অনুশীলন। এক্ষণে বিদ্যার অপেক্ষাকৃত অধিক অনুশীলন হইতেছে, এদেশীয়দিগের দৈনন্দিন বুদ্ধিবল বৃদ্ধিও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। যে যে অংশে শিক্ষা কার্য্যের দোষ লক্ষিত হয়, তাহাও ক্রমশঃ

সংশোধিত হইতেছে। উত্তরোত্তর তৎ সংশোধনের সমধিক সম্ভাবনাও আছে।

পঞ্চম, শারীরিক বলবৃদ্ধি। এই বিষয়টিতে এ দেশীয়দিগের অত্যন্ত অসঙ্গতি আছে, সর্ব্ব প্রযত্নে এ অসঙ্গতি দূর করা নিতান্ত আবশ্যক, এ অসঙ্গতিটি যাবৎ দূরীকৃত না হইবে, তাবৎ এ দেশীয়েরা প্রকৃত মহত্ত্বলাভে সমর্থ হইবেন না। শারীরিক বলবৃদ্ধি ব্যতিরেকে সাহসাদি বৃদ্ধি সম্ভাবিত নয়। যে জাতির সাহস নাই, তাহার সত্তা বিড়ম্বনা মাত্র। এই শারীরিক বল বৃদ্ধির উপায় করা অতিশয় আবশ্যক। গবর্ণমেণ্ট ও এদেশীয় লোক উভয়কেই তদ্বিষয়ে যত্নশীল হইতে হইবে। সে উপায় এই, গবর্ণমেণ্টের নিজের বিদ্যালয় হউক, আর সাহায্যকৃত বিদ্যালয় হউক, সর্ব্ব স্থলেরই বালকদিগের ব্যায়াম শিক্ষার নিয়ম করিয়া দিয়া উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে; বিদ্যালয়ের অন্য অন্য কার্য্যের ন্যায় তাহারও তত্ত্বাবধান ও উৎসাহাদি দান করিতে হইবে; বালকদিগের কৃতবিদ্য হইয়া বিদ্যালয় হইতে বাহির হইবার সময়ে কিছু দিন তাহাদিগকে অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বালকেরা যদি এইরূপে শারীরিক বলসম্পন্ন, কৃতবিদ্য ও শিক্ষিতাস্ত্র হয়, ভারতবর্ষ আর একটী নূতন শ্রী ধারণ করিবে সন্দেহ নাই। এই চেষ্টা কখন নিষ্ফল হইবে না, কয়েকটী মহৎ ফল লাভ হইবে সন্দেহ নাই। আপদ উপস্থিত হইলে এদেশীয়েরা কেবল যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইবেন এরূপ নহে, গবর্ণমেণ্টেরও সবিশেষ সহায়তা করিতে পারিবেন· বিশেষ লাভ এই, তখন আর ইঁহারা ভীরু, অসার ও অপদার্থ বলিয়া উপেক্ষিত হইবেন না।

সোমপ্রকাশ, ২৭ শ্রাবণ, ১২৬৯ (১১ আগষ্ট, ১৮৮২)

ভারতবর্ষের শিল্প ও বাণিজ্য

অল্প দিন হইল মার্সেলিস নগরে "মেসেজারিস ইম্পিরিয়াল" নামক বাষ্পীয় জাহাজ কোম্পানির বার্ষিক কার্য্যারম্ভ দিবসে ফরাসী রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান কার্য্যকারক বলিয়াছিলেন দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সের যে প্রকার বাণিজ্য ছিল, এক্ষণে তাহার দেড় গুণের অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে।

ইউরোপ, আমেরিকা, ভারতবর্ষ বিশেষতঃ চীন দেশে ফরাসী বনিকেরা ইংরাজ বনিকদিগের তুল্য; কোন কোন স্থলে বা অধিকতর লাভ করিতেছেন। যে ফ্রান্সে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শিল্পের যৎসামান্য অবস্থা ছিল, তাহা এক্ষণে বস্ত্র ও লৌহ প্রভৃতি বিষয়ে—বিলাস দ্রব্যের ত কথাই নাই,—ইংলণ্ডের সমকক্ষ না হউক, বড় অধিক পশ্চাতে নহে। যে দেশে দশ বৎসর পূর্ব্বে কয়েক ক্রোশ মাত্র রেইলওয়ে ছিল, তাহা এক্ষণে লৌহময় বর্ম্ম দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে। পরিশেষে ফোল্ড মেসেজারিস কোম্পানির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে এই কোম্পানি কয়েকখানি সামান্য জীর্ণ ডাকের গাড়ী ও বাষ্পীয় জাহাজের অধিকারী ছিলেন। ১২৬২ অব্দে ইঁহারা দেড়লক্ষ ক্রোশ পর্য্যন্ত বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ প্রেরণ করিয়া ইংলণ্ডীয় "পেনুনসুলার" কোম্পানির তুল্য দক্ষতা প্রদর্শন করেন। পরিশ্রম, শিল্প, বাণিজ্য ঐশ্বর্য্যাদি যাবতীয় বিষয়েই প্রায় ফ্রান্স সকল সমাজের অগ্রসর হইতেছেন। যাঁহারা রাজা লুই ফিলিপের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ফরাসী ইতিহাস পাঠ বন্ধ করিয়াছেন, তাহারা বর্ত্তমান মহোন্নতি দর্শন করিয়া অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিবেন কোন ব্যক্তি ইহার মূল কারণ, টিয়ার্স, গুজো, লামার্টিন প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞেরা যাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন নাই সে কার্য্য কাহার দ্বারা সম্পাদিত হইল? মসুর ফোল্ত, ইহার উত্তর দান করিয়াছেন। সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইহার কারণ, তিনিই ফ্রান্সের এই অভূতপূর্ব্ব সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিয়াছেন। প্রথম নেপোলিয়ন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান মনুষ্য। ইতিহাস তাহার সমকক্ষ ব্যক্তিকে প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তৃতীয় নেপোলিয়ন সর্ব্বাংশে নিজপিতৃব্যের তুল্য ক্ষমতাশীল নন বটে, কিন্তু তাঁহার সিংহাসনের অযোগ্য নহেন, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে।

এক ব্যক্তির যত্নে যখন এক দেশের এতাদৃশ সৌভাগ্য সম্পত্তি লাভ হইয়াছে তখন ভারতবর্ষ এক বৃহৎ বদ্ধমূল প্রভূশক্তি সম্পন্ন গবর্ণমেণ্টের কর লালিত হইয়াও ইহার অর্দ্ধ সৌভাগ্য লাভে চরিতার্থ হইতেছে না কেন, এই প্রশ্ন স্বতঃই উদিত হইতে পারে। স্বাধীন বাণিজ্য ও শিল্পে উৎসাহ ও মূলধন বিনিযোগে প্রবৃত্তি দান ফরাসী সম্রাটের রাজ্যের উন্নতি লাভের প্রধান উপায়। ভারতবর্ষে সে সকল কোথায়? কোন দেশ আমাদিগের শিল্পের উপরে নির্ভর করিতেছে? আমরা নিজে কোন প্রয়োজনোপযোগী অথবা বিলাস দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিতেছি? আমাদিগের যাহা ছিল তাহাও ক্রমে লোপ

পাইতেছে। কাহার দোষে এরূপ ঘটনা হইতেছে? আমাদিগের দেশের লোকেরাই কেবল দোষী নহেন, ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টেরও এবিষয়ে দোষ আছে। গবর্ণমেন্ট যদি ফরাসী সম্রাটের ন্যায় ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধিকামী হইতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ এত দিন তুলা প্রভৃতির যন্ত্রে পরিপূর্ণ হইত এবং ভারতবর্ষীয়েরা সেই সেই যন্ত্র নির্ম্মাণ ও তাহার কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিতেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে ম্যাঞ্চেষ্টার বিপদাপন্ন হইয়াছেন এই গবর্ণমেণ্ট চতুর্দিক শূন্য দেখিতেছেন, তাঁহারদিগের আর দিগ্বিদিক জ্ঞান নাই। কোথাও তুলোৎপাদন যোগ্য ক্ষেত্র অন্বিষ্ট হইতেছে, কোথাও রেইলওয়ে, কোথাও ট্রামওয়ে, কোথাও বা কন্‌ট্রাক্ট বিলের প্রস্তাব হইতেছে, এইরূপ চতুর্দিকে মহাধূমধাম লাগিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের হিতার্থ গবর্ণমেন্ট কি স্বপ্নেও এ সকল মনে করিয়াছিলেন, এ সকল শিখাইলে কি এদেশীয়েরা শিখিতে পারেন না? যে কোন বিষয় হউক, ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় তাহার শিক্ষা কার্য্যে পটু অতি অল্প লোক আছে।

অনেকে এদেশীয়দিগের বাণিজ্য কার্য্যে পরাঙ্মুখতার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ এই উদাহরণ প্রদর্শন করেন যে এদেশীয়েরা রেলওয়ে প্রভৃতির অংশ ক্রয় করিতে উন্মুখ হন না। ফ্রান্সে কি দ্বাদশ বর্ষপূর্ব্বে এইরূপ অবস্থা ছিল না, কিন্তু এক্ষণে কি এক ফরাসী কোম্পানী সুইজের খাল খননে প্রবৃত্ত হন নাই, ইংরাজ জাতি এই কার্য্যকে অসাধ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন। আর এক ফরাসী কোম্পানি কি রুশীয়ার যাবতীয় রেইলওয়ে করেন নাই? শিক্ষা ও উৎসাহ দান পাইলে এদেশীয়দিগের ইহার কিছুই অসাধিত থাকে না। সকলেই জানেন প্রতিবৎসর এদেশে প্রায় দশ কোটি নগদ টাকা আসিতেছে এই টাকার অধিকাংশ মাড়োয়ারি ও বণিকদিগের সিন্দুকে অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে। গবর্ণমেন্ট যদি মূলধন বিনিয়োগের উৎসাহ দেন, তাহা হইলে এই সকল টাকায় মরিচা পড়ে না। এক্ষণে যে নব্বই কোটি টাকার বাণিজ্য হইতেছে, ভারতবর্ষীয় কয়জন বণিক তাহার অংশী, কেবল বোম্বাইয়ে কয়েকজন পারসী বিদেশে বাণিজ্য করিতেছেন এই মাত্র। এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের সমুদায় বণিককে দোকানদার ও সুদখোর বলিলে হয়। ইউরোপীয় বণিকেরাই সমুদায় বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট কবে যথার্থ উপায় অবলম্বন করিবেন, কবে ভারতবর্ষীয়েরা বিদেশীয় বাণিজ্যের

প্রতি যত্নবান হইবেন, কবে আমরা বণিকদিগকে জাহাজে করিয়া নানা দেশে বাণিজ্য করিতে দেখিব? যে শুভদিনে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বস্ত্র ও লৌহ দ্রব্য প্রভৃতির কল হইতে ধূম বাহির হইবে, সে দিনই বা কতদূর?

কেহ কেহ এস্থলে এই বলিয়া একটি আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, জাত্যাভিমান এদেশীয়দিগের যাবতীয় শিল্পশিক্ষা ও বিদেশে বাণিজ্য কার্য্যের একটি মহান অন্তরায়। কিন্তু আমাদিগের নিকটে এ আপত্তি অখণ্ডনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। স্বার্থলাভ সম্ভাবনা থাকিয়া শিক্ষা ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে ইহারা জাত্যাভিমানকে তাদৃশ গুরুতর জ্ঞান করেন না। মেডিকাল কলেজের কোন্ ব্রাহ্মণ ছাত্র যবনজাতীয় শবচ্ছেদে পরাঙ্মুখ হইতেছেন? কোন্ ব্যক্তি চাকরীর অনুরোধে রেঙ্গুণে গিয়া জাতিভ্রষ্ট হইতেছেন? এ যদি না হইল তবে শিল্প ও বাণিজ্য স্পর্শে জাতি নাশ সম্ভাবনা কি? জাতিনাশ হইবে বলিয়া কয় জন বা তাহাতে বিমুখ থাকিবেন?

সোমপ্রকাশ, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১২৬৯ (৭ ডিসেম্বর, ১৮৬২)

ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধির প্রকৃত পথ কি?

আজিকাল "ভারতবর্ষের ভারতবর্ষ শাসন" ও "ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধন" এই দুই মনোহর বাক্য অনুক্ষণ আমাদিগের শ্রবণ গোচর হইতেছে। ব্যাধের মধুর সংগীত দ্বারা মৃগবশীকরণের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দ্বারা লোককে মোহিত করিয়া স্বার্থ সাধন করিতেছেন। অধিক ক্ষোভের বিষয় এই ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রকৃত পথের আবিষ্করণে অল্প লোককে উন্মুখ দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রকৃত পথ কি, তন্নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, অগ্রে ভারতবর্ষ শব্দের অভিধেয় নির্ণয় আবশ্যক। এস্থলে ভারতবর্ষবাসী লোক বুঝাইতেছে। ভারতবর্ষে এক্ষণে অনেকবিধ লোকের বসতি হইয়াছে, সে সমুদায়ই ভারতবর্ষ শব্দের বাচ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন শ্রীবৃদ্ধির অন্বেষণ করা হইতেছে, তখন তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধির অল্পতা আছে তাহারাই এস্থলে ঐ শব্দের মুখ্য অর্থ। এইরূপে মুখ্যার্থ গ্রহণ

করিলে অন্তভ্য হিন্দু ও মুসলমানেরাই নিঃসংশয় শ্রীবৃদ্ধির লক্ষ্য হয়, ইউরোপীয় ও আমেরিকা প্রভৃতি লক্ষ্য হয় না। কারণ শেষোক্ত ব্যক্তিরা শ্রীবৃদ্ধি শোভিত হইয়া এদেশে আসিয়াছে, বিশেষতঃ এদেশে তাহাদিগের ভাগ অতি অল্পমাত্র দৃষ্ট হয়। সেই অল্প সংখ্য লোকের (৫০ বা ৬০ হাজারের) নিমিত্ত অধিক সংখ্য লোকের (১৮ কোটির) শ্রীবৃদ্ধির উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু কার্য্যে বিপরীতভাব লক্ষ্য হইতেছে। সেই ১৮ কোটির শ্রীবৃদ্ধির নাম করিয়া সেই ৫০ বা ৬০ হাজারের শুভাশুভ সন্ধান করা হইতেছে।

পতিতভূমি বিক্রয় হইলে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, কথা উঠিল; অবিলম্বে তাহা বিক্রয়ের নিয়মাবলী প্রকটিত হইল; কিন্তু সেই বিক্রয় কার্য্য দ্বারা হিন্দু মুসলমান বা ইউরোপীয় কে অধিকতর লাভবান হইলেন? ভারতবর্ষে বাহুল্য পরিমাণ তূলার চাষ হইলে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, কথা উঠিল, তূলোপযোগিণী ভূমি অন্বিষ্ট হইল, চাষ আরম্ভ হইল, তৎ সম্বন্ধে রাস্তাঘাট প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধিত হইতে লাগিল, তাহাতে অধিকতর লাভবান কে হইল? ভারতবর্ষীয়েরা ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই। কন্টাক্ট বিল বিধিবদ্ধ করিলে সহজেই সেই উৎকর্ষ তাহাদিগের হস্তগত হইবে এই ভাণ করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ করিতে চেষ্টা হইল, ষ্টেট সেক্রেটারি তাহার প্রতিবাদী হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার উদ্দেশে "ভারতবর্ষে ভারতবর্ষ শাসন" রব উঠিল, সেই চেষ্টা হইতে লাগিল, যদি সেই চেষ্টা সফল হয়, কে তদ্দ্বারা অধিক লাভবান্ হইবেন? ভারতবর্ষের নীলকর প্রভৃতির সহিত প্রজার সদা বিরোধ হয়, মফস্বলে ছোট আদালত হইল, ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, জল্পনা হইল, স্থানে স্থানে ছোট আদালত প্রতিষ্ঠিতও হইল, কিন্তু তদ্দ্বারা কে অধিকতর লাভবান্ হইলেন? সিবিল সার্ব্বিসের পরীক্ষার দ্বার উদঘাটিত করিয়া ইংলণ্ডে তদগ্রহণ রীতি প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতবর্ষের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, প্রস্তাব হইল, তৎপ্রথা তথায় প্রবর্ত্তিত হইল, কিন্তু তদ্দ্বারা কে সমধিক লাভবান হইলেন?

এস্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ইউরোপীয়েরা কি এদেশীয়দিগকে উল্লিখিত বিষয়ের ফল ভোগ করিতে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন? কেহ এদেশীয়দিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিষয়ের ফলভোগ নিষেধ করেন নাই যথার্থ বটে, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে নিষেধ করা হইয়াছে। ইউরোপীয়েরা এদেশীয়দিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে প্রাধান্য লাভ

করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারাদির উৎকর্ষ নিবন্ধ তাঁহাদিগের অনেক সুবিধা আছে, অতএব তাঁহাদিগের সহিত এদেশীয়দিগের প্রতিযোগিতা হইলে এদেশীয়েরা যে ফলভোগে বঞ্চিত হইবেন সন্দেহ কি? তদ্ভিন্ন কতকগুলি বিষয় কেবল ইউরোপীয়দিগের সুবিধা উদ্দেশ করিয়াই করা হইয়া থাকে, তদ্বারা এদেশের আনুষঙ্গিক যৎকিঞ্চিৎ উপকার লাভ হয় মাত্র। যে যে বিষয় দ্বারা এদেশের শ্রীবৃদ্ধি লাভ সম্ভাবনা আছে তত্তৎবিষয়ে এদেশীয়দিগকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রবর্ত্তিত করা, এবং সেই বিষয়ে ইহাদিগকে শিক্ষা ও উৎসাহ দেওয়াই এদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রকৃত পথ। এদেশে রেলওয়ে হইয়াছে, কিন্তু এদেশীয়েরা আরোহণাদিরূপ তাহার সামান্য ফলবিনা মুখ্য ফলভোগে অধিকারী হইতে পারেন নাই, রেলওয়ে যখন এদেশে হয় নাই, ইঁহারা কল প্রভৃতির নির্ম্মাণ ও চালনাদি বিষয়ে তখন যেমন অনভিজ্ঞ ছিলেন, এখনও সেইরূপ রহিয়াছেন।

১১/১২ বৎসর হইল এদেশে রেলওয়ে হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত এদেশের কয়জন লোকে কয়খানা কল প্রস্তুত করিয়াছেন, এদেশের কয়জন লোকে শকট চালক হইয়াছেন, এদেশের কয়জন লোকে গার্ডের কাজ শিখিয়াছেন। একেতো এদেশের লোকে সহজে আলস্যশয্যা পরিত্যাগ করিয়া শ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে উন্মুখ নহেন, তাহাতে আবার কাহার উৎসাহ দেওয়া নাই, প্রত্যুত অনুৎসাহ দেওয়া আছে। এদেশীয়েরা তত্তৎ কার্য্যে সমর্থ হইবেন না বলিয়াই অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যাহার বুদ্ধি আছে, তাহাকে শিখাইলে পারে না, এ কিরূপ কথা? শিক্ষা ও কাজ না করিলে কি কখন কাহার বুদ্ধি মার্জনা, শরীর সাহস ও বল বীর্য্যাদির বৃদ্ধি হয়, রেল গাড়ীর কল ও তদুপ-করণ ইংলণ্ডে প্রস্তুত হয়, আর এখানে প্রস্তুত হইতে পারে না, ইহা বুঝিয়া লওয়া সহজ নহে। চেষ্টার অসাধ্য কোন্ কর্ম আছে? এদেশে চেষ্টা নাই বলিয়া সমুদায় বিষয়েরই অসঙ্গতি। বাঙ্গালিরা যে যে কারুক্রিয়া করিতে পারেন, সাঁওতালেরা কি তাহা করিতে সমর্থ? তাহাদিগের সে অসামর্থের কারণ কি, তাহাদিগের শিক্ষা ও চেষ্টা নাই। এদেশে তুলা জন্মিতেছে, কিন্তু সে তুলা ইংলণ্ডে গিয়া সূত্র ও বস্ত্র হইয়া আসিতেছে, গতায়াতের জাহাজ ভাড়া লাগিতেছে; এদেশীয়েরা কেবল মজুরী করিয়া তাহার উৎপাদন করিতেছেন মাত্র, সেই তুলার প্রকৃত ফলভোগী হইতে পারিতেছেন না। এদেশে তুলা জন্মিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া গেল, তাহাতে এদেশের কি শ্রীবৃদ্ধি হইল, এদেশীয়-

দিগের মজুরীলাভ, ইহাই কি শ্লাঘনীয় শ্রীবৃদ্ধি? এদেশীয়েরা কি তুলা পরিষ্কার করিবার ও বস্ত্র প্রস্তুত করিবার কল করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, ইহঁারা কি সেই কল দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন, এদেশে সেই কল প্রস্তুত করিলে এবং ইহাদিগকে সেই কল প্রস্তুত করিতে শিখাইলে কি এদেশের মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইত না? .

আমরা উপরে উদাহরণ স্বরূপ কেবল কয়েকটি বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলাম, এদেশীয়দিগকে কাজে প্রবর্ত্তিত করিবার শিক্ষা দিবার অনেক বিষয় আছে, ইহঁারা যাবৎ সেইগুলি স্বয়ং ও স্বহস্তে সম্পাদন করিতে সমর্থ না হইবেন, তাবৎ এদেশের সম্যক শ্রীবৃদ্ধি লাভ সম্ভাবনা নাই। গবর্ণমেণ্টের যে তত্তদ্বিষয়ে শিক্ষাদান ও উৎসাহদানের ভার, সে কথা বলা বাহুল্য। পিতাই পুত্রদিগকে শিক্ষা দানভার গ্রহণ করেন। যে পিতা স্বয়ং পণ্ডিত হন, তিনি কখন পুত্রকে অজ্ঞানাচ্ছন্ন দেখিয়া নিবৃত্ত হইতে পারেন না। আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট যদি অজ্ঞ হইতেন, আর এদেশীয়েরা শিক্ষা রসজ্ঞ হইতেন, আমরা তাঁহাদিগকে উত্তেজনা করিতাম না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এ দেশের শিক্ষা, রক্ষা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েরই ভার গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সেই গৃহীত ভারোচিত কার্য্য না করিলে তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান জন্য প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে।

সোমপ্রকাশ, ১৯ ফাল্গুন, ১২৬৯ (২ মার্চ, ১৮৬৩)

"চকোরি লাজেতে কিম্বা অন্য অনুরোধে
দিবেন অবশ্য ভিক্ষা সাধে কি অসাধে।"

ভারতবর্ষ লইয়া কি করিবেন, ইহা এক্ষণে চিন্তাশীল রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজেরা ভাবিয়া থাকেন। যাঁহারা এতদ্দেশে আইসেন তাঁহারা ভারতের শোভা, উৎপাদিকা শক্তি, বৃহত্ত্ব প্রভৃতি দেখিয়া ও কর্ত্তৃত্বের সুখভোগ করিয়া বলিয়া ফেলেন যে তাঁহারা ভারতবর্ষ এজন্মে পরিত্যাগ করিবেন না। কিন্তু চিন্তাশীল ইংরাজেরা তাহা বলিতে পারেন না। তাঁহারা দেখিতেছেন ভারতবর্ষ অনান্য সভ্য দেশের ন্যায় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, কিছুকাল পরে ভারতবর্ষীয়দের সহিত আর তাঁহাদের সহিত কিছুমাত্র বিভিন্নতা থাকিবে না, তখন তাহারা কি বলিয়া এদেশে আধিপত্য করিবেন, তাঁহারা এ প্রত্যাশা

করেন না শুদ্ধ সুশাসন দ্বারা ভারতবর্ষীয়দের পরাধীনতার ক্ষোভ নিবারণ করিবেন, আর দেশে আধিপত্য করিতে গেলেই বা সুশাসন কেমন করিয়া চলে।…

ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে সম্পূর্ণরূপে মিশিবার কোন সম্ভাবনা নাই। উহা ইংরাজেরাও ইচ্ছা করেন না, এতদ্দেশীয়েরাও ইচ্ছা করেন না। একপক্ষে অনিচ্ছা থাকিলেই এ রূপ মিলন হয় না, তাহাব সাক্ষী আয়রলাণ্ড, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের এতদূরে। ফল ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ মিলনে কাহার লাভ নাই, উভয়ের ক্ষতি এবং এরূপ মিলন অসম্ভব। তবে অষ্ট্রেলিয়ায় যে ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপিত হইতেছে সেরূপ এদেশে সাজে না। আর তাহা হইলে ও কোন গোল ছিল না; অষ্ট্রেলিয়া একটি বিস্তীর্ণ জনশূণ্য মাঠ, এখানে লোক ধরে না। সেখানে ইংরাজেরা বাস করিয়া উন্নতি করিতেছেন, এখানে বাস করিলে নিশ্চিত অবনতি।…

এদেশ যে তাঁহারা চিরকাল বাখিবেন সে আশা চিন্তাশীল ইংরাজেরা করেন না।… তখন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক ইংরাজেরা ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন। ভারতবর্ষে ··বল ধরিতে গেলে, ইংলণ্ডের এদেশে বিক্রম দেখাইবার সাধ্য নাই। এখন এতৎদ্দেশীয়েরাই ইংরাজদিগের সহায়, বল ও পরিচয়। যখন এদেশস্থ একটি রাজ্যের সহিত বিবাদ হয়, তখন ইংবাজদিগের প্রধান সহায় ঐ রাজ্যের প্রতিবাসিগণ। অতএব যখন দেশ হইতে এই অবস্থাটি অন্তর্হিত হইবে, যখন সকলে একবাক্য হইয়া স্বাধীনতা প্রার্থনা করিবে, তখন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক এদেশ ত্যাগ কবিতে হইবে। ভারতবর্ষ একদিন কাল স্বাধীন হইবে তাহাতে চিন্তাশীল ইংরাজেরা কিঞ্চিৎ সন্দেহ করেন না। তবে আইজ কি কালি, এশতাব্দী কি অন্য শতাব্দীতে।

অমৃতবাজাব পত্রিকা, ৫ চৈত্র, ১২৭৬ (১৭ মার্চ, ১৮৭০)

হিন্দু সমাজ

জাতি বিচার ক্রমে ক্রমে উঠাইবার পন্থা আমাদের সমাজেই আছে, তাহা কি জান? যেন জাতি বিচার অন্যায়, ইহা সাব্যস্ত হইল। তবে আমাদের

দেশে আর একটি ইহা অপেক্ষা গুরুতর অন্যায় দেখাইয়া দিতেছি। ইংরাজেরা ভিন্ন দেশী, তাহারা আমাদের দেশ শাসন করিতেছেন, এটি ভারি গর্হিত কর্ম। এটি যাহাতে যাইয়া এদেশে সাধারণতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপিত হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। তাহা যদি হইল, তবে এরূপ অন্যায় কার্যে উৎসাহ দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নয়। কলেক্টারিতে খাজনা দিও না, আদালতে মকদ্দমা করিও না, মহারাণীর নামাঙ্কিত মুদ্রা ব্যবহার করিও না, ইহাতে তোমার কষ্ট হইবে, সংসারে থাকা দুষ্কর হইবে, তাহা হউক। কর্ত্তব্য-কর্ম সাধন অবশ্যই করিতে হইবে। শুদ্ধ ইহা করিলে চলিবে না, ওহাবীদিগের ন্যায় জেহাদ প্রচার করিয়া বেড়াও, বন্দুক ধর, যুদ্ধ কর, ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দাও। পারিয়া উঠিবা না? তাহাতে কি? তোমার কর্ত্তব্য সাধন কর। ইংরাজগণকে তাড়াইতে অরাজকতা হইবে, দেশ উচ্ছিন্ন যাইবে, তাহাতেই বা তোমার কি? ফল দেখিবার অধিকার তোমার নাই, তাহা ঈশ্বর দেখিবেন।

…হিন্দু সমাজ ধরিয়া এক্ষণ টান দাও, উহা উপড়াইতে পারিবা না, আর যদি একেবারে উপড়াইয়া ফেলিয়া দাও, তবে তাহার স্থানে কি সন্নিবেশিত করিবে, তাহার সাব্যস্ত আগে করা উচিত।

অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১২৭৭ (৮ ডিসেম্বর, ১৮৭০)

একজন মনুষ্যের বল

শ্রীচৈতন্য, নেপোলিয়ান, মহাম্মদ—যাঁহারা স্বীয় ক্ষমতাবলে লোক সংগ্রহ করেন, ক্ষমতা অধিকার করেন ও পরে পৃথিবী কম্পিত করেন, যদি এইরূপ এক একটী ক্ষণজন্মা লোক এখন আমাদেব থাকিতেন তবে আমাদের দেশের অবস্থা এরূপ থাকিত না. স্বাধীন অবস্থা প্রাপ্ত হইত। যুদ্ধ করিয়া যে ভারতবর্ষ ইংরাজদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইবার যো আছে তাহা আমাদের বোধ হয় না। যুদ্ধ করিয়া আমাদের দেশ লওয়া একপ্রকার সাধ্যাতীত হইয়াছে, কারণ আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নাই, উহা সংগ্রহ করিবার কোন উপায় নাই। গবর্ণর জেনারেল ও ষ্টেট সেক্রেটারিতে তাড়িত বার্তাবহ যোগে এখন দিবা রাত্র কথাবার্তা চলিতে পারে, লৌহ পথে ভারতবর্ষ খচিত হইয়াছে……অতএব

যুদ্ধ করিয়া আমাদের স্বাধীনতা লাভ করিতে আসা বিড়ম্বনা মাত্র। যদি আমরা কখন স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি সে অন্য উপায়ে, যুদ্ধ করিয়া নহে। ভারতবর্ষীয়দিগের স্বত্ব অপহরণ করিয়া ইংরাজ জাতি এখন পরম সুখে ভারতবর্ষ ভোগ করিতেছেন। এই স্বত্বের এক একটী আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, ও প্রত্যর্পণ করিয়া ইংরাজ জাতি দেখিবেন যে, ভারতবর্ষ রাখিয়া আর তাঁহাদেব কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতি হইতেছে তখন কাজেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করা তাঁহাদের স্বার্থ হইবে ও আমরা স্বাধীন হইব। ইংরাজেরা যাহা বলুন আমরা যে একদিন কাল স্বাধীন হইব, ইহা আমাদের মনে বলে, আর কি ঈশ্বরের কাছে আমরা এত অপরাধী যে পৃথিবীর মধ্যে কেবল আমরাই পরাধীন থাকিব? উপরে যে হেতুর কথা উল্লেখ করা গেল ঐ হেতু যে আমরা স্বাধীন হইব আমাদের আপাতত ইহাই বোধ হয়।

কিন্তু ততকাল অপেক্ষা না করিয়া আমরা যদি এখনও একজন উপযুক্ত লোক পাই তবে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি। তাহা না হউক, প্রায় স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি। ··যত লোকের নাম উল্লেখ করিলাম তাহাদের ন্যায় বড় লোক হওয়ারও প্রযোজন নাই। সাধারণ অপেক্ষা একটু বড, একটু উৎসাহ বেশী, একটু বুদ্ধি, একটু দাঢ্যতা বেশী ও একটু নিস্বার্থতা বেশী এরূপ একজন লোক। ভারতবর্ষের প্রতি এখন যত অত্যাচার হইতেছে তাহার অধিকাংশ হইতে উহাকে অব্যাহতি দিতে পাবেন। · আমরা আর কোনরূপ স্বত্ব চাই না। ইংলণ্ড আমাদিগের নিজেব একটী পারলিয়ামেণ্ট দিউন।

অমৃতবাজার পত্রিকা, ২৬ শ্রাবণ, ১২৭৮ (১১ আগষ্ট, ১৮৭১)

হিন্দু ও মুসলমান

মুসলমান ও বাঙ্গালী

গত জনসংখ্যা (গণনা) দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে যে বাঙ্গালার মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা হিন্দু অপেক্ষা বিস্তর অধিক। এই মুসলমানেরা ভিন্ন দেশবাসী নয়, ইহাঁরা ইংরাজ বণিক কি কর্মচারীদিগের ন্যায় কিছুদিন এখানে অবস্থিতি করিয়া অন্যত্র গমন করেন না। ইহাঁদের গৃহ সম্পত্তি সহায় আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব, সমুদয় এদেশে। ইহাঁরা এখানে জন্মগ্রহণ করিয়া এখানেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। শুদ্ধ ইহা নহে। ইহাঁরা হিন্দুসমাজের মজ্জাগত হইয়াছেন। এদেশীয় যত শ্রেণীর লোক আছে সকল শ্রেণীতেই মুসলমান প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এদেশে মহামারী উপস্থিত হইলে, তাহারা আমাদের ন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হন, বিপ্লব হইলে আমাদের ন্যায় বিপদে পড়েন। এদেশের উন্নতি হইলে সেই সঙ্গে ইহাঁরাও উন্নত হন, সুতরাং সংখ্যা অনুসারে যদি গণনা করা যায় তবে বাঙ্গালা হিন্দু কি মুসলমানদিগের দেশ সেবিষয়ে সাব্যস্ত করা কঠিন। তবে এদেশ যে উভয়েরই এবং উভয়েরই এদেশের উন্নতি অবনতির সঙ্গে ক্ষতি বৃদ্ধি হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত এদেশের উন্নতি করিতে হইলে যে উভয় মুসলমান ও বাঙ্গালীর ঐক্যবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য যে বিষয়ে বলা বাহুল্য।

পূর্ব্বে মুসলমান ও বাঙ্গালীর অবস্থার যত তারতম্য থাকুক, এক্ষণ আমরা সকলেই পরাধীন. সকলেই সমান দুরবস্থাপন্ন। যখন মুসলমানদিগের সুখের সময় ছিল, তখন তাঁহারা আমাদিগকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করিতেন, আমরাও তাঁহাদিগকে ঈর্ষা ও দ্বেষ করিতাম, কিন্তু এখন তাঁহারাও দাস আমরাও দাস, যে শৃঙ্খলে তাঁহাদের হস্ত আবদ্ধ আছে আমাদের হস্ত সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ রহিয়াছে, যে বেত্রের আঘাত দ্বারা আমাদের পৃষ্ঠের চর্ম খণ্ড খণ্ড করা হয়, তাঁহারাও সেই বেত্রাঘাতে রক্তাক্ত কলেবর হন, আমরাও যে ইংরাজদিগের নিকট কম্পিত কলেবর হইয়া করজোড়ে দণ্ডায়মান হই, তাঁহাদেরও সেখানে সেই অবস্থাপন্ন হইতে হয়, সুতরাং পূর্ব্বে অনৈক্যের যে কারণ ছিল এক্ষণ আর

তাহা নাই, মুসলমানেরা আমাদিগকে ঘৃণা করেন, তাঁহাদের এখন সে সুখের দিন আর নাই, প্রত্যুত বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি দ্বারা হিন্দু বাঙ্গালিরা অনেক উন্নত হইয়াছেন। এখন মুসলমানেরা আমাদিগকে ঘৃণা করেন না, আমাদিগকে যত্ন ও আদর করেন, আমরা তাঁহাদের সঙ্গে মিশিতে গেলে তাঁহারা আদর-পূর্বক আমাদিগকে গ্রহণ করেন।

বাঙ্গালিরা দীর্ঘকাল হইতে দাস, মুসলমানেরা একশত বৎসরের কিছু অধিক পরাধীন হইয়াছেন। বাঙ্গালিরা নিরীহ, সহিষ্ণু, তেজহীন, আবার মুসলমানেরা উগ্র, অহংকারী, অভিমানী এবং তেজীয়ান; সুতরাং অবস্থা অবনতির নিমিত্ত আমরা যত কষ্ট পাই, ইহাঁরাও সম্ভবতঃ তাহার সহস্রগুণ কষ্ট সহ্য করেন। মুসলমানদিগের একটি বিশেষ গুণ আছে এবং কেবল এই গুণটী না থাকায় আমাদের দুর্দশা। ইহাঁরা ঐক্যবদ্ধ হইতে জানেন, ইহাঁদের অধ্যবসায়, উৎসাহ, জীবন আছে, ইহাঁরা যে কোন কাজে আগ্রহের সঙ্গে প্রবেশ করিতে পারেন এবং প্রবিষ্ট হইয়া নিস্বার্থভাবে ও ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহা সমাধা কবিবার যত্ন করেন। নীল বিদ্রোহেব প্রধান প্রবর্তক মুসলমান প্রজারা। অনেক মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে দমন করিয়া নীল বুনাইবার নিমিত্ত ফাটকে দিয়া অনাহারে রাখিয়াছিলেন, অনেক কুঠিয়ালগণ তাহাদিগকে যতপরনাস্তি কষ্ট দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা নীল বুনিবে না যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে তাহা কোন মতেই পবিত্যাগ কবিয়াছিলেন না। এই সময় একদিন লেপটেনেন্ট গবর্ণব নৌকা যোগে গোড়াই নদী দিয়া গমন করিতে-ছিলেন। নদীব দুই ধারে অসংখ্য প্রজা উচ্চৈঃস্বরে নীলের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে। তিনি ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া গমন করিতে থাকেন। প্রজারা গবর্ণরের তাচ্ছিল্য দেখিয়া জলে ঝম্প প্রদান করিল। গোড়াই নদী ভয়ানক, তাহার স্রোতের বেগে ষ্টিমার স্থিরভাবে গমন করিতে পারে না, আবার কুম্ভীরে পরিপূর্ণ। কূল এত উচ্চ এবং অসমান যে যত্নপূর্বক কেহ নদী হইতে উপরে উঠিতে পারে না। প্রজারা ইহা লক্ষ্য না করিয়া প্রাণের শঙ্কা কিছুমাত্র না করিয়া এই ভয়ানক নদীতে ঝম্প প্রদান করিল। গবর্ণর নৌকা হইতে দেখিলেন শত শত প্রজা জলে ঝম্প দিয়া তাহার নৌকাভিমুখে গমন করিতেছে এবং দেখিয়া অবাক হইলেন। তিনি আর গমন করিতে পারিলেন না। তিনি কূলে নৌকা লাগাইলেন, প্রজারা আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল,

আপনাদিগের দুঃখের কাহিনী বলিল, তিনি সমুদয় শুনিলেন এবং প্রজার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন।

পাবনার গোলযোগও মুসলমান প্রজারা আরম্ভ করিয়াছে এবং সেখানে অধিক মুসলমান, সেই জেলায় প্রজারা এইরূপ ঐক্যবদ্ধ হইয়া জমিদারের সঙ্গে বিবাদ করিতেছে। সেদিন কলকাতার গাড়োয়ানগণের জোঠ কি অদ্ভুত বিষয়।

একদিনে এক একজন মুসলমানের যত্নে ইহারা সমুদয় ঐক্যবদ্ধ হইল। যে জাতির এই গুণ আছে লক্ষ্মী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন না। সৌভাগ্য তাহাদিগকে বিস্মৃত হন না। মুসলমানদিগের এই গুণের সঙ্গে যদি আমাদিগের বুদ্ধি কৌশল একত্রিত করা যায়, তাহাদের উগ্রতা যদি বাঙ্গালিদিগের বিবেচনা, বুদ্ধি ও শান্তস্বভাবের সঙ্গে একত্রিত করা যায়, তবে আমরা যাহা প্রার্থনা করিব ঈশ্বর সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন। স্থানীয় যে সমুদয় সভা হইতেছে তাহারা যেন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মুসলমান ও বাঙ্গালির সদ্ভাব ও ঐক্যতা যাহাতে হয় তাহার যত্ন করেন, তাহা হইলে দেশের বিশেষ মঙ্গল করিবেন।

অমৃতবাজার পত্রিকা, ৮ কার্তিক, ১২৮০ (২৩ অক্টোবর, ১৮৭৩)

হিন্দু ও মুসলমান

হিন্দুরা যদিও বিদেশীয় তথাচ ইহারা এত দীর্ঘকাল এখানে আসিয়াছেন যে তাহাদের স্মরণও নাই যে তাহারা অপর দেশ হইতে এখানে আগমণ করিয়াছেন, তাহারা যে স্থান হইতে প্রথম এখানে অবতীর্ণ হন তাহারও নাম ও চিহ্ন জগত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের এখনও স্মরণ আছে যে তাহারা বিদেশী, তাহারা যে স্থান হইতে প্রথম এখানে অবতীর্ণ হন, যে জাতি হইতে তাহারা উৎপন্ন সে সমুদয় এখনও জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। তাহাদের ধর্মের ও তীর্থের স্থান এখনও বিদেশে এবং হিন্দুস্থানে তাহারা এখনও কতক বিদেশীভাবে অবস্থিতি করেন।...ভারতবর্ষের প্রতি এখনও তাহাদের (এখানে ফিরিঙ্গিদের কথা বলা হয়েছে) মমতা জন্মে নাই। এই

তিন জাতির ভারতবর্ষে অবস্থিতি এবং যতদিন এই তিন জাতির মধ্যে ঐক্য না হইতেছে ততদিন দেশের উদ্ধার নাই।

ইংরাজেরা যখন ভারতবর্ষ অধিকার করেন···তখন এখানে মুসলমান ও হিন্দুরা বাস করিতেন। ইংরাজেরা ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া কেবল হিন্দুদিগের উপর আধিপত্য সংস্থাপন করেন না, মুসলমান ও হিন্দুর এক দশা হয়। হিন্দু মুসলমান উভয়ই ইংরাজাধীনে আইসেন। উভয় জাতিই ইংরাজ রাজ্যের প্রজা হন। ইংরাজ অধিকারে যে মঙ্গল ও অমঙ্গল হইয়া থাকে তাহা উভয়ই ভোগ করেন।

ফিরিঙ্গিরা এ দেশকে এখন স্বদেশ জ্ঞান করেন না, কিন্তু তাহারা যদি সুবোধ হন তবে তাহারা দেখিতে পাইবেন এ দেশ ভিন্ন তাহাদের আর উপায় নাই। ইংরাজেরা তাহাদিগকে কখনই সমাজে স্থান দিবেন না।···কিন্তু তাহারা যদি আমাদের সঙ্গে যোগ দেন তাহা হইলে আমরা তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করি। ভারতবর্ষের ভারি দুরবস্থা। দেশের উন্নতি করা এখন সর্বপ্রধান কাজ। · আমরা দেশের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহাদের প্রতি আত্মীয়তা দেখাইতে প্রস্তুত আছি।·····তাহাবা (ফিরিঙ্গিরা) আমাদের ন্যায় নরলোকের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে ঘৃণা বোধ করিতে পারেন, কিন্তু মুসলমান ও হিন্দু ইহাদের ত আর এদেশ ভিন্ন গতি নাই। তাহারা কেন পরস্পর বিবাদ করিয়া দেশের অনিষ্ট করেন। ইংরাজেরা শুধু বাহুবলে দেশ জয় করেন না। এদেশ অধিকার করার তাহাদের প্রধান কৌশল ঘরোয়া বিবাদ করিয়া দেওয়া। ঘরোয়া বিবাদ বাধাইয়া দিযা ইংরাজেরা এখানে প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন এবং সেই কৌশল অবলম্বন করিয়া এই সুদীর্ঘ রাজ্য শাসন ও এই কোটী কোটী লোককে সহজে যন্ত্রের ন্যায চালনা করিতেছেন। মুসলমানদিগের সঙ্গে হিন্দুদিগের আন্তরিক সৌহৃদ্যতা কখনই ছিল না। ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া ইহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন এবং যেদিন তাহারা ইহা দেখেন সেই দিন তাহারা ভারতবর্ষ অধিকার বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। তাহাবা ক্রমে দেশ লইয়াছেন এবং এই বিবাদ জীবন্তভাবে রাখিয়া এখানে সুখসাগরে ভাসিতেছেন। তাহাদের এ বিবাদে স্বার্থ আছে। তাহারা এই বিবাদ বাধাইয়া, বিবাদ জীবন্তভাবে রাখিয়া তাহাদের বুদ্ধির বিস্তার ও রাজকৌশলের পরিচয় দেন। আমাদের অনিষ্ট না হইত এবং আমাদের রাজপুরুষেরা তাহাদের এইরূপ রাজনীতি কৌশলের পরিচয় না দিতেন তাহাতে আমাদের

আপত্তি ছিল না, কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই যে ইহাতে আমাদের কিছু ক্ষতি হয়। সে যাহা হউক আমরা আত্ম কলহের বিশিষ্ট ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। দেশ গিয়াছে, ধনমান সমুদয় গিয়াছে, দেশের দুর্দশার শেষ হইয়াছে। আর বিবাদ করিয়া কাজ কি? মুসলমানেরা একাকী ভারতবর্ষে রাজ্য না করিতে পারেন, কি হিন্দুরা একাকী ভারতবর্ষ রাজ্য না করিতে পাবেন, কিন্তু এই দুই জাতি যদি সৌহৃদ্যতা সূত্রে আবদ্ধ হন তবে উভয় জাতির অনেক অভাব দূর হয়। হিন্দুরা বুদ্ধিমান, কৌশলী; মুসলমানেরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও বৈরী বিদ্বেষী; মুসলমানেরা উৎসাহী তেজিয়ান, তীব্র স্বভাব; হিন্দু শান্ত ধীর ও বিবেচক। একটি জাতি সৃষ্টি হইতে যে সমুদয় উপকরণ প্রযোজন তাহা ভারতবর্ষে সমুদয় আছে। একত্রিত হইলে অচিরাৎ দেশের উন্নতি হইতে পারে। ...পৃথিবীতে এখন বিদ্যা বুদ্ধি ও বাহুবল সকল বিষয়ই সমানভাবে রাজ্য করিতেছে। সুতরাং ইংলণ্ড কোন বিষয়ে পরাংমুখ হন না। আমাদের দেশে ইহার সকল বিষয়ের অভাব, হিন্দুদিগের স্বভাবগত কতক অভাব, মুসলমানদিগের স্বভাবগত কতক অভাব, আবার অধীন অবস্থায় পতিত হইয়া আমাদের কতক অভাব হইতেছে। হিন্দু ও মুসলমান ঐক্য হইলে ইহার অনেক অভাব দূব হইবে।

অমৃতবাজাব পত্রিকা, ৪ অগ্রহায়ণ, ১২৮১ (১৯ নভেম্বব, ১৮৭৪)

কৃষকের সমস্যা

BENGAL BRITISH INDIA SOCIETY*

এতৎ সভার সব কমিটির দ্বারা এতদ্দেশীয় ভূমিকর্ষকদিগের অবস্থা বিষয়ক এক-এক প্রশ্ন প্রস্তুত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইতেছে ; আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক ঐ সকল প্রশ্ন নিম্নে প্রকাশ করিলাম, বোধ করি যে সকল মহাশয়দিগের নিকট এই সকল প্রশ্ন প্রেরিত হইবেক তাঁহারা ইহার সদুত্তর দানে বিশেষ যত্ন করিবেন।

(১) রাইয়তদিগের মধ্যে খোদকস্তা প্রভৃতি কত প্রকার বিভেদ আছে এবং ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন রাইয়তেরদের পাট্টাতে কিরূপ প্রভেদ হইয়া থাকে এবং তদনুসারে ভূমির উপর তাহাদিগের মধ্যে কাহার কিরূপ সত্ব থাকে ?

(২) যাহারা রাইয়তদিগের মধ্যে জমী বিলি করিয়া লয় এমত কোন পেটাও রাইয়ত আছে কিনা ? যদি থাকে তবে তাহারা কত প্রকার এবং ভূমিতে তাহাদের কিরূপ সত্ব ?

(৩) জেলার মধ্যে শালি শুনো প্রভৃতি কত প্রকার ভূমির ভেদ হইয়া থাকে ?

(৪) ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমিতে কি কি ফসল ও বৎসরের মধ্যে কত ফসল হয় ?

(৫) রাইয়তেরা আপনাদের জমী স্বয়ং আবাদ করে কিনা যদি তাহারা স্বয়ং না করে তবে ঐ সকল জমী কাহারা আবাদ করে স্বয়ং কৃষিকারক রাইয়ত অধিক কিম্বা অন্যের দ্বারা কৃষিকারি রাইয়ত অধিক ? আর দুই প্রকার রাইয়তের মধ্যে কোন প্রকার রাইয়ত কত গুণ অধিক ?

(৬) উক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমিতে শালিয়ানা গড়ে কত ফসল উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ঐ শস্য বাজারে গড়ে কি মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে ?

(৭) যে সকল রাইয়ত স্বয়ং ভূমির আবাদ না করে সে স্থলে কৃষিকারককে কত বেতন অথবা উৎপন্ন শস্যের কতভাগ দিতে হয় ?

(৮) উক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জমীর প্রত্যেক বিঘা আবাদ করিতে কত খরচা পড়ে ?

---

* মূল প্রবন্ধে এই শিরোনাম থাকায় সেটি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

(৯) ভূমি সকল প্রস্তুতাবধি শস্য উৎপন্ন করিয়া বিক্রয় পর্য্যন্ত কি কি খরচ পড়ে তাহার বিশেষ বলিবেন ?

(১০) ঐ সকল ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে রাইয়তদিগের কি কি উপায় আছে ?

(১১) যদি রাইয়তকে কর্জ্জ করিতে হয়, তবে কাহার নিকট কি কি সর্ত্তে কর্জ্জ করিতে হয় ? আর রাইয়তেরা মহাজনী কিম্বা তকাবী দ্বারা অথবা অন্যান্য প্রকারে যেরূপে টাকা সংগ্রহ করে তদ্বিষয়ে আপনি যাহা জানেন তাহা বলুন।

(১২) উক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভূমির প্রতি শলিয়ানা খাজনা কত ? বিঘাতে রাইয়তকে বা কত দিতে হয় এবং পেটাও রাইয়তকে (under-tenants) কত দিতে হয় ?

(১৩) জমীদার ও তালুকদার ইজারদার প্রভৃতিরা রাইয়তদিগের উপর কত প্রকার কি কি আবওয়ার তলব করিয়া থাকেন, এবং রাইয়তেরা পেটাও রাইয়তদের নিকটই বা কি কি আবওয়াব লইয়া থাকে, আর এই সকল আবওয়াব কে কি প্রকারে আদায় করে ?

(১৪) রাইয়তেরদের দেয় খাজনার সহিত তুলনা আবওয়ারের পরিমাণ কত হইবেক ?

(১৫) রাইয়তেরা খাজানা ও আবওয়াব দিতে বিলম্ব করিলে জমিদারেরা কি প্রকারে কত সুদ লইয়া থাকেন ?

(১৬) রাইয়তেরা জমীদারকে এবং পেটাও রাইয়তেরা রাইয়তকে সেলামি প্রভৃতি কিছু দিয়া থাকে কিনা ?

(১৭) খাজানার উপর কি বিবেচনায় কত সেলামি প্রভৃতি লইয়া থাকে ?

(১৮) খাজানা এবং আবওয়াব সমুদায় দিয়া রাইয়তেরদের গড়ে কি উপসত্ব থাকে, যাহারা স্বয়ং কৃষি করে তাহারাই বা কি পায়, এবং যাহারা অন্যের দ্বারা কৃষি করে তাহারাই বা কি লাভ করিয়া থাকে ?

(১৯) দেখা যাইতেছে ভূমিতে ফসল উৎপাদনার্থে শ্রম ও ব্যয় উভয়েরি আবশ্যক হইয়া আপনকার জেলাতে ব্যয়েতেই বা কত লাভ হয় এবং শ্রমেতেই বা কত মুনফা হয় ইহার প্রভেদ আপনকার জ্ঞানানুসারে এই তালিকায় লিখিবেন।

(২০) একশত রাইয়তের মধ্যে কত জন রাইয়ত শালিয়ানা ১২ টাকা

অবধি ৩০ টাকা পর্য্যন্ত লাভ করে? ৩১ অবধি ৬০ টাকা পর্য্যন্ত, ৬১ অবধি ১০০ টাকা পর্য্যন্ত, ১০০ অবধি ২০০ টাকা পর্য্যন্ত, দুই শতাধিক কত।

(২১) রাইয়তেরা কি প্রকার আহারাদি করিয়া থাকে ও কি রূপ অবস্থায় থাকে এবং তাহাদের মধ্যে এক এক ব্যক্তির কত ব্যয় পড়ে?

(২২) রাইয়তেরদের ব্যয়াদি এবং পানাদি বিষয়ে কি প্রকার স্বভাব।

(২৩) রাইয়তেরদের সুরাভিলাষ ও ভোগেচ্ছা কি পর্য্যন্ত আছে তাহা আপনি যত জানেন তাহা বলুন?

(২৪) রাইয়েতেরা কাহাকেই বা আবশ্যক বলে এবং সুখই বা কাহাকে বোধ করে ও ভোগই বা কাহাকে কহে?

(২৫) ভিন্ন প্রকার ও বিভিন্ন জাতীয় রাইয়তদের মধ্যে কি পর্য্যন্ত বিদ্যা বা জ্ঞানের চর্চা আছে এ বিষয়ে আপনি যতদূর জানেন তাহা সমুদায় বলুন?

(২৬) আপনার বিবেচনায় তাহাদিগের জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্ত উত্তম উপায় কি হইতে পারে?

(২৭) ঐ সকল লোকেরা আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট? এবং অবস্থার উৎকৃষ্টতার জন্য তাহাদের বিশেষ যত্ন আছে কি না?

(২৮) তাহারা অবস্থার উৎকৃষ্টতার নিমিত্ত স্বয়ং কোন উপায় দর্শাইতে পারে কিনা?

(২৯) সামান্যতঃ যেরূপে কাজকর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা উত্তম কৃষির কোন উপায় কখন কোন জমীদার বা রাইয়ত করিয়াছিল কি না?

(৩০) রাইয়তদের জ্ঞানবৃদ্ধি এবং অবস্থার উৎকৃষ্টতা নিমিত্ত কোন জমীদার কখন কোন উপায় করিয়াছিলেন কিনা? যদি করিয়া থাকেন তবে কি পর্য্যন্ত করিয়াছেন আপনি এ বিষয়ের যে যে দৃষ্টান্ত অবগত আছেন তাহা লিখিবেন?

Bengal Spectator, vo II, No 24, July 24, 1843

পাবনা ঃ প্রজা ও জমিদার

পাবনার প্রজা বিদ্রোহ সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় সম্বাদপত্র লেখকগণ নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের সম্বাদপত্রখানি নূতন। যখন ঐ বিদ্রোহ লইয়া বাঙ্গলায় হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল তখন ইহার জন্ম হয় নাই। সুতরাং

তৎসম্বন্ধে আমাদের যে মত তাহা প্রকাশ করিবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই। এক্ষণে সেই সকল মত ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি, বোধ হয় পাঠক বর্গের নিকট তাহা নিতান্ত অনাদরনীয় হইবে না।

প্রধান ২ সম্পাদকগণ প্রায়ই একবাক্য হইয়া প্রজাদিগের দোষ সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কতক দিন ধরিয়া সম্বাদপত্র সকল কেবল রায়তদিগের কুৎসিত কার্য্যকলাপ বর্ণনায় পূর্ণ দেখা যাইত। ডাকাতি, খুন, প্রভৃতি দোষ প্রত্যহই রায়তদিগের উপর আরোপিত হইত। কিন্তু এক্ষণে সকলেরই প্রতীতি হইয়াছে যে কতকগুলি দুষ্ট প্রজা ভিন্ন সাধারণ প্রজাবর্গ কেহই উল্লিখিত কার্য্যে লিপ্ত ছিল না। আমরা একথা বলিতেছি না যে প্রজাগণ একেবারে নিরপরাধী, তাহাদের মধ্যে কেহ২ ঘোর অন্যায় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া ছিল এবং তজ্জন্য তাহারা রাজ বিচারালয়ে দণ্ড প্রাপ্তও হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা রায়তদিগের এই সকল কার্য্য অতি গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের যেন মনে থাকে যে পাবনার প্রজা বিদ্রোহের ন্যায় কাণ্ডে এরূপ ঘটনা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। যে পীড়ন প্রজারা একটি কথা না কহিয়া বহুকাল হইতে সহ্য করিয়া আসিতেছিল কিছু পরিমাণে তাহার প্রতিশোধ করিবে বলিয়া তাহারা ঐরূপ পাপকর্ম্ম সফল করিতে সঙ্কোচ বোধ করে নাই। মনুষ্য কষ্ট সহিষ্ণু বটে। তাহাদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিলে তাহারা কতদুর সহ্য করিবে, কিন্তু সেই দৌরাত্ম্য একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে আর তাহারা তাহা সহ্য করিবে না; তখন তাহা নিবারণের চেষ্টা করিবে এবং যদি দৌরাত্ম্য অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে তবে তাহারা তন্নিবারণ জন্য সাধ্যাতিরিক্ত কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইবে। এই কর্ত্তৃপক্ষগণের দৌরাত্ম্যে কত দেশে কতবার সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে এবং ফ্রান্সে ইহার আতিশয্য ঘটিয়াছিল বলিয়া অধিপতি ষোড়শ লুইকে আপন শোণিত দিয়া প্রজা পীড়ন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। পাবনার প্রজাগণ জমিদারের পীড়নে অস্থির হইয়া যে দুই একটা মন্দ কার্য্য করিয়াছে আমরা তজ্জন্য তাহাদিগকে একেবারে পিশাচ বিবেচনা করিতে পারি না। কারণ সেরূপ কার্য্য তাহাদের ন্যায় অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা কখন কখন করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ নির্ব্বিরোধী বঙ্গ কৃষকশ্রেণী মধ্যে কয়েকজন একত্র হইয়া যে কোন গোলযোগ করিবে ইহা স্বপ্নের অগোচর। কিন্তু নীলকর দিগের দৌলতে ও পাবনার জমিদারদিগের কল্যাণে আমরা তাহাও দেখিলাম, যাহা

হউক, দুঃখী প্রজারা যে আপনাদের উপর দৌরাত্ম্য নিবারণ করিবার জন্য মধ্যে২ একত্র হইতে শিখিয়াছে ইহা দেশের একটি একটি ভাল লক্ষণ বলিতে হইবে।

ইংরাজ শাসন কর্ত্তারা দুষ্ট দমনকারী, যেখানে প্রজাদিগের উপর জমিদারদের অত্যাচার দেখিয়াছেন, সেইখানেই সহায়হীন পক্ষকে আশ্রয় প্রদান করিযাছেন। প্রজারা ইংরাজদিগের আশ্রয়ে বাস করিয়া কথা কহিতে শিখিতেছে; পূর্ব্বের ন্যায় ভূস্বামীগণ কর্তৃক পদদলিত হইলে চুপ করিয়া থাকে না; আর্ত্তনাদ করে এবং সেই আর্ত্তনাদ শাসনকর্ত্তৃগণের কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহাদের কষ্ট বিমোচন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। জমিদারেরা বলেন যে পূর্ব্বে তাঁহাদিগের প্রজাদেব সহিত বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। ইংরাজগণ কর্ত্তৃক দেশে দণ্ড বিধি আইন ও ১৮৫৯ সালের ১০ আইন জারি হইবার পরই সেই সদ্ভাব অন্তর্হিত হইয়াছে। যে সদ্ভাবের অভাব হইয়াছে বলিয়া জমিদারগণ দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, সে কি প্রকার সদ্ভাব? জমিদারে প্রজার উপর অত্যাচাব করিলে, প্রজারা সে কথা কাহারও নিকট কান্দিয়া বলিতে জানিত না, কাজেই অন্যান্য সকলে মনে করিতেন জমিদারে প্রজায় বিলক্ষণ সখ্য রহিয়াছে। এক্ষণে ইংরাজ শাসন প্রসাদে জমিদারদিগের অত্যাচার প্রজারা মুখফুটে দশ জনের কাছে বলিতে শিখিয়াছে বলিয়া জমিদারগণ ইংরাজগণের উপর দোষারোপ করিতেছেন। কিন্তু আমরা পক্ষপাতশূণ্য লোকদিগকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। প্রজারা চিরকাল জমিদারের যথেচ্ছচারাধীন থাকিলে ভাল হয়, না তাহারা মধ্যে২ আপনাদের অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করিলে ভাল হয়? দুঃখের বিষয় এই যে পাবনার প্রজাদিগের সেই চেষ্টা কতকটা বিদ্রোহ ভাব ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু যদি যথার্থ তাহারা জমিদারগণ কর্ত্তৃক যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইয়া থাকে তবে তাহাদিগের বিদ্রোহাচরণ কি কতকদূর মার্জ্জনীয় নহে?

এক্ষণে দেখা যাক কি করিলে জমিদারে প্রজায় মনের মিল হয়। কেহ কেহ বলেন জমিদার ও প্রজা অতি পবিত্র শৃঙ্খলে পরস্পর আবদ্ধ। তাহাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, বিদেশী গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া সেই বিরোধ মিটাইতে যাইলে সেই পবিত্র শৃঙ্খল কলুষিত হইয়া যাইবে। আমরা এই বাক্যের অনুমোদন করি না। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে মধ্যস্থ না হইলে আর কে

হইবে? তোমার আমার ত কাজ নয়। আমরাই বিবাদ করিতেছি আমরা মিটাইতে পারিব কেন?

যাহাই হউক প্রজাদিগের অসন্তোষ নিবারণ জন্য গবর্ণমেণ্ট আশু কোন উপায় অবলম্বন করুন। পাবনার বিদ্রোহ সংক্রামক হইলেও হইতে পারে। আজ যেন পাবনার অল্প সংখ্যক রায়তদিগের জমিদারগণের বিরুদ্ধে উত্থান গবর্ণমেণ্ট পুলিস কনেষ্টবলের সাহায্যে থামাইলেন। কিন্তু সমস্ত বঙ্গদেশের কৃষককুল যদি সমুদ্রগর্জ্জন করিয়া ভূস্বামীদিগেব বিরুদ্ধে উত্থান করে তাহা হইলে কি বিভ্রাট উপস্থিত হইবে? এখন রায়তদিগের উত্থান প্রকৃত বিদ্রোহ ভাব ধারণ করে নাই। কিন্তু সম্মুখে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসের ভয়ঙ্কব মূর্ত্তি পশ্চাতে যদি জমিদারের নগদি হালসানা গোমস্তা. নায়েবের পৈশাচিক আচরণে আতুব অল্পবুদ্ধি প্রজাকুল চমকিয়া নিরাশে গামোড়িয়া দিয়া একবাব ফিরিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে বিভ্রাট হইবে। যদি গবর্ণমেণ্ট দেশের মঙ্গল চাহেন, তবে প্রজাদের অসন্তোষানল কণা থাকিতে থাকিতে নির্ব্বাণ করুন সে অনল একবার জ্বলিয়া উঠিলে বাঙ্গলাদেশ ছাবখার হইয়া যাইবে। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদিগের প্রধান অস্ত্র। গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের হিতসাধনে নিযুক্ত হইলে তাঁহারা প্রথমে সেই অস্ত্র লইয়া অনেক বাগ্‌যুদ্ধ করিবেন বটে, কিন্তু সে বরুণাস্ত্র বিফল করণার্থ ·····সেই সময়ই সৃষ্টি হইয়াছিল। তিরানব্বই সালের আইনে ত দুইই আছে।

এক্ষণে প্রজায় জমিদারে মিল করিয়া দিতে গবর্ণমেণ্টের অধিক শ্রমব্যয় হইবে না। একদিকে বঙ্গকৃষকেরা শ্রম ফলের তিন অংশের দুই অংশ আপনারা পাইলেই সন্তুষ্ট হইতে পারে। অপর দিকে জমিদারগণ সেই ফলের ছয় ভাগের এক ভাগ খাজনা স্বরূপ পাইলে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইবেন। এমন অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া উভয়পক্ষের সম্মতি লইয়া অনায়াসে একটা নিরীখ বাঁধিয়া দিতে পারেন। জমিদার প্রজায় এ বন্দোবস্ত অতি সহজ হইলেও তাহারা আপনাপনি ইহা করিয়া লইতে পারে না কারণ এতদুভয় শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস নাই। সুতরাং গবর্ণমেণ্টকে মাঝে দাঁড়াইতে হইতেছে। উপরোক্ত নিরীখ যেন চিরস্থায়ী করা না হয়, কারণ যে নিরীখ দ্রব্য সামগ্রী যখন অল্প মূল্যে বিকাইতেছে তখন বাঁধা হইয়াছে; দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ হইলে অথবা টাকা সস্তা হইলে তাহা কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য। গবর্ণমেণ্ট আপন নির্দ্ধারিত নিরীখানুসারে জমিদারদিগকে পাট্টা দিতে

বাধ্য করুন। এবং সকল প্রকার বাব বে-আইনী কর উঠাইয়া দিন। বোধ হয় এইরূপ কিছু করিলেই কোন পক্ষকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে না। জমিদার কেবল প্রজাপীড়ন করিবার ক্ষমতা হারাইবেন এই মাত্র। এমনও অনেক জমিদার আছেন যাঁহারা ইহাতে কিছুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করিবেন না, আর যাঁহারা এই স্বত্ব হারাইয়া দুঃখিত হইবেন তাঁহারা জমিদার নামের গৌরব লোপকারী। তাঁহাদের জন্য কেহই দুঃখিত হইবেন না; কিন্তু সকলেই গবর্ণমেণ্টকে মুক্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন।

সাধারণী, ১ম ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১৮ কার্ত্তিক, ১২৮০

প্রজা বিপ্লব

পাবনার প্রজা-পুঞ্জ প্রথমে যে পাবক প্রজ্বলিত করিয়াছিল, তাহা এখনও নিবে নাই, জ্বলিতেছে। কোথাও নিবিয়াছে, কোথাও জ্বলিতেছে, কোথাও এখন আগুন ধরে নাই, ধূমোদ্গীরণ করিতেছে, ধূমে চারিদিক অন্ধকার করিয়া তুলিয়াছে আবার কোথাও হয়ত অগ্নির জ্বালা নাই, শিখা নাই, দীপ্তি নাই, আলোক নাই, উষ্ণ ভস্মে ধনঞ্জয় প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, মুষ্টিমেয় শুষ্কতৃণ সংযোগে, সতেজ দক্ষিণ বায়ুভরে, দিগ্‌দাহ করিয়া ফেলিবে। আবার অন্যত্র পাবনা-প্রজ্বলিত বহ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়াছে, ভস্মরাশি শীতল হইয়াছে. প্রজাপুঞ্জ সেই পাংশুর পবিত্রতা উপলব্ধি করিয়া, সেই বিভূতি অঙ্গে লেপন করিয়া আবার যোগ সাধনে আসীন হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেক সমাজতত্ত্বজ্ঞের মনে আশঙ্কা হয়, শরীরে হৃৎকম্প হয়, আমাদের অন্তরে আহ্লাদ হয়, শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

আমরা বিপ্লব প্রয়াসী। বিপ্লবই জগতের জীবন, সমাজের জীবন। শান্তিই মৃত্যু, শান্তিই নির্ব্বাণ। এ নির্ব্বাণ পদ চাই না, এ শান্তি চাই না, সুতরাং আমরা বিপ্লব প্রয়াসী। অনেকে মনে করেন যাঁহারা এরূপ বিপ্লব প্রয়াসী তাঁহারা প্রজার পক্ষপাতী। যদি তাই হয়, যদি প্রকৃতির চিরসন্তুষ্টি ও পালকের চির আলস্য জমীদারীর পরাকাষ্ঠা হয়, তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এ জমীদারী ছিন্নভিন্ন হইয়া যাউক, এ পাপে প্রয়োজন নাই। ভূস্বামীগণ কিছু আমাদের অল্প গৌরবের সামগ্রী নহেন, বাঙ্গলার জমীদার

আমাদের আদরের ধন। কিন্তু প্রজা আমাদের আরও আদরের সামগ্রী। কেননা প্রজা ছয় কোটী, ভূস্বামী ছয় জন। আর এক কথা ভূস্বামীর লোকবল আছে, বাহুবল আছে, ধনবল আছে। বাঙ্গালাব প্রজার কি আছে? কিছু নাই। দুইদিন বৃষ্টি না হইলে প্রজা জলকষ্টে পীড়িত হয়, গৃহবাস পরিত্যাগ করে; এক বৎসর তণ্ডুল পূর্ণ পরিমাণে উৎপন্ন না হইলে শ্মশান শায়ী হয়, আর চিরদিনই মনে মনে মনাগুণে মরমেতে মরিয়া থাকে। "যাহারা মনের দুঃখ মনে রাখে তাহাদের মন রাখাই সাধু পরামর্শ।"

ভূতত্ত্ববিদগণ বলিয়া থাকেন, যে অতি বিরাট অগ্ন্যুৎপাতে পাষানোৎক্ষেপে এই বিশাল ভূপৃষ্ঠ গঠিত হইযাছে। তাহাতেই আন্দিস বা হিমাদ্রি, আল্টাই বা আল্পাস্ ভূপৃষ্ঠে মেরুদণ্ডরূপে আধিপত্য কব্বিতেছে। কিন্তু প্রকৃতি পরিবর্ত্তন-প্রিয়া। এই এই উচ্চ নীচ ভূ-পৃষ্ঠ, এই পর্ব্বত কন্দব, শিখর গহ্বর জড়িত মেদিনীমণ্ডলকে ক্রমেই সমধরাতল করিতেছেন। অগ্ন্যুৎপাতে ভূপৃষ্ঠ বন্ধুরাবয়ব ধারণ করিয়াছিল, জলস্রোতে ইহা ক্রমেই সমধরাতল হইতেছে। দিন যামিনী কলবাহিনী প্রবাহ পথে প্রকৃতি রেণু রেণু করিয়া পর্ব্বত শরীর বহিয়া সাগরে লইয়া যাইতেছেন, পর্ব্বতসমূহ মধ্যে মধ্যে মাথা নাড়িয়া নিবারণ করে, প্রকৃতির তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পর্ব্বত গলিতেছে, চর পড়িতেছে, নদীগর্ভ উঠিতেছে, সাগর পূরিতেছে।

সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক তদ্রূপ। অগ্ন্যুৎপাতে সমাজপৃষ্ঠ গঠিত হয়। তাহাতেই এত উচ্চ নীচ, পর্ব্বত, কন্দর, শিখর, গহ্বর, আর্য্য, দস্যু, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, প্যাট্রী, প্লীব, লর্ড, সর্ফ, আমীর ও গোলাম। অগ্ন্যুৎপাতে গঠিত বলিয়াই সমাজ এরূপ বন্ধুর; কিন্তু জল সঞ্চারে, হৃদয়রসে ইহা ক্রমে সমধরাতল হইবে। কল বাহিনী ভাগিবথী যেমন দিনযামিনী হিমালয় হ'তে বালুকা বহন করিতেছে, মানব হৃদয় বাহিনী দয়া তেমনই দিনযামিনী সমাজেব উচ্চ স্তূপ হইতে ধন হবণ করিয়া দবিদ্রের ঘরে ঘরে বিতরণ কবিতেছেন।

ভূতত্ত্বেই, সমাজতত্ত্বেই কি, জগতের নিয়মই একরূপ। এই গতি অনন্ত কারিণী, যে ইহার গতি রোধ কবিতে চায় সে অঘটন প্রয়াসী। জমীদার পড়িবে প্রজা উঠিবে, কেহই বোধ করিতে পাবিবে না। পড়িবেই পড়িবে, উঠিবেই উঠিবে, কেহই রোধ করিতে পারিবে না। জমীদার প্রজা মধ্যে বিবাদ চলিবেই চলিবে, কেহই রোধ করিতে পারিবে না।......

সাধাবণী, ৪র্থ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ২৭ বৈশাখ, ১২৮২

গ্রন্থপঞ্জী

এই পুস্তক রচনায় যে বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে—প্রতি অধ্যায়ের শেষে "টীকা ও উদ্ধৃতি" অংশে তার উল্লেখ আছে।

উনবিংশ শতাব্দীর পত্রপত্রিকার যে মূল ফাইলগুলি দেখার সুযোগ হয়েছে নীচে শুধু তার তালিকা দেওয়া হল—

বঙ্গদূত	জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত)
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ)
সাধারণী	(,,)
সোম প্রকাশ	(বিদ্যাভূষণ গ্রন্থাগার, সুভাষগ্রাম, ২৪ পরগনা)
Asiatic Journal	(National Library)
Calcutta Monthly Journal	(,,)
India Gazette	(,,)
Bengal Spectator	(,,)
The Friend of India	(,,)
Hindoo Patriot	(,,)
National Paper	(,,)
Bengal Magazine	(,,)
The Mussalman	(,,)
Calcutta Review	সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরী)
Amrita Bazar Patrika	(পত্রিকা কার্য্যালয়)

নির্দেশিকা

অ

আ

ই

ঈ

উ

এ

ও

ক

গ

চ

জ

ট

ড

ত

দ

ধ

ন

র

ল

শ

স

হ